মুক্তির আলোতে

রবীন্দ্রনাথ আর, মহারাজ

মুক্তির আলোতে

লেখক — রবীন্দ্র, আর, মহারাজ
ও
ডেভিড হান্ট

অনুবাদ — বাসন্তী দাশ

এসোসিয়েশন অফ্ ব্যাপটিষ্টস্
সাহিত্য বিভাগ
জি পি ও বক্স ৭৮
চট্টগ্রাম ৪০০০

প্রকাশক—
এসোসিয়েশন অফ্ ব্যাপটিষ্টস্
সাহিত্য বিভাগ
জি পি ও বক্স ৭৮
চট্টগ্রাম ৪০০০
বাংলাদেশ

প্রথম সংস্করণ ঃ ১৯৯১ ৫০০০ কপি

(গোপনীয়তা ও ব্যক্তিস্বার্থ রক্ষার্থে এই বইয়ে উল্লেখিত কয়েকজন ব্যক্তির ও স্থানের নাম পরিবর্তিত করা হয়েছে।)

Used by kind permission of
Harvest House Publishers
Eugene, Oregon

এ, বি, সি প্রেস
৭, নং রসিক হাজারী লেন
চট্টগ্রাম ৪০০০

সূচীপত্র

অধ্যায়	নাম	পৃষ্ঠা
১	ব্রাহ্মণের মূল্য	১
২	একজন অবতারের মৃত্যু	১৮
৩	গংগায় ছাই ফেলা	২৯
৪	কর্ম ও ভাগ্য	৪৮
৫	পণ্ডিতজী	৬৩
৬	অল্প বয়সীগুরু	৭৮
৭	শিব ও আমি	৮৬
৮	পবিত্র গরু	৯৯
৯	ধনী-গরীব	১০৬
১০	অজানা ঈশ্বর	১১৮
১১	"আর তুমি তা-ই!"	১২৩
১২	গুরু পূজা	১৩১
১৩	কর্ম ও দয়া	১৪৪
১৪	আলোদান	১৫৩
১৫	একজন গুরুর মৃত্যু	১৫৯
১৬	নতুনভাবে শুরু	১৭৭
১৭	পুনর্মিলন ও বিদায়	১৯৬

১

ব্রাহ্মণের মূল

জীবন যতই ভরপুর হোক্ না কেন জীবনের পিছন দিকে তাকালে দেখা যায় কোন না কোন দুঃখবোধ যেন সব সময় লেগেই আছে। আমার গভীরতম দুঃখবোধ ছিল আমার বাবা চন্দ্রভান রঘুবীর শর্মা মহাবীর মহারাজকে নিয়ে। বাবা যদি আজ বেঁচে থাকতেন! আমার দুঃখবোধকে সম্পূর্ণভাবে বর্ণনা করা যায় না যখন আমি ভাবি সেই অসাধারণ ব্যক্তিটি এত কম বয়সে এবং এমন রহস্যজনক ভাবে মারা গেলেন! তাঁর মৃত্যুর পর থেকে আরও আশ্চর্য ঘটনা ঘটতে লাগল আমার জীবনে। আমি প্রায়ই ভাবতাম সেগুলো যদি আমার বাবাকে বলতে পারতাম আর তাঁর প্রতিক্রিয়া কি হত তা দেখতে পারতাম!

তাঁর কাছে বলা? বাবা ও আমার জীবনের কোন কিছুই আমরা পরস্পরের কাছে কখনও বলি নি। আমার জন্মের আগে বাবা একটা শপথ করেছিলেন যার জন্য তিনি আমার সংগে একবারও কথা বলেন নি বা আমার দিকে একটুখানি তাকিয়েও দেখেন নি। তিনি যদি আমার সংগে দু'টো কথা বলতেন তাহলে আমি যে কত খুশী হতাম তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। গোটা জগতের মধ্যে আমি আর কিছুই চাইতাম না যদি তিনি মাত্র একবার বলতেন, "রবি, বাবা আমার!" কিন্তু তা তিনি কখনও বলেন নি।

আট বছর ধরে তিনি আমার মায়ের সংগে একটা কথাও বলেন নি কিম্বা গোপনে ফিস্‌ফিস্‌ও করেন নি। তাঁর এই ভাবেধরা অবস্থা, যা তিনি যোগ-সাধনার দ্বারা পেয়েছিলেন, তা অনেকের কাছে অদ্ভুত

বলে মনে হত। যারা পূর্বদেশীয় অতীন্দ্রিয়বাদ সম্বন্ধে কিছু জানে না তারাই একে পাগলামী বলে মনে করে। যাহোক, এখন কিন্তু পশ্চিমা দেশগুলোতে "চেতনার এই পরিবর্তিত অবস্থাকে" লোকে নতুন কিছু বলে গ্রহণ করেছে। এর শুরু হয় বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে নানা রকম ওষুধের পরীক্ষার মাধ্যমে। তারপর সেই ওষুধও পরীক্ষাগারে সীমাবদ্ধ থাকে নি, তা সমাজের মধ্যেও ছড়িয়ে গেছে; আর এখন হাজার হাজার লোক এই "পরিবর্তিত সত্যের" অবস্থা অনুভব করছে। আরও হাজার হাজার লোক মোহনিদ্রা, আত্মসম্মোহন, নিয়ন্ত্রিত কল্পনামূলক কাজ ও ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার যোগ-সাধনার মধ্য দিয়ে "উঁচু ধরণের চেতনা" লাভ করছে এবং তা পশ্চিমের দেশগুলোতে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। এটা অতিন্দ্রিয় ধ্যান থেকে শুরু করে "কেন্দ্র" ও মনের চোখে দেখা পর্যন্ত এগিয়ে গেছে। এছাড়া বৈজ্ঞানিক সমাজে এই মানসিক দৃশ্যমান বস্তুর বৈধতার স্বীকৃতি ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করছে যা আগেকার সন্দেহপ্রবণ জড়বাদে বিশ্বাসী পাশ্চাত্য সমাজকে এই অতিপ্রাকৃত ব্যাপারের বিষয়ে নতুন দৃষ্টি দান করেছে।

আমরা, ভারতীয়েরা, হাজার হাজার বছর ধরে জানি যে, যোগসাধনার মধ্যে সত্যিই একটা শক্তি আছে। আর আমার বাবা তা প্রমাণ করেছিলেন। যোগী ও গুরুরা প্রকৃত জীবন সম্বন্ধে যা শিক্ষা দেন এবং যে বিষয় এখন ইউরোপ ও আমেরিকায় বিখ্যাত হয়ে উঠেছে সেই জীবনের চরম আদর্শ ছিলেন আমার বাবা। যে জীবন সম্বন্ধে লোকে বলাবলি করে সেই জীবনই তিনি যাপন করেছিলেন যা খুব অল্প লোকেই যাপন করে।

আমার তখনও বুঝবার মত বয়স হয়নি, তবুও আমি মাকে জিজ্ঞাসা করতাম "আমার বাবা ঐ রকম কেন?" আমার হতবুদ্ধি মুখের ভাব ও জিদ-ধরা প্রশ্নের উত্তর তিনি সব সময় ধৈর্যের সংগেই দিতেন, বলতেন, "উনি খুব বিশেষ একজন ব্যক্তি— তুমি বাবা হিসাবে সর্বশ্রেষ্ঠ লোককেই পেয়েছ। আমাদের সকলের মধ্যে যে

প্রকৃত "আমি", অর্থাৎ একমাত্র অস্তিত্ব রয়েছে, যার কোন দ্বিতীয় নেই, তাকেই উনিই খুঁজছেন। তোমার মধ্যেও তা-ই রয়েছে, রবি।"

প্রথমে আমি কিছুই বুঝতে পারি নি, তবুও বেশ তাড়াতাড়ি আমি বিশ্বাস করলাম যে, বাবা সর্বশ্রেষ্ঠটাই বেছে নিয়েছেন। মা এবং অন্যান্য অনেকেই আমাকে সেই আশ্বাস দিতেন। তাঁরা বলতেন বুদ্ধ দেবের মহান আত্মত্যাগ আর আমার বাবার আত্মত্যাগের মধ্যে কিছুটা তুলনা করা যায়। আমি বড় হয়ে পবিত্র বইগুলোর মধ্যে খুঁজে দেখে কথাটা মেনে নিলাম। আমার বাবার আত্মত্যাগ সম্পূর্ণ হয়েছিল খুব দ্রুতবেগে, তাঁর বিয়ের পরে কিছু দিনের মধ্যেই। তার আগে হলে তো আমার জন্মই হত না। যদিও আমি সেই ধারণটা মেনে নিয়েছিলাম যে, উচ্চতর জীবন বেছে নেওয়ার দরুন আমার বাবা তাঁর একমাত্র সন্তান যে আমি আমার সংগে কথা বলেন না; তবুও যে ক্ষয়-করা শূন্যতা, যে গভীর আকাংখা, যে অদ্ভুত অস্বাচ্ছন্দ্যকর ক্ষুধা নিয়ে আমি দিন কাটাতে শিখেছিলাম, তা অবহেলা করলেও সেই শূন্যতাকে জয় করতে পারতাম না। অবশ্য রাগ বা বিরক্তি প্রকাশ করার কথা চিন্তাও করা যেত না। একজন হিন্দুর কাছে ভগবদ্‌গীতা হল সর্বশ্রেষ্ঠ পুস্তক আর আমার বাবা সাহস করে সেই পুস্তকের কথামত চলাই বেছে নিয়েছিলেন আর আমি? যে ধর্মশিক্ষা আমার মা আমাকে দিয়েছিলেন তাতে এ ব্যাপারে বিদ্রোহ করি কি করে? কিন্তু তবুও বাবার সাহচর্য পাবার জন্য আমার আকাংখা হত।

যে ব্রত তিনি নিয়েছিলেন সে সম্বন্ধে কেউই ঠিক মত জানতেন না, এমন কি, আমার মা-ও না। তবে যে জীবনের ধারা তিনি হঠাৎ গ্রহণ করেছিলেন তা থেকে তাঁরা কিছু একটা অনুমান করেছিলেন। একটা তক্তার উপর পদ্মাসন করে, অর্থাৎ হাঁটু মুড়ে বসে পায়ের পাতা হাঁটুর উপর তুলে দিয়ে তিনি ধ্যান করতেন এবং পবিত্র শাস্ত্র পড়ে দিন কাটাতেন। তিনি আর কিছুই করতেন না। ধ্যানের জন্য মন্ত্রের খুব প্রয়োজন। তাতে যে কম্পন হয়, সেটাই হল দেব-দেবতাদের আকর্ষণ করার প্রধান উপায় এবং এই সব আত্মাদের সাহায্য ছাড়া যারা

ধ্যান করে তাদের সত্যিকারের কোন উপকার হয় না। কিন্তু আমার বাবা সমস্ত মন্ত্রের ব্যবহার পেরিয়ে গিয়েছিলেন। আমরা সবাই মনে করতাম তাঁর সংগে ব্রহ্মার সোজাসুজি কথাবার্তা হয়। প্রকৃত "আমি"কে বুঝবার জন্য তিনি এমনভাবে আত্মসমাহিত হতেন যে, কোন মানুষের উপস্থিতিও টের পেতেন না, যদিও তাঁর গুণমুগ্ধেরা তাঁকে প্রণাম করার জন্য এবং উপহার দেবার জন্য অনেক দূর থেকে তাঁর কাছে আসত। তারা তাঁকে ফল-ফুল, কাপড়-চোপড় ও টাকা-পয়সা উপহার দিত। কিন্তু কেউ কখনও তাঁর কাছ থেকে কোন সাড়া পেত না। মনে হত তিনি যেন একটা আলাদা জগতে বাস করছেন। অনেক বছর পরে গভীর ধ্যানের মধ্যে আমি গুপ্ত জগতের অদ্ভুত অদ্ভুত গৃহে বিচরণ করেছিলাম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ জায়গায় উঠেছিলাম যেখানে আমার বাবা জীবিতকালে হয়তো তাঁর সময় কাটাতেন। হতাশার কথা এই যে, আমি তাঁকে সেখানে কখনও খুঁজে পাই নি।

এখন আমি আমার কথায় এগিয়ে যাই। ধ্যানের মধ্য দিয়ে এত উপরে ওঠা সহজে হয় না, আবার সেগুলো তাদের কাছে ব্যাখ্যা করাও যায় না যারা তাদের পঞ্চইন্দ্রিয়ের সীমাবদ্ধতার মধ্যে জগতকে দেখতে পায়। আমাদের এই যাত্রায় আস্তে আস্তে এগিয়ে যেতে হয়। প্রথম ধাপে আমাদের বহু বছরের পূর্ব ধারণাকে সরিয়ে দিতে হয়, বিশেষভাবে সরিয়ে দিতে হয় আমাদের অযৌক্তিক জিদকে; কারণ সেই ধারণায় আমরা মনে করি, যা কিছু আমরা বুঝতে পারি না বা আজকের প্রযুক্তিবিদ্যার অপরিপক্ক যন্ত্রপাতি দিয়ে আবিষ্কার করতে পারি না তা সত্যি হতে পারে না। এমন কি, আমাদের জানাশোনার বাইরে যা কিছু আছে বলে আমরা মনে করি তা-ও সত্যি হতে পারে না; কারণ কে বুঝতে পারে জীবন বা শক্তি বা আলো কি? কোন্ যন্ত্র দিয়ে ভালবাসাকে মাপা যায়?

ছেটি থাকতেই আমার ভেতরে একটা ভীষণ অহংকার জেগে উঠত যখন কেউ আমার বাবার প্রশংসা করত। আর লোকে তা প্রায়ই করত। ধার্মিক হিন্দুরা ভয় ও ভক্তির সংগে তাঁর সম্বন্ধে বলতেন। তাঁরা

বলতেন উনি এমন একজন ব্যক্তি যাঁর উচ্চতর ও রহস্যময় পথে পা ফেলার সাহস ও দৃঢ় বিশ্বাস আছে। অনেকেই, এমন কি, আমার জানামতে সবচেয়ে বড় পণ্ডিতও আমার বাবাকে 'অবতার' বলতেন। 'অবতার' শব্দটার অর্থ কি তা সত্যি করে বোঝার আগে অনেক বছর ধরে কথাটা কেবল আমি শুনতাম। কথাটা শুনতে ভাল লাগত; তাছাড়া কথাটা অসাধারণও বটে। আমি জানতাম আমিও একজন অসাধারণ ব্যক্তি, কারণ তিনি আমারই বাবা। কোন একদিন আমিও একজন মস্ত বড় যোগী হব। প্রথমে এটাই ছিল আমার অল্প-জানার স্বতঃস্ফূর্ত অনুভূতি; কিন্তু যত দিন যেতে লাগল ততই ওটা গভীরতর হয়ে দৃঢ় বিশ্বাসে গিয়ে দাঁড়াল।

কিন্তু আমার উত্তেজনাপূর্ণ স্বপ্নগুলোর মধ্যেও আমি কখনও ধারণা করতে পারি নি যে, কত বিস্ময় আমার জন্যে অপেক্ষা করে আছে! সেগুলো এত বেশী যে, আমি ভাবছি এখন যদি সে সব আমার বাবাকে বলতে পারতাম! কিন্তু তিনি তো নেই।

সেই অসাধারণ লোকটির সামনে আমি প্রায়ই দাঁড়িয়ে তাঁর চোখের দিকে অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাকিয়ে থাকতাম এবং তার অতল গভীরে হারিয়ে যেতাম। এ যেন মহাশূন্যের মধ্য দিয়ে পড়ে যাওয়া, তাই কোন কিছু ধরার চেষ্টা। কাউকে ডাকার চেষ্টা করতাম কিন্তু পেতাম শুধু নীরবতা আর শূন্যতা। তখন আমি বুঝতে পারলাম যে, শ্রীকৃষ্ণ যে স্বর্গসুখ অর্জুনকে দিয়েছিলেন তা-ই আমার বাবা পেয়েছেন। একটা শান্তিপূর্ণভাব তাঁর মুখে লেগে থাকত। তিনি স্থির হয়ে বসে থাকতেন, ধীরে ধীরে এবং তালে তালে তার শ্বাস-প্রশ্বাস ওঠা-নামা করত। সেই সব বছরগুলোতে তাঁর চুল ও দাড়ি কাটা হয়নি বলে তা তাঁর কোমর পর্যন্ত নেমে এসেছিল। সেই সময় আমার মনে হত আমি যেন একজন দেবতার সামনে রয়েছি।

আমাদের দেব মূর্তিগুলোকে যেমন করে আমরা মমতার সংগে পারিবারিক বেদীর উপরে রাখতাম, তাদের গায়ের নরম কাপড়গুলো খুলতাম, আবার পরাতাম, স্নান করাতাম এবং খুব যত্ন ও ভক্তির সংগে

কাপড় পরাতাম ঠিক তেমনি করেই আমার বাবাকে যত্ন করা হত। ঠাকুরঘরের দেবমূর্তিগুলোর মতই তিনি নিজের জন্য কিছুই করতেন না। দেবমূর্তির মতই তাঁর যত্ন করা হত। অটি বছর ধরে তাঁকে স্নান করানো, খাওয়ানো, কাপড় পরানো হয়েছিল। আমার বাবা শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ মতই চলতেন— পদমর্যাদা, আশা-আকাংখা এবং বাইরের জগতের সংগে যোগাযোগ তিনি ত্যাগ করেছিলেন। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই যে, লোকে তাঁকে দেখে অবাক হত এবং সব জায়গার লোকেরা তাঁকে পূজা করার জন্য আসত। ভাবগম্ভীর ও ভক্তির সংগে তার সম্বন্ধে বলা হত যে, তিনি পুনর্জন্মের চাকা থেকে মোক্ষ বা মুক্তিলাভ করেছেন। এই মৃত্যুর জগতে তাঁর আর কোন জন্ম হবে না; তাঁর জন্য থাকবে কেবল নির্বাণের অনন্ত স্বর্গসুখ; তিনি সর্বোচ্চ পথে প্রবেশ করেছেন। তার রহস্যজনক মৃত্যু সবাইকে অবাক করে দিলেও আমি আগেই বুঝেছিলাম যে, তাঁর সংগে আর কখনও আমাদের দেখা বা কথাবার্তা হবে না।

* * * * * *

"বিষ্ণু বলছেন তাঁকে এ্যাম্বুলেন্সে করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হবে।"

আমি তখন বাইরে দাঁড়িয়ে একটা আম খাচ্ছিলাম, আমটা আমি তখনই পেড়েছিলাম। শান্ত সকালের বাতাসে খোলা জানলার মধ্যে দিয়ে কথাটা আমার কানে আসল। কথাটা বলছিলেন আমার বাবার বড় বোন পূয়া মোহানী। তিনি ছিলেন আমার বাবার সবচেয়ে উৎসাহী শিষ্যা। আমার বাবাকে পরিষ্কার করার জন্য তিনি মাকে সাহায্য করছিলেন। তিনি আমার বাবাকে খুব ভালবাসতেন এবং আবেগভরে পূজা করতেন। বিষ্ণু ছিলেন তাঁর নিকট-আত্মীয় ও একজন খুব ভাল ব্যবসায়ী। ধর্মকর্ম করার জন্য তাঁর কোন সময় ছিল না এবং বাবার বিষয়ে তিনি কেবল কড়া কড়া কথা বলতেন। আমার হাত থেকে কখন

যে আমটা পড়ে গেছে জানি না। আরও ভাল করে শুনবার জন্যে নিঃশ্বাস বন্ধ করে আমি জানলার কাছে এগিয়ে গেলাম।

বাবাকে স্নান করানো হচ্ছিল বলে জলের ও অন্যান্য শব্দের জন্য কথাবার্তা আস্তে ও অস্পষ্ট হয়ে উঠল। বিষ্ণু আমার বাবার সম্বন্ধে জোর দিয়ে বলছিলেন "লোকেরা যদি তাঁর সংগে দেবতার মত ব্যবহার না করত তবে তিনি শীঘ্রই এই অর্থহীন জীবন যাপন ত্যাগ করতেন।" জানলার মধ্যে দিয়ে যে সব কথা ভেসে আসছিল তা আমার ছেটি বয়সের বুদ্ধিতে আমি আয়ত্ব করতে পারছিলাম না, যেমন— ইলেকট্রিক শকের চিকিৎসা, মনোবিজ্ঞান ইত্যাদি। তার পরেও কথা চলছিল ডাক্তার ও ঔষুধ সম্বন্ধে। এসব কথা শুনে আর মোহানীও বিশেষ করে মায়ের গলার আওয়াজে কেমন যেন একটা হতাশার সুর শুনে আমি দিশেহারা ও ভীত হলাম। আমার মা সবসময়ে খুব শান্ত থাকতেন। তাহলে নিশ্চয় এমন সাংঘাতিক কিছু ঘটেছে যার দরুন মা এত উতলা হয়েছেন।

নারকেল গাছের ছড়িয়ে থাকা পাতার ছায়ার তলা দিয়ে আমি সেই পরিচিত পথে দৌড়ে আমাদের পরিবারের পুরানো বন্ধু গোঁসাইয়ের কাছে গেলাম। তিনি দুই কামরা বিশিষ্ট একটা কুঁড়ে ঘরে থাকতেন। সেই ঘরের দেওয়ালগুলো ছিল মাটির আর মেঝেটা ছিল শক্ত মাটি ও গোবর দিয়ে লেপা আর উপরে ছিল টিনের ছাউনি। আমার মায়ের বাবা,অর্থাৎ আমার দাদু লছমন সিং তাঁর বিরাট সম্পত্তির একটা অংশে গোঁসাইকে ঘর তৈরী করে থাকতে দিয়েছিলেন। গোঁসাইয়ের বাড়ীটা আমাদের বাড়ী থেকে বেশী দূরে ছিল না। আমাদের বাড়ীটা আমার দাদু আমার মায়ের বিয়ের যৌতুক হিসাবে আমার মা-বাবাকে দিয়েছিলেন। ভীষণ রোগা এই বুড়ো গোঁসাইয়ের গায়ের চামড়া শুকিয়ে একেবারে কুঁচকে গিয়েছিল। আমি যখন তাঁর কাছে গেলাম তখন তিনি তাঁর নীচু কুঁড়ে ঘরের সামনে কাজু বাদাম গাছের সামান্য ছায়ায় হাঁটু বুকের কাছে জড়ো করে মাটিতে বসে ছিলেন। এইসময় তাঁর পরণের ধুতি উঠিয়ে তিনি দুই পায়ের

মধ্যে রাখতেন, হাত দু'টো থাকত হাঁটুর উপরে আর থুতনি থাকত দুই হাতের তালুর মধ্যে। সাধারণতঃ এইভাবেই তিনি বসে থাকতেন।

আমার দিকে তাকিয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "ওহে মহান যোগীর ছেলে, তোমাকে এত মন-মরা দেখাচ্ছে কেন?" তাঁর চেহারায় এমন একটা জ্ঞানের ভাব প্রকাশ পেত যাতে আমার বিশ্বাস করা সহজ হত যে, তিনি পূর্বজন্মে ছিলেন পুরাকালীন একজন সন্ন্যাসী, যিনি পুনর্জন্ম পেয়েছেন এবং এখন আবার বুড়ো হয়ে গেছেন। আমি জানতাম এইজন্যই তিনি এত ভাল হিন্দি ভাষা বলেন, কিন্তু তাঁর ইংরিজি ও ত্রিনিদাদীয় মাতৃভাষা ছিল খুব খারাপ।

আমি নিজেকে রক্ষা করার জন্য উত্তর দিলাম, "কেন আপনি আমাকে মন-মরা মনে করছেন?" আমি গৌসাইয়ের কথার সংগে সংগতি রেখে বললাম, "আপনাকেও তো খুব খুশী দেখাচ্ছে না।"

গৌসাই বেশ গম্ভীরভাবে বললেন, "কাল রাতে আমার ভাল করে ঘুম হয়নি। শুকিয়ে যাওয়া পুরোনো কম্বলের মতই আমার নিজেকে মনে হচ্ছে।" কথা বলবার সময় তাঁর সাদা পুরু গোঁফ যেন লাফাচ্ছিল। আমি জানি না কোনটা আমাকে মুগ্ধ করেছিল— তাঁর নাচানাচি করা গোঁফ, না কি তাঁর কানের উপর থেকে বেরিয়ে আসা লম্বা সাদা লোমের গুচ্ছ?

আমি নীরবে তাঁর পাশে বসে পড়লাম। আমরা দু'জনে খুব ভাল বন্ধু ছিলাম, সেজন্যে সব সময় পরস্পরের সংগে কথা বলার এত দরকার হত না। তাঁর কাছে থাকতে পেরে আমি বেশ সান্ত্বনা পাচ্ছিলাম। বেশ কিছুক্ষণ পরে আমার মনের বোঝাটা নামাবার মত সাহস পেয়ে আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, "ইলেক্ট্রিক শকের চিকিৎসা সম্বন্ধে আপনি কি কিছু জানেন?"

সেই বুড়ো লোকটি চিন্তায় থুত্‌নি চুলকাতে লাগলেন, ভুরু কুঁচকে রইলেন কিছুক্ষণ, তারপর বললেন, ওসব বড় বড় শহরের কথা— এখানে ওর কোন অর্থই নেই। তুমি কোথায় ওসব শুনেছ? নিশ্চয়ই রেডিয়োতে, তাই না?

"কথাটা বিষ্ণু বলছিলেন। তিনি যা বলছিলেন তা আমি ঠিকমত শুনতে পাই নি।" "বিষ্ণু খারাপ না— তবে সে পরিণাম সম্বন্ধে কিছু ভাবে না। মোহানী তো জোরে কথা বলেন না। তোমার বাবাই কেবল বিষ্ণুকে ঠিক রাখতে পারতেন। হ্যাঁ তাঁদের দিন...।"

আমি হতাশ হয়ে চুপ করে রইলাম। গোঁসাইকে সব সময় খুব জ্ঞানী মনে হত। তাই আমি ভাবলাম, ওসব হয়তো বড় বড় শহরের কথা— কিন্তু কথাটার তো একটা অর্থ আছে।

গোঁসাই অপ্রত্যাশিতভাবে বলে উঠলেন, "আমি ঐ বিয়ের ব্যাপারটা কখনও ভুলি নি" মনে হচ্ছিল কথাটা তিনি আমাকে প্রথম বারের মত বলছেন। আসলে কথাটা আমি কম করে হলেও বিশ বার শুনেছি, হুবহু একরকম।

"তোমার বাবা তো খুব বুদ্ধিমান, আর তুমি তোমার বাবার নিজের ছেলে। বিয়ের সময় তোমার বাবা যে মুকুট পরেছিলেন তা যদি দেখতে! মুকুটের চারপাশে ছোটি ছোটি ইলেকট্রিক বাতি জ্বলছিল আর নিভ্‌ছিল। তোমার বাবার পকেটে ছিল ব্যাটারী। তিনি নিজেই সেই ব্যাটারীটার ব্যবস্থা করছিলেন। তোমার দাদুর দোকানের ঠিক সামনেই যখন তিনি গাড়ী থেকে নামলেন তখন লোকেরা যে প্রশংসা করছিল তা যদি তুমি শুনতে! "

আমি যেন কিছুই জানি না এমন নিরীহভাবে বললাম, "আপনি তখন ওখানেই ছিলেন, না?" "আমি নিজের চোখে যা দেখেছি তা-ই তোমাকে বলছি— এটা কারও কাছ থেকে শোনা গল্প নয়। আমি যতগুলো বিয়ে দেখেছি তার মধ্যে ওটাই ছিল সবচেয়ে সুন্দর আর সবচেয়ে দামী। তুমি জিজ্ঞেস করছ, আমি ওখানে ছিলাম কি না? তুমি কি মনে কর ঐ রকম বিয়ে দেখা আমি বাদ দেব? কি বাজনা! কি নাচ! কি খাওয়া-দাওয়া! এমন খাবার, যা খেলে তোমার আর এক মাস খেতেই হবে না। তারপর বিয়ের যৌতুক! যদি তুমি তা দেখতে! যদি তোমার বাবার মত তুমি বিয়ে কর, তাহলে...হুঁ...হুঁ...হুঁম!"

এই পর্যন্ত বলে তিনি থামলেন। তিনি ঐ রকমই করতেন।

তারপর তিনি আবার বলতে লাগলেন, কিন্তু তাঁর স্বরে এবার একটা ভক্তির ভাব ফুটে উঠল, "কিন্তু তিনি সব কিছুই ত্যাগ করেছেন, একেবারে সব... সব কিছু। তুমি কি একটা কথা জান? তিনি একজন 'অবতার', মানুষের আকারে দেবতা!"

গৌসাই তারপর নীরব হয়ে গেলেন। তিনি এতক্ষণ যা বললেন তা একটা নটিক দেখার মতই ছিল। আর নটিকের শেষে আমিও চলে যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালাম।

সাধারণতঃ আমি আরও কথা শুনবার জন্য তাঁর কাছে থাকতাম। তিনি বিয়ের ব্যাপারটা বলা শেষ করে হয়তো মহাভারত বা রামায়ণ থেকে দেব-দেবতাদের কোন অদ্ভুত ঘটনার কথা বলতে আরম্ভ করতেন। তিনি হিন্দু ধর্ম সম্বন্ধে এবং পৌরাণিক নানা কাহিনী খুব ভাল করেই জানতেন। আমি তাঁর কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছিলাম। কিন্তু তখন আমি আমার বাবার সম্বন্ধে আর কিছু শুনতে চাইলাম না, বিশেষ করে তিনি যে কত অসাধারণ ছিলেন সেই বিষয়ে। আমি বুঝতে পারছিলাম একটা ভয়ংকর কিছু হতে যাচ্ছে। গৌসাইয়ের মুখে বাবার প্রশংসা শুনে আমাকে আরও শংকিত করে তুলেছিল।

বেশ কয়েকদিন কেটে গেল— তেমন অস্বাভাবিক কিছু ঘটল না। বিষ্ণু যে ভয় দেখিয়েছিলেন সে কথা আমি ক্রমশঃ ভুলে যেতে লাগলাম। বিষ্ণু যা বলেছিলেন তা আমার কাছে স্পষ্ট ছিল না, আর মায়ের কাছে জিজ্ঞেস করতেও আমার ভয় করছিল। আসলে জীবনটা রহস্যপূর্ণ, আর এমন অনেক বিষয় আছে যার বিষয় বলাবলি করতেও খুব ভয় লাগে।

আমার মায়ের চেহারা খুব সুন্দর ছিল। তিনি খুব বুদ্ধিমতী ছিলেন আর তাঁর অন্তরের শক্তিও ছিল অসাধারণ। আমার মা-বাবার বিয়ে ভারতীয় প্রথামতই তাঁদের মা-বাবাই ঠিক করেছিলেন। তখন আমার মায়ের বয়স ছিল ১৫। স্কুলে পড়ার সময় তাঁর ক্লাশে তিনি প্রথম হতেন। যখন আরও লেখাপড়া করার জন্য তিনি প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন তখন তাঁর বাবা তাঁকে হঠাৎ বিয়ে দিলেন। ইংল্যাণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়ে

তাঁর পড়ার স্বপ্ন— স্বপ্নই রয়ে গেল। হঠাৎ এই অবস্থার চাপে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তারপর তাঁর বাবার ইচ্ছার কাছে তিনি নতি স্বীকার করলেন। সেই এলাকার দু'জন নাম-করা পণ্ডিত আমার মা-বাবার হাতের রেখা দেখেছিলেন এবং এই ব্যাপারে তাঁরা ভাগ্যগ্রহ ও জ্যোতিষশাস্ত্র খুঁজে দেখে বলেছিলেন যে, এই মিলনে দেব-দেবতাদের আশীর্বাদ থাকবে। আমার মা অবশ্য বুঝেছিলেন অন্যরকম, কিন্তু কে সাহস করে জিজ্ঞাসা করবে গ্রহগুলো কি রায় দিয়েছিল আর পণ্ডিতেরা কি ঘোষণা করেছিলেন? মা নিজেকে অসুখী দেখিয়ে তাঁর মা-বাবাকে নিরাশ করেন নি। হিন্দুদের মধ্যে পরিবারের প্রতি দায়িত্ব যেমন পবিত্র তেমনি জাতও পবিত্র।

মায়ের সেই বাধ্যতা অল্প কিছুদিন পরেই পুরস্কৃত হল আরও বড় একটা ধাক্কা খেয়ে যখন তাঁর স্বামী কড়িকে কিছু না বলে হঠাৎ নীরব ধ্যানের জগতে নিজেকে ডুবিয়ে দিলেন। এমন কি, তিনি চোখের ইশারাতেও তাঁর আশে পাশের লোকদের কিছু জানাতেন না। এতে আমার মায়ের মনে নিশ্চয়ই যে আতংকের সৃষ্টি হয়েছিল তা আমি মোটেই এখন ধারণা করতে পারছি না। ১৫ বছরের অল্প বয়স্কা গর্ভবতী বধূ আমার মাকে অনেক দায়িত্বের সম্মুখীন হতে হল। নিজের ও সংসারের দায়িত্ব তো আছেই আর তার সংগে যুক্ত হল তাঁর স্বামীর সেবা-যত্ন করা। আর সেটা ছিল একজন বোবা, কালা, অন্ধ শিশুর মত একজনের তত্বাবধান করা। মা কখনও তা নিয়ে কোন অভিযোগ করেন নি। আমি বড় হয়ে লক্ষ্য করেছি আমার বাবার প্রতি তাঁর মমতাপূর্ণ ব্যবহার ও দৃঢ় আনুগত্য। মনে হত মা যেন সেই আশীর্বাদই পেয়েছেন যাতে তিনি বাবার বেছে নেওয়া পথ সম্বন্ধে বুঝতে পারেন। তিনি ছিলেন ধীরা ও চিন্তাশীলা; ধর্মের প্রতি তাঁর ছিল গভীর অনুরাগ। তিনি যে একসংগে আমার মা ও বাবা ছিলেন কেবল তা-ই নয়, তিনি ছিলেন হিন্দুধর্মে আমার প্রথম শিক্ষাদাত্রী। আমার খুব ভাল করেই মনে আছে, আমি তখন ছোটি— আমাদের পারিবারিক ঠাকুরঘরের বেদীর সামনে মায়ের গা ঘেঁসে বসে আমার প্রথম পাঠ

শুরু হয়। ঠাকুরঘরের বেদীর উপরে ছিল অসংখ্য দেব-দেবতার মূর্তি। মূর্তিগুলোর উপর সদ্য-দেওয়া চন্দনের ঘন সুবাস আর প্রদীপের কাঁপা কাঁপা আলো চুম্বকের মত আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করত আর তার সংগে থাকত নরম সুরে মন্ত্র উচ্চারণের গুরুগম্ভীর আওয়াজ। এতে এমন একটা পবিত্র রহস্যের সৃষ্টি হত যা আমাকে মোহিত করে রাখত। হাজার হাজার হিন্দু দেব-দেবীর মধ্যে থেকে আমাদের পরিবার তাদের কতগুলো প্রিয় দেব-দেবীকে বেছে নিয়েছিলেন। ছোট ছিলাম বলে তখনও আমি বুঝতাম না ঐ মূর্তি কিসের প্রতীক, তবুও ভিতরে কিছু একটা অনুভব করতাম এবং বেদীর উপর দাঁড় করানো মূর্তিগুলোর শক্তিকে এবং দেয়ালের ছবিগুলোকে ভয় করতাম। ঐ ছবিগুলোর গায়ে আমরা পবিত্র মালা ঠাংগিয়ে রাখতাম। মনে হত মাটি, কাঠ, পিতল, পাথর ও রংগীন কাগজ দিয়ে তৈরী ঐ মূর্তিগুলোর পলকহীন চোখ আমি না তাকালেও আমার দিকে তাকিয়ে আছে। মনে হত ঐ অনুভূতিহীন মূর্তিগুলো কোন অদ্ভুত উপায়ে আমার চেয়েও বেশী জীবিত এবং অলৌকিক ভাবে এমন শক্তি ধারণ করে যা আমাদের সবাইকে ভয় ধরিয়ে দেয়।

সকাল ও সন্ধ্যার পূজা শেষ হয়ে গেলে আমার মাসীমারা, মামারা ও তাঁদের ছেলেমেয়েরা তাঁদের জাগতিক কাজে চলে যেতেন, কিন্তু মা ও আমি কিছুক্ষণ সেখানে একত্রে কাটাতাম। সেই সময় খুব ধৈর্য ধরে মা আমাকে শিক্ষা দিতেন। শিক্ষা দিতেন কেমন করে দেব-দেবতা পূজার মধ্য দিয়ে একজন দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হিন্দু হতে হয় এবং ধর্মীয় কর্তব্যে অটল থাকতে হয়। এটাই হল সর্ব প্রথম কাজ, আর সব কিছু তার পরে। তাঁর মুখ থেকেই আমি প্রথম বুঝতে পারলাম যে, আমার গত জন্মের কর্মের জন্যই আমি উঁচু জাতে জন্মগ্রহণ করতে পেরেছি। আমি ছিলাম ব্রাহ্মণ, পৃথিবীতে ব্রাহ্মণ জাতের, অর্থাৎ একমাত্র প্রকৃত সত্যের একজন প্রতিনিধি। সত্যিই আমি ব্রাহ্মণ ছিলাম— আমার জন্য এটা ছিল আমার প্রকৃত সত্বাকে বুঝতে পারা।

তারপর ২৫ বছর পার হয়ে গেছে কিন্তু মনে হচ্ছে যেন মাত্র ২৫

দিন হয়েছে আমি এখনও যেন মায়ের মৃদু, পরিষ্কার গলার স্বর শুনতে পাচ্ছি তিনি ভগবদ্‌গীতা থেকে তাঁর প্রিয় অংশ শ্রীকৃষ্ণের বিষয় পড়ছেন—

> "যোগীকে কোন গোপন জায়গায় একা থেকে চিন্তাশূন্য অবস্থায় আত্মদমন করে আশা ও আকাংখা মুক্ত হয়ে অনবরত যোগ অভ্যাস করতে হবে। চিন্তা ও অনুভূতি দমন করে তার আসনে স্থির থেকে নিজেকে বিশুদ্ধ করার জন্য যোগ অভ্যাস করতে হবে। দেহ, মাথা ও ঘাড় সোজা রেখে, অনড় ও স্থির হয়ে নাকের ডগার দিকে চেয়ে থাকতে হবে... ব্রহ্মচর্যের শপথে দৃঢ় থেকে, মনকে দমনে রেখে আমার (শ্রী কৃষ্ণের) বিষয় চিন্তা করতে হবে... এইভাবে যোগী আমার সংগে যুক্ত হয়ে আমার মধ্যে যে শান্তি ও পরম সুখ আছে তার মধ্যে ডুবে যাবে।"

গীতার কথা অনুসারে প্রকৃত যোগ সাধনার প্রভু ও উৎস হলেন শ্রীকৃষ্ণ আর আমার বাবা ছিলেন তাঁর একজন খাঁটি শিষ্য। বছর চলে যেতে লাগল তাড়াতাড়ি, আর এই অনুভূতি আমার মধ্যে গভীর থেকে গভীরতর হতে থাকল আর শেষে আমি নিজেই একজন যোগী হলাম।

মায়ের মুখ থেকে নির্দেশ পেয়ে এবং বাবার নিখুঁত আদর্শে পরিচালিত হয়ে আমার পাঁচ বছর বয়স থেকে প্রতিদিন আমি ধ্যান করা অভ্যাস করেছিলাম। পদ্মাসন করে বসে, শিরদাঁড়া সোজা রেখে আমি শূন্যের দিকে তাকিয়ে থাকতাম। আমি বাবাকে অনুকরণ করতাম যাঁকে তখন আর আমার বাবা বলে মনে হত না, মনে হত তিনি দেবতা। মা চুপি চুপি মাঝে মাঝে আমাকে বলতেন, "তুমি যখন ধ্যান কর তখন তোমাকে একেবারে তোমার বাবার মত দেখতে লাগে। তুমি একদিন একজন বড় যোগী হতে পারবে।" এ কথা বলার সময় তাঁর গলায় গর্বের সুর ফুটে উঠত। তাঁর কোমল কথায় আমার সিদ্ধান্ত আরও দৃঢ় হত, মনে হত আমি তাঁকে কখনও হতাশ করব না।

মায়ের বয়স কম হলেও তিনি তাঁর অস্বাভাবিক দায়িত্ব একাই কাঁধে নিয়েছিলেন। তাঁর বড়লোক বাবাকে তিনি কখনও জানতে দিতে চাইতেন না যে, আমাকে খাওয়াবার জন্য মাঝে মাঝে তাঁকে প্রতিবেশীদের কাছ থেকে ভাতের মাড় চেয়ে আনতে হয়। আমি তখন একেবারে ছোটি ছিলাম। আমার দাদু, যাঁকে আমরা নানা বলতাম, তিনি শেষে জানতে পেরে মাকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। মায়ের বোন রেবতী মাসীমা সব সময় বাপের বাড়ীতে থাকতে চাইতেন। তিনি মাঝে মাঝে তাঁর এক দংগল ছেলেপুলে নিয়ে হাজির হতেন এবং কেঁদে কেঁদে দাদুর কাছে আশ্রয় ভিক্ষা করতেন আর তাঁর মাতাল স্বামীর ভাঁষণ মারের সদা দাগগুলো দেখাতেন। স্ত্রীকে মারধর করা ছিল একটা সাধারণ ব্যাপার। কাজেই কয়েক সপ্তা পরে রেবতী মাসীমা একটু সুস্থ হলে পর দাদু তাঁকে আবার ফেরৎ পাঠিয়ে দিতেন। ঐ লোকটার সংগে তিনিই তো তাঁর এই মেয়ের বিয়ের বন্দোবস্ত করেছিলেন এবং তাঁর কথায় স্থির থাকার সুনাম অর্জন করেছিলেন। রেবতী মাসীমা মার খেয়ে সারা গায়ে কালশিরা নিয়ে ছেলেপুলে সহ উপস্থিত হতেন — অবশ্যই গর্ভবতী অবস্থায়। তারপর সন্তানের জন্ম হয়ে গেলে দাদু আবার তাঁকে স্বামীর ঘরে পাঠিয়ে দিতেন। পঞ্চম সন্তান জন্মের পরে দাদু মারা গেলে রেবতী মাসীমা বাপের বাড়ীর বিরাট দালানে আমাদের সংগেই রয়ে গেলেন। মাসীর ছেলেমেয়েদের পেয়ে আমি খুব খুশী হলাম। একান্নবর্তী হিন্দু পরিবারে যেমন হয়ে থাকে ঠিক তেমনি দাদুর বংশধরদের মধ্যে ১৫ থেকে ২০ জন লোক সবসময়ই তাঁর বাড়ীতে থাকত— তাঁদের মধ্যে ছিলেন মাসীমারা, মামারা, তাঁদের ছেলেমেয়েরা ও দিদিমা। নানীকে অর্থাৎ দিদিমাকে আমরা আদর করে "মা" বলে ডাকতাম।

দাদু যখন মারা যান তখন আমি খুব ছোটি। মা আর আমি তাঁর কামরায় ঘুমাতাম। তাঁর মৃত্যুর বেশ অনেক দিন পরেও নীচের তলায় তাঁর মদের দোকানে ও নানা রকম মালের দোকানে এবং উপর তলায় তাঁর বিরটি শোবার ঘরে তাঁর ভারি, বিরক্তিপূর্ণ পায়ের আওয়াজের

প্রতিধ্বনি শোনা যেত। সেই সময়ে মনে হত তাঁর আত্মা যেন তাঁর তৈরী দুর্গের মত বিরটি পাকা বাড়ীটার ভিতরটা ঢেকে রেখেছে। যারা পৃথিবীর নিম্নস্থ ইন্দ্রিয়াতীত শক্তিতে বিশ্বাস করে না তারা এটাকে মনে করবে কুসংস্কার অথবা একটা রোগ। আমরা কিন্তু চিলে কোঠায় তাঁর পায়ের আওয়াজ শুনতে পেতাম—তিনি থপ্ থপ্ করে এদিক-ওদিক হাঁটছেন। আবার রাতের বেলায় ঘুমাতে গেলে তাঁর পায়ের শব্দ শোবার ঘরের দরজার বাইরে শোনা যেত। এমন কি, অতিথিদেরও সেই একই অভিজ্ঞতা হত। এমন কোন অতিথি ছিলেন না যাঁকে রাতের বেলা অদৃশ্য হাতে শারীরিকভাবে আক্রমণ করা না হত। তাঁরা অশরীরী আত্মাও দেখতেন। এই রকম অভিজ্ঞতার পরে কোন কোন আত্মীয়-স্বজন আর এ বাড়ীতে রাত কটাতে চাইতেন না। কিন্তু আমাদের নিজেদের বাড়ী বলে সেখানে আমাদের থাকতেই হত।

আমার দাদু হিন্দু অশরীরী আত্মাদের সংগে গভীরভাবে সংযুক্ত ছিলেন এবং যারা এই সব অলৌকিক শক্তিগুলোকে ব্যবহার করতে না শিখে কেবল ধর্ম নিয়ে দার্শনিকের মত আচরণ করেন তাঁদের তিনি সমালোচনা করতেন। আমি বড় হলে পর, দিদিমা আমার উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এমন একটা গুপ্ত বিষয় আমাকে জানিয়েছিলেন যা অনেক বছর ধরে তিনি নিজের মনেই গুপ্ত রেখেছিলেন। রেবতী মাসীমা ছাড়া আর কাউকে তিনি সে কথা বলেন নি। কথাটা হল দাদু তাঁর প্রথম ছেলেকে তার একজন প্রিয় দেবতার কাছে বলি দিয়েছিলেন। তখনকার দিনে এটা এমন কোন অসাধারণ কাজ ছিল না, তবে প্রকাশ্যভাবে কেউ তা বলত না। দাদুর প্রিয় দেবী ছিলেন লক্ষ্মী—রক্ষাকর্তা বিষ্ণুর স্ত্রী। লক্ষ্মী হলেন ধন ও উন্নতির দেবী। এই দেবী তাঁর মহা ক্ষমতা দেখিয়েছিলেন যখন দাদু প্রায় এক লাফে আমাদের দেশ ত্রিনিদাদের সবচেয়ে ক্ষমতাশালী ও ধনীদের একজন হয়ে উঠেছিলেন। এটা দেখা গিয়েছিল যখন নিজের পরিবার ও ব্যবসার জন্য তাঁর তৈরী কুঁড়েঘর রহস্যজনক ভাবে পুড়ে গেল আর সেখানে তৈরী হল বিরটি একটা দালান।

কোথা থেকে হঠাৎ এত টাকা পাওয়া গেল কিম্বা নতুন বাড়ীর মেটা দেয়ালে গাঁথা বিরটি সিন্দুকের মধ্যে গাদা করা সোনাই বা তিনি কোথা থেকে পেলেন তা কেউ জানত না। ভারত থেকে বাস করতে আসা লক্ষ লক্ষ লোক ও তাদের বংশধরদের মধ্যে কেউই হঠাৎ এবং এত সহজে ধন অর্জন করতে পারে নি। আমরা সবাই বিশ্বাস করতাম যে, শক্তিশালী দেবতারাই দাদুকে এ বিষয়ে সাহায্য করেছেন এবং তার বদলে তিনি নিজেকে তাঁদের দান করেছেন।

আমরা যে জায়গায় বাস করতাম সেখানকার নাম ছিল "লক্ষ্মণ সিং জংশন"। দাদুর নামেই জায়গাটার নামকরণ হয়েছিল। ত্রিনিদাদে বাসকারী পূর্ব ভারতীয় অধিবাসীদের বিরটি দলের মধ্যে দাদুকে হিন্দু নেতাদের মধ্যে একজন বলে ধরা হত। তাঁর রহস্যজনক অলৌকিক শক্তিকে কেউ অস্বীকার করতে পারত না বা তা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতেও সাহস পেত না। সবাই জানত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হবার সংগে সংগে দাদু তাঁর বিরটি সম্পত্তির কোন এক জায়গার মধ্যে এক কোটি সোনার টাকা পুঁতে রেখেছেন, যা অশরীরী আত্মারা পাহারা দিচ্ছে। সেই টাকা যে তিনি কোথায় পুঁতে রেখেছেন তা কেউ জানত না। সেই আত্মাদের অগ্রাহ্য করে সেই গুপ্তধনের খোঁজ করতে কেউ সাহসও করত না। এমন কোন যাদুকর ছিল না, যে তার সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষমতাশালী যাদুবিদ্যা ব্যবহার করে সেই গুপ্ত জায়গার স্থান নিরূপণ করতে পেরেছে। সেই অমূল্য সোনার টাকাগুলো, যার মূল্য এখন অনেক, তা আজও লুকানোই রয়েছে।

দাদু এই রহস্যময় শক্তিকে তাঁর টাকা পয়সার চেয়ে বেশী মূল্যবান মনে করতেন। তাঁর মজবুত লোহার সিন্দুকের মধ্যে একটা জিনিষ ছিল যা তিনি কোন মূল্যেই বিক্রি করবেন না বলে স্থির করেছিলেন। সেটা ছিল ভারত থেকে আনা একটা ছোটি সাদা পাথর। সুস্থ করা ও অভিশাপ দেওয়া আত্মার শক্তি সেই পাথরের মধ্যে ছিল। কড়িকে সাপে কটিলে সেই কটা জায়গায় পাথরটা ধরলে বিষ বের হয়ে আসত। আমি নিজে যদিও ঐ ব্যাপার কখনও চোখে দেখি নি

তবুও বিশ্বাসযোগ্য লোকের কাছ থেকে শুনেছিলাম। আমার এক মামা আমাকে বলেছিলেন যে, তিনি একবার কৌতূহল বশতঃ দাদুর ব্যক্তিগত ঘরের দরজা খুলেছিলেন। সেই ঘরে দাদুর সিন্দুক থাকত। সেখানে একটা বিরটি সাপ কেবল যে দাদুর টাকা-পয়সা আর কাগজপত্র পাহারা দিত তা নয়, কিন্তু সেই কামরায় এমন কোন গুপ্ত বিষয় ছিল যা সেখানে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলা হত তা-ও সেই সাপ পাহারা দিত। অনেকে মনে করত সাপটা আসলে সত্যি সাপ নয়। কোন আত্মা সাপের আকার ধারণ করে সেখানে রয়েছে। দাদুর মৃত্যু হয়েছিল ৬৩ বছর বয়সে। হার্টের অসুখে তিনি হঠাৎ মারা গিয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর অনেক দিন পরে আমি নিজেই সেই বিরটি, চক্‌চকে সাপটাকে বাড়ীর নীচে লুকিয়ে থাকতে দেখেছি।

হিন্দুদের কাছে সাপ হল দেবতা। আমি আমার ঘরে চমৎকার একটা সাপ রেখেছিলাম। ওটা জ্যান্ত ছিল আর আমি ওটাকে পূজা করতাম, ঠিক যেমন করে আমি পূজা করতাম বাঁদর, হাতি ও গরু দেবতাদের। আমার কাছে সেই হতভাগ্য অস্পৃশ্য লোকেরা ছাড়া আর সব জিনিষই ছিল দেবতা। আমার জগতটা আত্মা, দেব-দেবতা ও রহস্যময় শক্তি দিয়ে ঘেরা ছিল এবং ছেলেবেলা থেকে আমার কর্তব্য ছিল যাঁর যা প্রাপ্য তাঁকে তা দেওয়া।

এটাই ছিল আমার বাবার বংশগত শিক্ষা। তিনি নির্ভুলভাবে শ্রীকৃষ্ণ ও বড় বড় যোগী, যাঁরা মারা গেছেন, তাঁদের পদানুসরণ করে চলতেন। আমার মা আমাকে তা-ই করতে বলতেন। এই বিষয়ে আমি কখনও কোন সন্দেহ করি নি। বাবা একটা আদর্শ স্থাপন করে গেছেন, সকলের প্রশংসা কুড়িয়েছেন এবং অনেকের পূজা পেয়েছেন। কাজেই তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর কাজ যে আমার উপরেই চাপবে তাতে কোন সন্দেহ ছিল না। আমি ভাবতেও পারি নি যে, আমার উপর এমন একটা ভয়ংকর দিন আসবে যখন দেবতারা আমাকেই তাঁদের কাজে নিযুক্ত করবেন।

২

একজন অবতারের মৃত্যু

কুমার মামা একদিন তাঁর ছেলেদের "মাংকি পয়েন্ট" উপসাগরে সাঁতার কটার জন্য নিয়ে যাচ্ছিলেন। দলের মধ্যে একজন ব্রাহ্মণের উপস্থিতি সম্মানজনক ছিল এবং তাতে সৌভাগ্যের নিশ্চয়তা হত। আমি যেন রাজপুত্র সেভাবেই সবাই আমার সংগে ব্যবহার করত, আর আমিও নিজেকে সেই রকমই ভাবতাম। মামাতো ভাইয়েরা সেদিন আমাকে অনুরোধ করে বলল, "রবি, আমাদের সংগে চল।"

মাথটা দৃঢ়ভাবে নেড়ে বললাম,"না, আজকে যাব না। আমি একটা ধর্মীয় ছবি আঁকছিলাম। সেটা বেশ জটিল ছিল, আর সেটা শেষ করবই বলে আমি স্থির করেছিলাম।

সান্দ্রা আর শান্তি একসংগে বলতে লাগল, "চল না, চল না।"

"আমি যেতে পারব না।" ঐটুকু বলাই যথেষ্ট ছিল, কারণ বাড়ীর সবাই জানত আমার জন্য ধর্মীয় কর্তব্য ও উপাসনা হল সর্বপ্রথম কাজ। আমি ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে আমার প্রিয় দেব-দেবতাদের ছবি আঁকতাম—শ্রীহনুমান, শিব, শ্রীকৃষ্ণ, গনেশ ও আরও অনেকের। আমি তখন একজন অতীন্দ্রিয়বাদী হয়ে গেছি। আমি দেব-দেবতাদের সংগে একত্ববোধ করতাম। সাঁতার কটার জন্য সাগর পারে যাওয়া কিম্বা বন্ধুদের সংগে উঠানে বা কাছের মাঠে খেলাধূলা করার চেয়ে আমার দেবতাদের ছবি আঁকা আমার কাছে অনেক বড় ছিল। ছবিতে গাঢ় করে রং দিয়ে সেগুলো আমার কামরার দেয়ালে টাংগিয়ে রাখতাম যেন সেগুলো আমার কাছাকাছি থাকে। আমি তাদের পূজা করতাম।

নিজের জীবনটা আমি হিন্দুধর্মের কাছে উৎসর্গ করে দিয়েছিলাম। এই ধর্ম যে সবচেয়ে পুরানো, সর্বশ্রেষ্ঠ ও একমাত্র সত্য ধর্ম তা আমার মা-ই আমাকে শিখিয়েছিলেন।

বাবার সেবা-শুশ্রূষা করবার সময় মা সর্বদা আমাকে সংগে নিতেন; কিন্তু তখন বাবা তাঁর সৎ বোন মোহানীর কাছে থাকতেন বলে মা সেদিন আমাকে সংগে না নিয়ে একাই তাঁকে দেখতে গিয়েছিলেন। এতে আমার খুব দুঃখ হয়েছিল এবং মেজাজটা বেশী ভাল ছিল না। কিন্তু দেব-দেবতাদের ছবি আঁকতে আঁকতে আমার মনের দুঃখের ভাবটা দূর হয়ে গিয়েছিল। ছোটি ছোটি আংগুলে রংয়ের পেন্সিল ধরে আমার আঁকা বিষ্ণুর ছবিতে আমি রং দিচ্ছিলাম। মনে মনে ভাবছিলাম মা ফিরে এসে আমার আঁকা ছবি দেখে কি খুশীই না হবেন! সেটা ছিল নারায়ণের ছবি যাঁর চারটি হাত। তিনি অনন্ত নামে সাপের কুণ্ডলীর উপর শুয়ে আছেন এবং তাঁর সেবা করছেন লক্ষ্মী আর ব্রহ্মা। একটা পদ্মফুলের উপর বসে আছেন ব্রহ্মা আর সেই পদ্মফুলটা বের হয়ে এসেছে বিষ্ণুর নাভি থেকে... এঁরা সবাই একটা কচ্ছপের উপরে চড়ে রয়েছেন আর সেই কচ্ছপটা ভেসে রয়েছে আদিম সমুদ্রের উপরে।

এখানে আর একটু রং দিয়ে, ওখানে একটু মুছে দিয়ে আমার কাজে সন্তুষ্ট হয়ে আমি আস্তে আস্তে গুণ্ গুণ্ করে বলছিলাম, "ওম্ শিবঃ,ওম্ শিবঃ, ওম্ শিবঃ" এমন সময় মায়ের পরিচিত পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম। তিনি বাইরের সিঁড়ি দিয়ে তাড়াতাড়ি করে উপরে উঠে আসছিলেন। রান্নাঘরের দরজা দড়াম করে খুলে গেল, তারপর শোনা গেল কতগুলো উত্তেজিত কন্ঠস্বর। আমার কামরা থেকে আমি বের হতে যাচ্ছিলাম এমন সময় যা শুনতে পেলাম তাতে দরজার কাছেই থেমে গেলাম।

"মারা গেছেন! চন্দ্রভান মারা গেছেন!" আমি যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম সেখান থেকে আর নড়তে পারলাম না। সবাই একসংগে কথা বলছিল বলে তার পরের কথাগুলো আমি আর শুনতে পেলাম না।

"ঘুম থেকে আজ ওঠার সংগে সংগে আমার কেমন যেন খারাপ

লাগছিল।" মায়ের গলার স্বর দুঃখে ভারি হয়ে গেলেও তা স্পষ্ট এবং জোরে শোনা গেল।

"আমি তাড়াতাড়ি সেখানে গিয়ে দেখলাম নার্স তাঁর চুলগুলো কটিতে শুরু করেছে। ডাক্তার তা কটিবার আদেশ দিয়েছেন।"

রেবতী মাসীমা জিজ্ঞাসা করলেন, "কিন্তু কেন তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল? তাঁর তো অসুখ হয় নি, হয়েছিল কি?";

"এটা হল বিষ্ণুর কাজ। চন্দ্রভানকে দেখলে মনে হত তিনি ভেতরে ভেতরে সব সময় শক্ত ও শান্ত।"

বেশ কিছুক্ষণ সবাই চুপচাপ ছিল, তারপর মা যেন তাঁর স্বর ফিরে পেয়ে বললেন, "তারা তাঁর চুল কেটে দিয়েছিল— ডাক্তার বলেছিলেন, হাসপাতালের মধ্যে স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য তাঁর সেই লম্বা চুল ভাল নয়। যখন তারা চুল কটিছিল তখন তিনি পিছন দিকে ঢলে পড়লেন। আমি তাঁর কাছে দৌড়ে গেলাম। আমরা তাঁকে জল খাওয়াবার চেষ্টা করলাম— কিন্তু ডাক্তার জানালেন যে, উনি মারা গেছেন। এ কি বিশ্বাস করা যায়? এইভাবে...।"

আমি দৌড়ে আমার বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লাম আর বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজে দিয়ে বুকের মধ্যে যে কান্নার ঢেউ ফুলে ফুলে উঠছিল তা এবং গলার আওয়াজ থামাবার চেষ্টা করছিলাম। যদিও বাবা হিসাবে আমি তাঁকে বলতে গেলে জানতামই না, তবুও মনে হচ্ছিল যেন আমি সব কিছু হারিয়ে ফেলেছি। আমার কাছে তিনি ছিলেন আমার অনুপ্রেরণা, একজন দেবতা, একজন অবতার— আর এখন তিনি মৃত। আমি অবশ্য জানতাম যে, তাঁর এই মৃত্যু এগিয়ে আসছে। গোঁসাই যেদিন বাবার বিয়ের ঘটনা আবার আমার কাছে বলছিলেন সেদিনই আমি কথাটা আমার অন্তরে বুঝতে পেরেছিলাম। আর সেটাই এখন ঘটল। আমি তাঁকে কোন দিনও কথা বলতে দেখব না। কত প্রশ্নই না আমার তাঁকে জিজ্ঞাসা করার ছিল। তিনি এত বেশী জানতেন যে, আমি আশা করেছিলাম কোন একদিন তাঁর মুখ থেকেই আমি জানতে পারব। সবচেয়ে বেশী করে চাইতাম যেন তিনি আমার নাম

ধরে আমাকে ডাকেন আর বলেন আমি তাঁর ছেলে।এখন সেই স্বপ্ন চিরকালের জন্য মুছে গেল।

কাঁদতে কাঁদতে ক্লান্ত হয়ে শেষে আমার কান্না এক সময় থেমে গেল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত আমি চুপ করে শুয়ে রইলাম আর ভাববার চেষ্টা করতে লাগলাম— অর্জুনকে যুদ্ধে পাঠাবার আগে শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে যে সব কথা বলে ছিলেন। কিন্তু তাতে বিশেষ কোন উপকার হল না। সেই কথাগুলো আমি এতবার শুনেছি যে, প্রায় মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল—"যারা জ্ঞানী তারা জীবিত বা মৃত কারও জন্য শোক করে না... আমাদের অস্তিত্ব কখনও শেষ হয়ে যায় না... দেহে যা বাস করে তা মৃত্যুর পর অন্য দেহ প্রাপ্ত হয়; যারা স্থিরচিত্ত তারা শোক করে না।"

একটা ভারি বোঝা বইবার মত অসংযত পায়ে ধীরে ধীরে আমার কুমার মামা ঘরে ঢুকলেন বাবার মৃত্যু সংবাদ আমাকে দেবার জন্য। তিনি জানতেন না যে, খবরটা আমি আগেই জেনেছি। খবরটা আমাকে দেবার মত শক্তি আমার মায়ের তখন ছিল না। আমি খবর শুনে চুপ করে ছিলাম বলে মামা ভাবলেন আমি সাহসের সংগেই খবরটা গ্রহণ করেছি; কিন্তু তিনি জানতেন না যে, শোকে-দুঃখে আমি এত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম যে তা বাইরে দেখাবার মত শক্তি তখন আমার ছিল না।

আমার বাবার এমন হঠাৎ ও রহস্যময় মৃত্যুতে পরিবারের সকলেই যে কেবল ভীষণ আঘাত পেয়েছিলেন তা নয় অন্যেরা যারা তাঁকে জানতেন তাঁরাও পেয়েছিলেন। ডাক্তারেরা পর্যন্ত এর কোন চিকিৎসাগত ব্যাখ্যা দিতে পারেন নি। তাঁর স্বাস্থ্য বেশ ভালই ছিল। তাহলে তাঁর কি আত্মোপলব্ধি হয়েছিল, যার ফলে তাঁর আত্মা পুনর্জন্মের চাকা থেকে রেহাই পেয়ে উড়ে চলে গেল? কথাটা আমি বিশ্বাস করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু অনেকে ভেবেছিলেন তিনি নিশ্চয়ই তাঁর শপথ ভেংগেছিলেন আর সেজন্যই যমদূত তাঁর প্রাণ নিয়ে গেছে। একথা তাদের বলা অন্যায় বলেই আমার মনে হল। কোথাও

না যাওয়ার শপথ তিনি নিজে ভাংগেন নি, বিষ্ণুই তো তাঁকে হাসপাতালে পাঠিয়েছিলেন, আর ডাক্তারেরা কেউ হিন্দু ছিলেন না। তাঁরা এই অলৌকিক শক্তির বিষয় কিম্বা ব্রহ্মচর্যের ব্রত সম্বন্ধে কিছুই জানতেন না। ভগবদ্‌গীতাতে শ্রীকৃষ্ণের যে নির্দেশাবলী আছে আমার বাবা আন্তরিকরতার সংগে তা মেনে চলতেন। বিষ্ণুর এ কথা জানা উচিত ছিল, কারণ তিনি হিন্দু এবং হিন্দু পরিবারে বড় হয়েছেন এবং শিক্ষাও পেয়েছেন। কিন্তু তিনি মনে করতেন যোগীর জীবন কাটানো একটা প্রহসন মাত্র। দেব-দেবতা আর অশরীরী আত্মার শক্তি কেবল পণ্ডিতদের ধারণা এবং কতগুলো চালাকীর খেলা। কিন্তু আমি বিষ্ণুর মত ভুল করি নি। আমি জানতাম হিন্দু ধর্মের প্রতি আমার বিশ্বাস কখনও টলবে না। আমরা এই শিক্ষা পেয়েছিলাম যে, আমরা যা বুঝি না তা তুচ্ছ করতে নেই। শিক্ষাটা অবশ্য খুব দামীই ছিল।

পূয়া মোহানীর বাড়ীর বসবার ঘরের টেবিলের উপর অমসৃণ কাঠের বাক্সটা রাখা ছিল। সেখানে গিয়ে আমি খুব সাবধানে ছিলাম যাতে আমার চোখ গিয়ে সেই বাক্সের উপরে না পড়ে। মৃতদেহ যতক্ষণ ঘরে থাকবে ততক্ষণ সমস্ত আচার-অনুষ্ঠান খুব ভালভাবে চলতে হবে সেই ঘরে কোন আগুন জ্বলবে না, মৃত ব্যক্তি পরজগতে যাত্রার আগে কোন কিছু রান্না করা যাবে না। এদিকে পণ্ডিতেরা অনেকক্ষণ পূজা করছিলেন আর বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনেরা বিলাপ করছিলেন।

আমার বাবার প্রতি অতি আগ্রহশীলা শিষ্যা পূয়া শোক প্রকাশে সকলকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। আমি মায়ের পাশে জড়োসড়ো হয়ে বসে ছিলাম। নটিকের একজন বিশিষ্ট চরিত্র হিসাবে আমার যে করণীয় অংশ ছিল তার বিরুদ্ধে বালকসুলভ প্রতিরক্ষায় আমার নিজের মধ্যে আমি সংকুচিত হয়ে গেলাম।এ সব আমি ধারণাও করতে পারছিলাম না। পূজা শেষ হবার পর একজন দয়ালু প্রতিবেশী আমাকে মায়ের কাছ থেকে সরিয়ে বাবার মৃতদেহের কাছে নিয়ে গেলেন।

আমি যেন জানি না এই ভাবেই তিনি আমাকে বললেন, "ঐ যে,

তোমার বাবা।" বাবার কথা মনে করিয়ে দেওয়াতে আমি কেমন সংকুচিত হয়ে গেলাম।

এই যে দেবতা, এই অবতার, যাঁর সামনে গিয়ে আমি প্রায়ই দাঁড়াতাম এবং গভীর আকাংখা নিয়ে তাকিয়ে থাকতাম তিনি এখন আগের মতই আমার কাছ থেকে দূরেই রয়ে গেলেন। মৃত্যুতে তাঁর কোন পরিবর্তন দেখা গেল না। মুখের ভাব প্রায় একই রকম রয়ে গেছে, কেবল মুখটা একটু ফ্যাকাশে হয়েছে। প্রাচীন আর্য জাতির বংশোদ্ভূত ব্রাহ্মণেরা সাধারণতঃ অন্যান্য ভারতীয় জাতিদের চেয়ে ফরসা হয় আর আমার বাবা ছিলেন ব্রাহ্মণদের চেয়ে আরও ফরসা। এখন তাঁকে ইংরেজদের মত সাদা দেখাচ্ছে। তাঁর বন্ধ থাকা চোখের পাতা মোমের মূর্তির চোখের মত লাগছিল। আমি সেই প্রতিবেশীর হাত ছাড়িয়ে সেখান থেকে সরে গেলাম।

মৃতদেহ নিয়ে যাওয়ার শোভাযাত্রা ছিল অনেক লম্বা, কারণ আমার বাবাকে সবাই ভালবাসত এবং দূরের ধার্মিক হিন্দুরা তাঁকে শ্রদ্ধা করত। মেটিরগাড়ী, বাইসাইকেল ও গরুর গাড়ীতে শোকার্ত লোকেরা সরু রাস্তা ধরে দু'মাইল পশ্চিমে সাগর পারের দিকে চলেছিল। আমি হতবুদ্ধি হয়ে ভয়ে মাকে জিজ্ঞাসাও করতে পারছিলাম না যে, কেন বাবাকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে না যেখানে কিছুদিন আগে দাদুকে কবর দেওয়া হয়েছিল? কেন বাবাকে "মাংকি পয়েন্টে" নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, যেখানে আমরা সব সময় সাঁতার কটিতে যাই? আমার বাবার মৃত্যুকে ঘিরে যে রহস্যবোধ আমার মনে জেগেছিল প্রশ্নটা কেবল তার সংগে যুক্ত হল। প্রশ্নটা আমার মনের মধ্যেই রাখলাম আর মায়ের হাতখানা আমি আরও শক্ত করে ধরলাম।

আমার বাবার মৃতদেহ যাতে করে বয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল আমি খুব সর্তক ছিলাম যাতে সেদিকে আমার চোখ না পড়ে। মৃতদেহের আগে আগে যে গাড়ীটা যাচ্ছিল তাতে বাঁকা হয়ে বসে আমি সরু রাস্তার দুপাশে আখ ক্ষেতের দিকে তাকিয়ে রইলাম। নিশ্চুপ ও

গম্ভীরভাবে দাঁড়িয়ে থাকা আখগুলো আস্তে আস্তে আমার চোখের আড়াল হ'ছিল। আমার মনে হচ্ছিল সবুজ লম্বা লম্বা পাতাগুলো যেন দুঃখে মাথা নীচু করে রয়েছে।আসলে ঐ রকমই তো হতে হবে। কারণ মানুষ, পশু, সব জড় পদার্থ ইত্যাদি জগতের সব কিছুরই একটা সাধারণ অস্তিত্ব রয়েছে। আমার মনে হচ্ছিল গোটা প্রকৃতিই এই অবতারের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করছে। আর কখনও কি মানুষের আকারে এইরকম স্বর্গীয় আবির্ভাব হবে? এই সব পণ্ডিতেরা অর্থাৎ মহাজ্ঞানী ব্রাহ্মণেরাও তা বলতে পারেন না।

পূব দিক থেকে বিষুব রেখার দিকে যে আয়ন বায়ু বইতে থাকে, সেই বাতাস সাধারণতঃ সবসময় বইবার কথা, কিন্তু সেদিন সেই বাতাস ছিল ভারী, গরম ও কষ্টদায়ক ভাবে স্থির। দূরে অস্তাচলের দিকে, "পারিয়া উপসাগরের"ওপারে আমি দেখতে পেলাম ঘন কালো মেঘ পরিচিত ড্রাগনস্ মাউথের উপরে ঘোরাফেরা করছে। ওখানেই আমার মাতৃভূমি ত্রিনিদাদের উত্তর কোণটা উঁচু হয়ে পশ্চিম দিকে যেন গলা বাড়িয়ে নিকটবর্তী ভেনেজুয়েলার উপকূল স্পর্শ করার চেষ্টা করছে। আমার মনে পড়ে গেল আমার মামার ছেলেদের ও বন্ধুবান্ধবদের সংগে কেমন করে এই সরু পথ দিয়ে আমি হাসতে হাসতে, লাফাতে লাফাতে সাঁতার কটিতে যেতাম। জীবনের উত্তাপে কপালের দুপাশের শিরা দপ্‌দপ্ করত। যাবার পথে আনন্দের উল্লাসে আমি মাইল নির্দেশক প্রত্যেকটা পরিচিত খুঁটি ছুঁয়ে ছুঁয়ে যেতাম। মৃতদেহ নিয়ে সেই লম্বা শোভাযাত্রা আস্তে আস্তে এগিয়ে যাবার সময় আখক্ষেত থেকে মজুরেরা যখন আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে দেখছিল তখন আমি আমার ভেতরে একটা ভয়ার্ত অসাড়তা, এবং হতবুদ্ধি হয়ে যাওয়া মজুরদের মতই বিচ্ছিন্নতা অনুভব করছিলাম। আমার কাছে ঐ মজুরেরা এখন যেন অন্য জগতের একটা অংশ, যে অংশে একদিন আমিও ছিলাম।

আখের ক্ষেত পিছনে ফেলে শোভাযাত্রা সেই পথ ধরল যার দুপাশে রয়েছে গরান গাছশুদ্ধ বিস্তীর্ণ জলাভূমি। সেই জলাভূমি

আমাদের দ্বীপটার পশ্চিম দিকের উপরে ও নীচে চলে গেছে। আমাদের গাড়ীটা নুড়ি পাথরে ভরা এমন একটা জায়গায় এসে থামল যার কিছু নীচ দিয়ে ছোটি উপসাগরটার জল এসে আছড়ে পড়ছিল। জায়গাটা যাতে ঝড় থেকে রক্ষা পায় সেজন্য সেখানে একটা নীচু পাকা দেয়াল গাঁথা হয়েছিল। ছুটির দিনে এবং স্কুল ছুটির পরে বড় ছেলেরা সেই দেয়ালের উপর থেকে লাফ দিয়ে দিয়ে অগভীর জলে পড়ত আর কিনারা থেকে দূরে সাঁতার দিয়ে যেত। আমি তখনও ঐ ভাবে সাঁতার দেওয়ার মত বড় হই নি। যে জায়গায় গাড়ী থামে আমি ও আমার ছোটি ছোটি বন্ধুরা তার পিছনে ঐ গরান গাছের কাছে অগভীর জলের মধ্যে গিয়ে জল ছিটাতাম। এই পরিচিত ও প্রিয় জায়গাটার সংগে যে সুখ স্মৃতি জড়িত তা এখন আমার কাছে কত অবাস্তব বলে মনে হচ্ছিল। যদিও সূর্যের তেজ তখন প্রখর ছিল তবুও গাড়ী থেকে নামবার সময় আমার কাঁপুনি ধরল।

কাঠের তক্তার উপরে শোওয়ানো মৃতদেহটি তক্তাশুদ্ধ গাড়ী থেকে টেনে নামিয়ে আমার সাঁতার দেওয়ার গর্তের ধারে নিয়ে যাওয়া হল। যাবার সময় পূয়া মোহানীর পণ্ডিত মন্দ আত্মাদের তাড়াবার জন্য সংস্কৃতে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করছিলেন। মৃতদেহের ঠিক পিছনে মায়ের হাত শক্ত করে ধরে চলবার সময় আমি এই প্রথমবারের মত লক্ষ্য করলাম সেই গর্তের কাছে নুড়ি পাথরের উপরে বিরটি একটা কাঠের স্তূপ পরিপাটি করে সাজানো রয়েছে। পরিচিত শোকার্তেরা আবার বিলাপ করতে লাগল আর তাতে আন্তরিকতাহীন সুরের উত্থান পতনে বাতাস যেন আরও ভারী হয়ে উঠল। অত্যন্ত ভীত হয়ে আমি দেখলাম আমার বাবার শক্ত হয়ে যাওয়া দেহটা তক্তার উপর থেকে তুলে নিয়ে কাঠের স্তূপের উপর রাখা হল। তারপর তাড়াতাড়ি করে আরও অনেক কাঠ তাঁর চারপাশে ও উপরে চাপানো হল। তাঁর মুখখানাই তখন কেবল দেখা যাচ্ছিল, আরও দেখা যাচ্ছিল তাঁর দৃষ্টিহীন চোখদুটা আকাশের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। পণ্ডিতেরা খুব যত্নের সংগে তাঁর কপালে চন্দনবাটা দিয়ে তাঁর জাতির চিহ্ন

শেষবারের মত এঁকে দিলেন। ব্যাপারটা আমি বুঝতে পারলাম না। বারানসীর গংগা নদীর কিনারা ধরে এবং অন্যান্য জায়গায় এইরকম আনুষ্ঠানিক মৃতদেহ পোড়ানো ভারতবর্ষের একটা সাধারণ দৃশ্য; কিন্তু ত্রিনিদাদের হিন্দুদের মধ্যে এইভাবে মৃতদেহ পোড়ানো আমি কখনও দেখি নি। আমার বাবার দেহ অগ্নি-দেবতার কাছে উৎসর্গ করা হবে—কথটা চিন্তা করে যে অভাববোধ ও হতবুদ্ধিভাব আমাকে আগেই আচ্ছন্ন করেছিল তার সংগে রহস্যের একটা নতুন দিকও যুক্ত হল।

মৃতদেহের নিকটে উৎসর্গের জন্য কাছেই একটা জায়গায় ভাত রান্না করা হচ্ছিল। পুরোহিত সেই জায়গাটা মন্দ আত্মাশূন্য করছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন অগ্নি-দেবতার সামনে এটা প্রয়োজনীয় ও সতর্কতামূলক কাজ, যাতে অগ্নি-দেবতা বাবার দেহ থেকে আত্মা পৃথক করে পরপারে নিয়ে যেতে পারেন। আমার সামনে যে রীতি অনুযায়ী অনুষ্ঠান করা হচ্ছিল তার দিকে আমি শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম।

"রবি, এস।" পণ্ডিতের ডাক আমাকে স্মরণ করিয়ে দিল যে, আমারও এর মধ্যে কিছু করবার আছে।

দুঃখে ও ভয়ে আমি অন্যমনস্ক ছিলাম, তাই মন্ত্রগুলো আমার কানেই যাচ্ছিল না। পণ্ডিত তাঁর এক হাতের তালুতে বসানো বড় একটা কাঁসার থালার উপর পবিত্র আগুন নিয়ে যে আমার দিকে এগিয়ে আসছিলেন তা আমি দেখতেই পাই নি। তিনি অন্য হাতটা বাড়িয়ে আমার একটা হাত ধরলেন। আমি শংকিত হয়ে মায়ের দিকে তাকালাম। তিনি 'হ্যাঁ' সূচক মাথা নেড়ে আমার কাঁধ চাপড়ে দিলেন। তারপর নীচু হয়ে আমার কানের কাছে ফিস্‌ফিস্‌ করে বললেন, "এটা করা তোমার কর্তব্য, সাহসের সংগে কর।"

পণ্ডিত যখন আমাকে টেনে নিয়ে মৃতদেহের কাছে গেলেন তখন আমি বাবার মুখের দিকে তাকালাম না। আমি ছোট ছিলাম বলে তিনি আমাকে নিয়ে সংস্কৃতে সময়োপযোগী প্রার্থনা বলতে বলতে তিনবার মৃতদেহ প্রদক্ষিণ করলেন। তিনি বলছিলেন, "আমি এই ব্যক্তির সারা

গায়ে আগুন দিলাম। এই ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে হয়তো অনেক দোষ করেছিলেন আর এখন মৃত্যুর নিষ্ঠুর কবলে পড়েছেন, কিন্তু তিনি যেন আলোর রাজ্যে স্থান পান।" এবার আমি দেখতে পেলাম কাঠের ভিতরে এখানে ওখানে কর্পূরের টুকরা সুপরিকল্পিত ভাবে রাখা হয়েছে। সেগুলোর উগ্র গন্ধ আমার নাকে এসে ঢুকল। একজন ধুতি-পরা, মাথায় পাগড়ী বাঁধা লম্বা লোক মৃতদেহ ও কাঠের উপরে ঘি ও কেরোসিন তেল ছিটাতে লাগল। পণ্ডিতের নির্দেশ অনুসারে তাঁর হাতে ধরা পবিত্র আগুন থেকে আমি যন্ত্রের মত একটা কাঠের টুকরা জ্বালিয়ে তা দিয়ে সবচেয়ে কাছের কর্পূরটা স্পর্শ করলাম। আগুন দপ করে জ্বলে উঠে কেরোসিনে লেগে তাড়াতাড়ি একটা কর্পূরের টুকরা থেকে অন্য টুকরায় চলে গেল। লাল-হলদে আগুনের অপচ্ছায়া মৃতদেহের চারপাশে যেন তাদের আনুষ্ঠানিক নৃত্য জুড়ে দিল। আগুন লাফিয়ে লাফিয়ে উপরে উঠছিল আর আমি অবাক হয়ে তা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম। পণ্ডিত আমাকে ধরে সেখান থেকে টেনে আনলেন।

আগুনের চারপাশে দাঁড়ানো মানুষের সমুদ্রের মধ্যে আমি মাকে খুঁজতে লাগলাম এবং কান্না থামাবার চেষ্টা করলাম। তাঁকে আমি কোথাও দেখতে পাচ্ছিলাম না। যে উদ্বেগ আমি তখন বোধ করছিলাম তা আমার পক্ষে থামিয়ে রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ল। আমার মুখ দিয়ে জোরে কচি কন্ঠের বিলাপ বের হয়ে আমার চারপাশের বিলাপের সংগে মিশে গেল। আমার তখন অর্দ্ধ-উন্মাদের মত অবস্থা হয়েছিল। শেষে আমার মাকে আমি জ্বলন্ত দেহের কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। তিনি এত কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন যে, মনে হচ্ছিল যেন তিনি আগুনেরই একটা অংশ। লাফিয়ে লাফিয়ে ওঠা কমলা রংয়ের আগুনের ধারে সাদা সিল্কের শাড়ী পরা আমার মাকে দেখতে একটা ছায়ামূর্তির মত লাগছিল। আমি শুনেছিলাম বিধবারা ঐ রকম আগুনে ঝাঁপ দেয়। তাহলে কি আমি বাবার মত মাকেও হারাব?

আমি চিৎকার করে ডাকলাম, "মাগো, ও মা!"

আগুনের গর্জন ও কান-তালা লাগানো বিলাপের শব্দের মধ্যে মা যে আমার ডাক শুনতে পেয়েছেন তার কোন ইংগীতই আমি পেলাম না। সেই ভয়ংকর জায়গার একেবারে কিনারায় দাঁড়িয়ে দু'হাত বাড়িয়ে তিনি সেই আগুনের পোড়া দেহের ও সর্বগ্রাহী অগ্নি-দেবতার পূজা করছিলেন। মাঝে মাঝে নীচু হয়ে তিনি সেই সদ্য রান্না করা ভাত আগুনের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলছিলেন। পরে তিনি আগুনের সেই অসহ্য তাপ থেকে সরে এসে আমার পাশে দাঁড়ালেন। তাঁর মাথা উঁচুই ছিল। সেই বিলাপে তিনি যোগ দেন নি। একজন সত্যিকারের হিন্দু হিসাবে তিনি কৃষ্ণের শিক্ষা অনুসরণ করার শক্তি পেয়েছিলেন— "জীবিত বা মৃত কারও জন্যেই শোক করবে না।" আগুন নিভে যাওয়া পর্যন্ত আমরা যতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তা দেখছিলাম, ততক্ষণ তিনি একবারও কেঁদে ওঠেন নি। আমি তাঁকে আঁকড়ে ধরে ছিলাম আর তিনি যে আস্তে আস্তে তাঁর মন্ত্র বলছিলেন তা আমি বুঝতে পেরেছিলাম।

সূর্য ডুবে যাওয়া পর্যন্ত আমরা সেখানে দাঁড়িয়ে মৃতদেহ পোড়ানো দেখছিলাম। তারপর জ্বলন্ত কয়লার উপর সাত টুকরা কাঠ দেওয়া হল, আর সমস্ত বিলাপকারীরা ঘুরে ঘুরে সেই জ্বলন্ত কয়লার উপর জল ছিটাতে লাগল। শেষে সমস্ত ছাই ঠাণ্ডা হয়ে গেলে পণ্ডিত কয়লার মধ্যে থেকে বাবার দেহাবশিষ্ট ছাই বের করে নিলেন যাতে মা সেগুলো ভারতে নিয়ে গিয়ে গংগার পবিত্র জলের উপর ছিটিয়ে দিয়ে আসতে পারেন। মা যে তা কখন এবং কেমন করে করবেন তা আমি জানতাম না। আমি এত বুদ্ধিহারা ও শোকাহত হয়েছিলাম যে, সেই রাতে সেই বিষয় নিয়ে কোন চিন্তা করতেও পারি নি।

আমি এতদিন একজন 'অবতার'কে জানতাম, যিনি ছিলেন মানবদেহে একজন দেবতা, কিন্তু এখন তিনি আর নেই। তিনি এসেছিলেন মানুষকে পথ দেখাতে— সত্যিকার যোগ-সাধনার পথ, যা মানুষকে ব্রহ্মার সংগে যুক্ত করে। আমি তাঁর আদর্শ ভুলে যাব না, ভুলতে পারবও না। তাঁর কাজের ভার আমার উপর পড়েছে, কাজেই আমাকে তাঁর পদানুসরণ করতেই হবে।

৩

গংগায় ছাই ফেলা

একদিন প্রায় এক ঘন্টা ধরে আমি অগ্নি-দেবতা সূর্যের উপাসনা করছিলাম। এমন সময় সেই সূর্য-দেবতার ধনুক থেকে যেন জ্বলন্ত ক্ষেপণাস্ত্রের মত তেজ বের হয়ে আমার পিছন দিকের আকাশে উঠে যেতে লাগল। তাতে নারকেল গাছের নীচে মাটি ও ঘাসের উপর চলন আলো-ছায়ার খেলা। বারান্দা ছেড়ে আমি পিছনের সিঁড়ি দিয়ে নেমে গোয়াল-ঘরে গেলাম। ওখান থেকেই পাওয়া যেত আমাদের বাড়ীর জন্য প্রয়োজনীয় দুধ। গোয়াল-ঘরের কাঠের দরজাটা খুলে ধরতেই আমাদের গরুটা খুশীতে লাফাতে লাফাতে মাঠের দিকে ঘাস খেতে চলল। আমি ওর দড়িটা ধরলাম। সকাল বেলাকার ঘাস খাবার জন্য গরুটা এগিয়ে চলল আমাকে শুদ্ধ টেনে নিয়ে। আমি কোনরকমে তাকে টানতে টানতে তাজা ঘাসের দিকে নিয়ে গেলাম। উপসাগর থেকে বয়ে আসা সকালবেলার বাতাসে আমাদের মাথার উপর নারকেল গাছের পাতাগুলো একে অন্যের সংগে লেগে অতি পরিচিত সুর তুলছিল।

আমাদের গরুটা মাথা নীচু করে ঘাস খাচ্ছিল আর আমি ভক্তিভরে তার দিকে তাকিয়ে ছিলাম। গরুর মত আর কোন পশুকেই হিন্দুরা এত ভক্তি করে না, কারণ তাদের মতে গরু পবিত্র। লম্বা ঘাসের মধ্যে নাক ডুবিয়ে, অন্য সব কিছু উপেক্ষা করে, এই সাদা-কালোয় ছিটে ফোটা দেবী কান ও লেজ নেড়ে নেড়ে সবুজ কার্পেটের মত রসে ভরা ঘাস ছিঁড়ে ছিঁড়ে নিয়ে তৃপ্তির সংগে চিবাচ্ছিল। গরু চরানো ছিল আমার

জন্য সবচেয়ে আনন্দের কাজ। আমার দৈনন্দিন কাজের এই সুযোগটুকু নিয়ে আমি এই মহান পবিত্র দেবীর পূজা করতাম। কাছেই ফুটে থাকত অনেক ফুল। তার মধ্যে থেকে একটা কমলা রংয়ের ফুল তুলে নিয়ে আমি তার মাথার বাঁকা শিং দু'টার মধ্যে রেখে দিতাম। সে তার বাদামী রংয়ের একটা চোখ দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আবার ঘাস খেতে থাকত। তার নাকের একটা ফুটোয় মাছি ঢুকলে সে বিরক্ত হয়ে মাথা নেড়ে হাঁচি দিত। এত যত্ন করে যে ফুলটা আমি তার মাথার উপর দিতাম সেটা তার নাক বরাবর গড়িয়ে এসে মাটিতে পড়ে যেত। আমি ওটা তুলে নেবার আগেই সেই উজ্জ্বল রংয়ের ফুলটা ঘাসের সংগে তার মুখে অদৃশ্য হয়ে যেত। মাটিতে বসে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে আমি ভাবতে চেষ্টা করতাম আমি যদি গরু হতাম তবে কেমন হত? হয়তো আমার আগের জন্মের কোন এক সময় আমি গরু হয়েই জন্মেছিলাম। অবশ্য সে কথা এখন আর আমি স্মরণে আনতে পারি না। আমি প্রায়ই ভাবতাম, আমার আগের জন্মের কথা কেন এখন আমি মনে করতে পারি না।

গোঁসাই আমাকে প্রায়ই বলতেন ভারতের মধ্যে দূরের একটা জায়গার একজন সাধু রাতের আকাশে এক আশ্চর্য দৃশ্য দেখেছিলেন। তিনি নক্ষত্রপুঞ্জ দিয়ে আঁকা একটা গরুর আকৃতি সর্ব প্রথম দেখেন আর তারপর থেকে আমরা, হিন্দুরা, প্রথমবারের মত বুঝতে পারলাম যে, গরু একজন দেবী। মিসর দেশ ও আর্যদের নিয়ে আমি অন্যান্য অনেক ব্যাখ্যা শুনেছিলাম, কিন্তু গোঁসাইয়ের ব্যাখ্যা আমার কাছে সব চেয়ে ভাল লেগেছিল। যা কিছু আকাশে দেখা যায় তা পবিত্র; আর আকাশের নক্ষত্র থেকে আসা পৃথিবীর সব গরুই নিশ্চিতভাবে পবিত্র, কাজেই তা পূজার যোগ্য। প্রাচীন কাল থেকে গরু-পূজা চলে আসছে। গোঁসাই গরুকে মা বলতেন আর পণ্ডিতেরা প্রায়ই বলতেন যে, গরু আমাদের সকলেরই মা, ঠিক যেমন শিবের স্ত্রী হলেন মা-কালী। যে কোন রকমেই হোক আমি বুঝতে পেরেছিলাম, গরু আর মা-কালী একই; কেবল তাঁরা আকারে ভিন্ন। মা-কালী হলেন হিন্দু

দেব-দেবীদের মধ্যে একজন ক্ষমতা সম্পন্না দেবী। আমরা তাঁকে গভীর আগ্রহের সংগে পূজা করতাম। কিন্তু তাঁর মূর্তি দেখলে আমাদের ভয় লাগত। তাঁর বের করা জিভ্ থেকে টাট্‌কা রক্ত পড়ছে, এইমাত্র কেটে নেওয়া নরমুণ্ড তাঁর গলায় ঝুলছে, তাঁর দুপাশে অনেকগুলো হাত রয়েছে আর তাঁর স্বামী শিব শুয়ে আছেন এবং তিনি বুকের উপর পা রেখে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি কিন্তু অন্য শান্ত দেবীকে, অর্থাৎ গরুকে পূজা করা পছন্দ করতাম। অনেক সময় ধরে আমি গরুর কাছে কাছে থেকে আমার পরজন্মের জন্য সৎকাজ করছিলাম। আমাদের গরুটা কি জানেন যে, তিনি একজন দেবী? আমি তাঁকে খুব ভাল করে লক্ষ্য করতাম, কিন্তু তিনি যে নিজের সম্বন্ধে জানেন এমন কিছুই আমি আবিষ্কার করতে পারতাম না। সমস্ত প্রাণীর মধ্যে সবচেয়ে পবিত্র এই প্রাণীর প্রতি বিস্ময় ও ভক্তিতে আমার প্রশ্ন আস্তে আস্তে মিলিয়ে যেত।

গরুর প্রতি আমার এই ভালবাসা একটা মৃদু গুণ্‌গুণ্ আওয়াজে ব্যাহত হল। শব্দটা ক্রমে ক্রমে জোরে হতে লাগল। উত্তেজিত হয়ে নারকেল গাছের তলা থেকে আমি লাফ দিয়ে বেরিয়ে আসলাম যাতে ব্যাপারটা ভাল করে দেখতে পারি। আমরা সেই সময় খুব কমই উড়োজাহাজ দেখেছিলাম। ওটা দেখতে দেখতে কথাটা আমার মনে পড়ে গেল। যতবার আমি আকাশে উড়োজাহাজ দেখতাম ততবারই কথাটা আমার মনে পড়ত। আমি কোথা থেকে এলাম বা আমার উৎপত্তি কোথায়? এর রহস্য বের করার জন্য একদিন আমার মাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "আমি কোথা থেকে এসেছি?" মা খুব গম্ভীর হয়ে উত্তর দিয়েছিলেন, "একদিন তুমি উড়োজাহাজ থেকে নীচে পড়ে যাচ্ছিলে আর আমি তোমাকে ধরে নিয়েছিলাম।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "আমি কি তোমার ছেলে হবার জন্যই পড়ে যাচ্ছিলাম?" হঠাৎ একটা অনিশ্চয়তার ভাব আমার মনে এল এই ভেবে যে, আমি অন্য কারও ঘরের পিছনের বাগানেও তো পড়তে পারতাম!

মা আমাকে এই বলে নিশ্চিন্ত করলেন যে, আমি তাঁর ও বাবার ছেলে হবার জন্যই পড়ে যাচ্ছিলাম। এর পর অনেকদিন পর্যন্ত আমি আশা করে ছিলাম যেন উড়োজাহাজ থেকে একটা ছোটি ভাই আমার কোলে পড়ে। অনেক বছর পরেও ছোটি বাচ্চারা আমার কাছে একটা রহস্য ছিল, তবে আমি বুঝতে পেরেছিলাম উড়োজাহাজ থেকে বাচ্চারা পড়ে না। পরে আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, আমার বাবা মারা গেছেন বলে আমি আর কোন ভাই বা বোন পাব না।

বাবা মারা যাবার পর প্রত্যেকদিন ভাবগম্ভীর ও বিশ্বস্তভাবে আমি তাঁর আত্মার পূজা করতাম। তাঁর মৃত্যুর পরে যে বিশেষ ঘাস আমরা লাগিয়েছিলাম তাতে প্রত্যেকদিন সকালে আমি জল দিতাম এবং খুব মনোযোগ দিয়ে সেগুলোর বেড়ে ওঠা লক্ষ্য করতাম। আজ বাবার মৃত্যুর পর চল্লিশ দিন, আর আজকেই আমি আমার লম্বা কালো, কোঁকড়ানো চুল হারাব। বেশ কয়েক বছর ধরে আমার চুল কাটা হয়নি। লোকে বলত আমাকে নাকি আমার বাবার মতই দেখায়। চুল কাটা নিয়ে আমি কয়েকদিন ধরে বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম। বাবার চুল কাটার পরে আত্মারা যেমন করে আমার বাবাকে নিয়ে গেল আমারও কি সেই অবস্থা হবে?

বারান্দা থেকে মা আমাকে হাত নেড়ে ডেকে বললেন, পবিত্র ক্রিয়াকর্মের সময় হয়েছে। অনিচ্ছুক গরুটাকে গোয়ালে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য আমি তার দড়ি ধরে টানতে লাগলাম। গরুটা সারা পথ ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ করে গোড়ালী মাটিতে ঠেকিয়ে প্রতিবাদ করতে লাগল। তাকে জোর করে আনার দরকার, কিন্তু আমার কয়েকজন বন্ধু যেমন করত সেইভাবে আমি কখনও তাকে লাঠি দিয়ে মারতাম না বা গালে চড় দিতাম না। আমি অনেকবার আমার বন্ধুদের বলেছি, "এমনি করেই কি একজন দেবীর সংগে ব্যবহার করতে হয়? পরে তারা আমার কাছ থেকে গরুকে ভক্তি করতে শিখেছিল; অন্ততঃ আমার সামনে গরুর উপর খারাপ ব্যবহার করত না।

বাবার মৃত্যুর পরে চল্লিশ দিনের দিন একটা ছোটি-খটি শোভা

যাত্রা সরু পাকা রাস্তা ধরে এগিয়ে চলল। আখ ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে, গরান গাছের জলাভূমি পেরিয়ে মাংকি পয়েন্টে গিয়ে শোভাযাত্রাটি থামল। দিনে দুবার জোয়ারের জল সেই নীচু পাকা দেয়াল পার হয়ে এসে বাবাকে পোড়াবার সমস্ত চিহ্ন ধুয়ে-মুছে দিয়েছিল। কেবল স্মৃতি মুছে ফেলতে পারে নি। আমি আবার যেন দেখতে পেলাম আগুনের শিখা বাবার দেহের চারপাশে আনুষ্ঠানিক ভাবে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠে নেচে নেচে বেড়াচ্ছে। পোড়া দেহের গন্ধ আমার নাকে এসে লাগল। যেখানে বাবাকে পুড়িয়ে ছাই করা হয়েছিল সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমি ভয়ে শিউরে উঠলাম। সবার দৃষ্টি আজ আমারই উপর।

বন্ধু-বান্ধব এবং আত্মীয়েরা অর্দ্ধ গোলাকৃতি হয়ে আমার চারপাশে দাঁড়িয়ে ছিল। পণ্ডিতের এক হাতে কাঁচি ছিল। তিনি আমার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ছোট-খট একটা পূজা করা হল। আমি অবশ্য এসব বিষয়ে সচেতন ছিলাম না। বর্তমান বাস্তবতার জায়গায় হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল একটা ভীতিজনক অভিজ্ঞতার কথা। প্রায় তিন বছর আগে গভীর ঘুমের অবস্থা থেকে আমি জেগে উঠলাম। কে যেন শক্ত মুঠিতে খুব জোরে আমার চুল টানছিল। আমি সম্পূর্ণভাবে জেগে উঠে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার জন্য মোচড়া-মুচড়ি করে ব্যথায় চেঁচিয়ে উঠলাম। পাগলের মত হাতড়ে আমি কোন মানুষের হাত খুঁজে পেলাম না, তবুও এমন জোরে আমার চুল টানা হয়েছিল যে, বিছানা থেকে আমি প্রায় পড়েই যাচ্ছিলাম। আমার ভয়ার্ত চিৎকার শুনে মা আমার কাছে এসেছিলেন। আমার সংগে কিছু কথা বলে এবং আমার পিঠ চাপড়ে দিয়ে তিনি আমাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন যে, ওটা একটা দুঃস্বপ্ন। কিন্তু আমি তো ব্যাপারটা বেশ ভাল করেই জানি, কারণ আমি তখন সম্পূর্ণভাবে জেগে ছিলাম, স্বপ্ন দেখছিলাম না। তাছাড়া যেখানকার চুল প্রায় উপড়ে ফেলার মত করেছিল সকাল পর্যন্ত সেখানে তীব্র ব্যথা ছিল।

সেই স্মৃতি এবং আমার বাবার এই রহস্যজনক মৃত্যু এই অনুষ্ঠানের ব্যাপারে আমাকে ভয় ধরিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু কোন অঘটন

ঘটল না। আমি বিশেষ কিছু বুঝবার আগেই আমার চুলগুলো কেটে সেখানকার মাটিতে ফেলা হল যেখানে আমার বাবাকে পোড়ানো হয়েছিল। এর পরে যখন জোয়ার আসবে তখন সেই চুল সাগরে গিয়ে আমার বাবার ছাইয়ের সংগে যুক্ত হবে।

বাবার কিছু ছাই আর একটা বিশেষ অনুষ্ঠানের জন্য রেখে দেওয়া হয়েছিল। বাবার মৃত্যুর পর গোঁসাই আর আমি বেশ কয়েকবার সেই অনুষ্ঠানের বিষয় উত্তেজনার সংগে আলাপ-আলোচনা করেছিলাম। সেই বুড়ো লোকটি আমাকে আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন, "উনি যে 'অবতার' ছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাঁর মুক্তির কোন প্রয়োজনই নেই।"

"কি বলছেন আপনি? তাহলে কি তাঁর মুক্তি হয় নি?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম। "তাঁর মুক্তি অনেক আগেই, তাঁর আগেকার কোন জন্মে হয়ে গেছে। তিনি এইবার এসেছিলেন কেবল পথ দেখাতে... বুদ্ধ অথবা যীশু খ্রীষ্টের মত।"

"তাহলে কি তিনি বুদ্ধ বা খ্রীষ্টের মতই একজন ছিলেন?" আমি চিন্তা করে বললাম। গোঁসাই বেশ জোর দিয়ে হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়লেন। "তুমি চল্লিশ দিনের দিন দেখতে পাবে। ছাইয়ের উপর পায়ের ছাপ দেখা যাবে না। তাঁর আত্মা ব্রহ্মার কাছে ফিরে গেছে। ভাই, উনি ছিলেন দেবতা— তোমার বাবা দেবতাই ছিলেন!" ভয়ে ভয়ে তিনি আমার দিকে তাকিয়ে আবার কথাগুলো গভীর ভক্তির সংগে বললেন, "তোমার বাবা দেবতাই ছিলেন!"

আমি নিজেও তা জানতাম। তিনি যখন জীবিত ছিলেন তখন তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর গভীর চোখ দুটার দিকে তাকিয়ে আমি সে কথা বুঝতে পারতাম। তবে গোঁসাই যেমন বুঝতেন আমি তেমন বুঝতাম না। গোঁসাই অশিক্ষিত হলেও বেদ জানতেন। আমার চোখে তিনি ছিলেন খুব চালাক ও একজন সবজান্তা হিন্দু।

আমার মাথার চুল কটিবার ব্যাপারটা সম্বন্ধে আমি খুব সচেতন ছিলাম। বাড়ী ফিরে এসে বাবার বিষয়ে গোঁসাইয়ের কথার প্রমাণ

পাবার জন্য আমি যেন আর অপেক্ষা করতে পারছিলাম না। পণ্ডিত আমাকে একটা খালি কামরায় নিয়ে গেলেন যেটা সারা রাত ধরে বন্ধ করে রাখা হয়েছিল। আগের দিন রাতে ঘরের মাঝখানে একটা চ্যাপ্টা বড় পাত্রের উপরে বাবাকে পোড়ানো ছাই খুব ভক্তির সংগে সমান করে রাখা হয়েছিল। খুব আগ্রহের সংগে আমাদের পরিবারের সবাই এগিয়ে এসেছিল দেখতে যে, সেই ছাইয়ের উপরে কোনো পায়ের ছাপ পড়েছে কি না যাতে প্রকাশ পায় যে, আমার বাবার পরবর্তী জন্ম কি হবে। এই অনুষ্ঠান আমি আগে অনেকবার দেখেছি, কিন্তু এখন তো এর কোন দরকার নেই। আমার বাবা তো এখন সেই জন্মের চাকার মধ্যে পড়বেন না। তিনি তো ব্রহ্মার কাছে ফিরে গেছেন... কাজেই তাঁর জন্য এই অনুষ্ঠান কেন? গোঁসাই যা বলেছিলেন তা আমার মনে পড়ল, "ছাইয়ের উপর পায়ের ছাপ দেখা যাবে না।" আমি মায়ের দীর্ঘনিঃশ্বাস শুনতে পেলাম। হঠাৎ পণ্ডিত বলে উঠলেন, "আরে, দেখ, দেখ, ঐ যে, পাখীর পায়ের ছাপ, ঐ যে ওখানে।"

আমি যে কি ভীষণ ভয় পেলাম তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। আমি মা ও মাসীমার মাঝখান দিয়ে ঠেলে নিজেই ব্যাপারটা দেখতে চাইলাম। হ্যাঁ, কথাটা ঠিক! সমান করা ছাইয়ের উপর কোন একটা ছোটি পাখীর পায়ের ছাপ। আমরা সবাই ভাল করে পরীক্ষা করে দেখলাম। এর উপসংহার এড়িয়ে যাওয়া যায় না যে, আমার বাবা পাখী হয়ে আবার জন্ম গ্রহণ করেছেন।

আমার ছোট্ট জগতটা যেন খান্ খান্ হয়ে গেল। এখন গোঁসাই কি বলবেন? কিন্তু আমাদের দ্বীপের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত তো নিজেই আমার বাবাকে 'অবতার' বলতেন। তাহলে আমার বাবা নিজেই যদি ব্রহ্মার সংগে মিলিত হতে না পারলেন তবে আমার বা অন্যান্যদের আশা কোথায়? আমি অসুস্থ বোধ করতে লাগলাম, সকলের উত্তেজিত কথাবার্তার সংগে যোগ দিতে পারলাম না। আমরা সবাই উঠানে নেমে এলাম যেন তার পরের অনুষ্ঠান পালন করতে পারি।

আমার চিন্তাশক্তি তখন অসাড় হয়ে গেছে। তার পরে অনেক সময়

ধরে যে পূজা হচ্ছিল তার প্রায় কিছুই আমি শুনি নি। এ সবের পরে যে বিরাট ভোজ হবে তার জন্য আমার কোন আগ্রহ ছিল না। গত কয়েক দিন ধরে আমার মা-মাসীমারা ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে রসনার তৃপ্তিদায়ক অনেক রকমের ভাল ভাল তরকারী ও মিষ্টি প্রস্তুত করেছিলেন। তার সুগন্ধ রান্নাঘর থেকে আমাদের পাগল করে তুলত। সেই সব খাবার কেউ মুখে তুলবার আগে মৃতব্যক্তির উদ্দেশে সব কিছু থেকে একটু একটু করে দেবার নিয়ম ছিল। পবিত্র কোয়া পাতা দিয়ে একটা বড় পাত্রের মত তৈরী করে তাতে সব খাবার ভরে পণ্ডিত আমার বাবার আত্মার উদ্দেশে সেগুলো একটা নম্বা কলা গাছের তলায় রেখে আসার সংগে সংগে আমরা ঘরে ফিরে আসলাম।

পণ্ডিত গম্ভীরভাবে আমাদের সর্তক করে দিয়ে বললেন "ভাইয়া, দেখো, কেউ যেন পিছন ফিরে না তাকায়। কেউ যদি পিছন ফিরে তাকায় তাহলে আত্মা তাকে আক্রমণ করতে পারে। ওগুলো কেবল তোমার বাবার আত্মার উদ্দেশেই দেওয়া হয়েছে।

আমি আগে কখনও সেই নিয়ম ভাংগার কল্পনাও করতে পারি নি। কিন্তু এখন আমি লোভ সামলাতে পারলাম না। আমার চলার গতি কমিয়ে দিলাম যাতে অন্যেরা আমার পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যেতে পারে। উনি ছিলেন আমার বাবা। তাঁকে অন্ততঃ আর একবার আমাকে দেখতেই হবে। একবার মাত্র আমি উঁকি মেরে দেখব। অর্দ্ধেক পথ যাবার পর লোভ সামলাতে না পেরে আমি ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে আমার কাঁধের উপর দিয়ে চুরি করে একবার তাকালাম। পাতার পাত্রটা তখনও সেখানে ছিল এবং খাবারগুলোও তার মধ্যে আমি দেখতে পাচ্ছিলাম। বাবার আত্মার কোন চিহ্নই আমি সেখানে দেখতে পেলাম না, তাড়াতাড়ি আমার চোখ ফিরালাম। আমি সেই নিষেধ-করা কাজ করেছি। আমি নিশ্চিত হয়েছিলাম যে, এইবার আমাকে মরতে হবে; কিন্তু কিছুই হল না। তাহলে দেব-দেবতারা কি আমাকে দয়া করলেন? এমনিতে আমার মধ্যে যে উত্তেজনা ছিল তার সংগে রহস্যের মত এই প্রশ্নটাও যুক্ত হল।

তাড়াতাড়ি করে পিছনের বারান্দায় গিয়ে সাহস করে পায়ের আংগুলের উপর ভর দিয়ে আবার দেখবার চেষ্টা করলাম। পাত্রটা প্রায় দেখাই যাচ্ছিল না। আগে আমি দেখেছি দাদুর আত্মার উদ্দেশে যে খাবার দেওয়া হয়েছিল তা আমাদের পাশের বাড়ীর কুকুর খেয়েছিল। আমি নিশ্চিত হতে চেয়েছিলাম যেন আবার তা-ই না হয়। আধ ঘন্টা পর তেমন কোন কিছু ঘটতে না দেখে আমি নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলাম না। আত্মারা কি করতে পারে সে সম্বন্ধে আমার ভয় থাকলেও সাহস করে আমি উঠানে গিয়ে সাবধানে কলা গাছের দিকে এগিয়ে গেলাম। তারপর আমি আশ্চর্য হয়ে দেখলাম খাবার গুলো সেখানে নেই। একটা টুকরাও সেখানে পড়ে ছিল না, অথচ আমি কডিকে সেখানে আসতে দেখি নি। তাহলে কথাটা সত্যি যে, আমার বাবার আত্মা ওগুলো খেয়ে গেছেন। তাহলে এটাই কি প্রমাণ হয় যে, তিনি এত কিছু করেও নির্বাণ লাভ করতে পারেন নি? তিনি কি গাছের একটা পাখী হয়ে আমাকে লক্ষ্য করছেন?

হতাশ ও বিহ্বল হয়ে আমি উঠানের এপাশ থেকে ওপাশে হাঁটতে লাগলাম এবং প্রত্যেকটা গাছে ও ঝোপে ছোট বা বড় এমন একটা পাখীর খোঁজ করতে লাগলাম যাকে অন্ততঃ কিছুটা আমার বাবার মত দেখতে লাগে। আমি যদিও বা তাঁকে চিনতে না পারি তবুও তো তিনি আমাকে চিনতে পারবেন। মাত্র একটা চঞ্চল, কিচির মিচির করা, ঠোঁট দিয়ে গা চুলকানো প্রাণীকে দেখবার জন্য আমি বৃথাই অপেক্ষা করতে লাগলাম। তাদের একটাও আমার দিকে একটুও মনোযোগ দিল না। আমি তাদের কাছাকাছি গেলে তারা উড়ে চলে গেল। তবে একথা সত্যি মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত তিনি আমার দিকে কোন মনোযোগ দেন নি, কাজেই এখন কেন দেবেন?

পরে আমি সেই পরিচিত পথ দিয়ে গোঁসাইয়ের কুঁড়েঘরে গেলাম। তাঁর সংগে একা কথা বলা অসম্ভব হল, কারণ অনেকেই সেখানে উপস্থিত ছিল। তাঁর চল্লিশ বছর বয়স্ক ছেলে সামনের দিকে সাইকেলের চাকা ঠিক করছিল। সাইকেলে করে সে সারা শহর ঘুরে

ঘুরে ঘুঘ্‌নি ও লংকার বড়া বিক্রি করত। সে অল্পদিন আগে দুই ছেলে সহ একজন স্ত্রীলোককে বিয়ে করেছে। তারা সবাই এখন গোঁসাইয়ের দুই কামরা বিশিষ্ট কুঁড়েঘরে আশ্রয় নিয়েছে। আমাকে আসতে দেখে সে চাকা মেরামতের কাজ থেকে তার ক্লান্ত দেহটা সোজা করল এবং দুই হাত মুখের কাছে তুলে আমাকে নমস্কার করল।

হাসিমুখে সে আমাকে বলল, "সীতা-রাম, আপনি বুড়োর খোঁজে এসেছেন? উনি ভিতরে আছেন। বুড়ো হয়ে গেছেন তো শুয়ে আছেন।"

ভিতর থেকে গোঁসাইয়ের গলা শোনা গেল, "কথাটা সত্যি নয়; মোটেই আমি ওরকম বোধ করছি না। সর্দি-কাশিতে আমাকে কাৎ করে ফেলেছে।" তাঁর কথাটা প্রমাণ করার জন্য সেই অহংকারী বুড়ো লোকটি খোঁড়াতে খোঁড়াতে বের হয়ে এসে ঘরের ছায়ায় তাঁর নির্দিষ্ট জায়গায় বসলেন। তিনি ভারতীয়দের চেয়ে লম্বা ছিলেন এবং পা দুটা ধনুকের মত সামান্য বাঁকা ছিল। আমি চুপ করে তাঁর পাশে বসলাম। তাঁর পাশে বসে আমি এমন একটা সান্ত্বনা ও নিরাপত্তা বোধ করলাম যার ব্যাখ্যা আমি দিতে পারব না।

ঘড়ির দোলকের মত মাথাটা এপাশ থেকে ওপাশে নাড়িয়ে তিনি বললেন "তোমার সুন্দর চুল আবার তাড়াতাড়ি গজিয়ে উঠবে।"

আমার ভিতরের উত্তেজনা ও সন্দেহ কাউকে বলতে না পেরে উত্তর দিলাম, "আমার চুল নিয়ে আমি ভাবছি না।"

"তুমি একটা কথা জান, ভাই, তোমার বাবা কি ভাবে জীবন যাপন করেছেন আমি তা ভুলতে পারব না। আমার সারা জীবনে এই রকম পবিত্র লোক আমি কখনও দেখি নি .... তিনি কি ভাবে তাঁর সব কিছু ত্যাগ করেছিলেন।" গোঁসাইয়ের মাথা বিস্ময়ে এপাশ থেকে ওপাশে নড়তে লাগল।

ঐরকম প্রশংসা শুনলে আমি অহংকারে ফুলে উঠতাম, কারণ তিনি ছিলেন আমারই বাবা, কিন্তু এখন সেই প্রশংসা আমাকে একটুও সান্ত্বনা দিতে পারল না। যদিও আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, আমার

বাবার প্রতি গোঁসাইয়ের যে শ্রদ্ধা তার ভাগ তিনি আমাকে দিয়েছেন; তবুও ছাইয়ের উপরে ছোট একটা পাখীর পায়ের ছাপ তো অস্বীকার করা যায় না। প্রত্যেকে, এমন কি, পণ্ডিতও সেই ছাপ মেনে নিয়েছেন। আমি যেমন আঘাত পেয়েছি ও হতাশ হয়েছি, তাঁরা যে তেমন হয়েছেন বাইরে থেকে তা বোঝা যাচ্ছিল না। তাই আমার মন আরও বেদনার্ত হয়ে উঠল।

"কেমন করে তিনি এখন এত ছোট হ'য়ে গেলেন?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি যদি একটা বড় পাখীও হতেন তবুও না হয় আমার পক্ষে তাঁকে বোঝা সহজ হত, কিন্তু তিনি কেবল একটা ছোট্ট পাখী হয়েছেন ভেবে আমার হতবুদ্ধিভাব আরও বেড়ে গেল।

গোঁসাই জোর দিয়ে বললেন, "দেখ, ভাই, তিনি মোটেই ছোট নন। আমি যা বলি তা শোন, যে পাখীর পা এত ছোট সেই পাখী কখনও এত খাবার এত তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেলতে পারে না।" কথাগুলো বলে তিনি চুপ করে চিন্তিত হয়ে থুত্‌নি চুলকাতে লাগলেন, তারপর একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়লেন।

কথাটা ঠিক ! আমি লাফ দিয়ে উঠে সেই ঘরে গেলাম যেখানে ছাই রেখে ঘরটা বন্ধ করে রাখা হয়েছিল। আমরা কি শুদ্ধ করে ঘরের জানলা বন্ধ করেছিলাম? আমি মনে করতে পারলাম না। বাইরে বেরিয়ে এসে ঘরের চালের নীচে দেখতে গিয়ে একটা ছোট পাখীর বাসা দেখতে পেলাম। উত্তেজনার সংগে লক্ষ্য করলাম—দেয়ালের উপরে যেখানে ছাদের ঢেউটিন এসে পড়েছে সেখানে টিনের ঢেউয়ের নীচে পর পর যে অর্ধগোলাকৃতি ফাঁক রয়েছে তার মধ্যে দিয়ে ঐ ছোট পাখীটা ঘরের ভিতরে ঢুকতে পেরেছিল। কিন্তু আমার বাবা মারা যাবার আগে কি ওখানে পাখীর বাসাটা ছিল? এ বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিত হতে পারলাম না, তবে আমার মনে হল ওটা আগে থেকেই ওখানে ছিল।

তাহলে আমার বাবা ঐ ছাইয়ের উপরে পায়ের ছাপ রেখে যান নি। যন্ত্রনা থেকে আমি কিছুটা মুক্তি পেলাম। কিন্তু ঐ খাবারগুলো? কে

তাহলে ওগুলো খেয়ে ফেলল? বেদ গ্রন্থে যে সব মন্দ শক্তি, অর্থাৎ অশূর বা রাক্ষসদের কথা লেখা আছে তাদের মধ্যে কেউ হয়তো আমাদের চিন্তাধারাকে এলোমেলো করে দেবার জন্যই এই কাজ করেছে। তাহলে এটাই ঠিক! ঐ সব মন্দ শক্তির হাত থেকে আমার বাবা এবং অন্যান্য উর্দ্ধে প্রস্থানকারী মহাপুরুষেরাই আমাকে রক্ষা করবেন। আমার বাবাকে এবং তিনি যা করেছেন তা আমাকে বিশ্বাস করতে হবে। তাঁর পদচিহ্ন ধরেই আমাকে চলতে হবে।

* * * * * *

দিদিমা আমাকে ডাকছিলেন, "রবি, কোথায় তুমি? সাধু বাবা এসেছেন!"

"আসছি, দিদিমা!" এই বলে আমি সিঁড়ি দিয়ে ঘরে উঠে এলাম! আমাদের পারিবারিক বন্ধুকে সবাই গভীর আগ্রহের সংগে অভ্যর্থনা জানাচ্ছিলেন।

সেই মহাপুরুষ আমাকে জড়িয়ে ধরে ডাকলেন, "রবি!" তাঁর নাম ছিল জানকীপ্রসাদ শর্মা মহারাজ। তিনি ভারতীয় এবং আমাদের দ্বীপের প্রধান পণ্ডিত। আমাদের বাড়ীতে তাঁর আসটা ছিল আমাদের জন্য মহা সম্মানের। সাধু বাবা ছিলেন পরিবারের বন্ধু ও আমার বাবার গুণমুগ্ধ একজন। তিনি ত্রিনিদাদের এদিক থেকে ওদিকে ঘুরে বেড়াতেন এবং যখনই আমাদের বাড়ীর কাছ দিয়ে যেতেন তখনই আমাদের বাড়ীতে আসতেন। তিনি বেশীর ভাগ হিন্দিই বলতেন। ইংরিজি খুব কম বলতেন তবে সংস্কৃত ভাষা খুব ভালই জানতেন। তিনি ছিলেন লম্বা, ফরসা এবং মোটামুটি স্বাস্থ্য সম্পন্ন। অনেকেই তাঁকে ভয় করত কিন্তু তিনি আমার কাছে আমুদে এবং বন্ধুভাবাপন্ন ছিলেন আর আমরা পরস্পরকে ভালবাসতাম।

তিনি দু'হাতে আমাকে তাঁর সামনে ধরে ডাকলেন, "রবি! আমি দিনের পর দিন তোমার বাবাকেই তোমার মধ্যে বেশী করে দেখতে

পাচ্ছি। ভগবানের চোখ তোমার উপর রয়েছে। একদিন তুমি একজন মহাযোগী হতে পারবে। তোমার চোখ দুটা ঠিক তোমার বাবার মতই আর তাঁর চুলও তুমি শীঘ্রই ফিরে পাবে।" তিনি হেসে আদরের সংগে আমার ছাঁটা চুলে হাত বুলিয়ে দিলেন কিন্তু চুলগুলো খুব আস্তে আস্তে বাড়ছিল বলে আমার মনে হত।

আমার পাশে আমার মা গর্বে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেন। সাধুবাবা মায়ের দিকে ফিরে বললেন, "ও বিশেষ একজন, বিশেষ একজন!" কথায় জোর দেবার জন্য তিনি এপাশ থেকে ওপাশে মাথা নাড়তে থাকলেন। "ওর বাবার মত ও একদিন একজন মহান যোগী হবে।" কথাটা শুনে আমার বুক গর্বে ফুলে উঠল আর চোখও ভিজে উঠল। কথাটা ঠিক; আমি তা-ই হব। আমি তখন সোজা হয়ে দাঁড়ালাম।

তিনি খুব অল্প সময়ের জন্যই এসেছিলেন। পোর্ট অফ্ স্পেনের একজন ধনী হিন্দুর জন্য তিনি এক বিশেষ পূজা করতে যাচ্ছিলেন। সেই লোকের ক্যান্সার হয়েছিল বলে পরজীবনে যাবার জন্য সে মোটা টাকার বিনিময়ে পথ প্রস্তুত করতে চেয়েছিল। এমন অনেক পণ্ডিত আছেন যাঁরা উপযুক্ত অর্থের বিনিময়ে নির্বাণের প্রতিজ্ঞাও করে থাকেন। পণ্ডিত জানকী অবশ্য তেমন করেন না, তবে হাজার হাজার হিন্দুর তাঁর উপর এমন বিশ্বাস আছে যে, তিনি মধ্যস্থতা করলে দেবতাদের কাছ থেকে মনের মত ফল লাভ করা যায়। সেই ফল লাভের জন্য তারা যথেষ্ট খরচ করতেও দ্বিধা বোধ করে না।

আমাদের আশীর্বাদ করার পর সেই মহা পণ্ডিত তাঁর ধূতির গেরো আরও শক্ত করে নিয়ে দরজার কাছে গিয়ে একটু থেমে নমস্কার করলেন। আমরা আমাদের প্রত্যেকের ভিতরে দেবত্বের স্বীকৃতির জন্য কপালের কাছে হাত জোড় করে তাঁকে নমস্কার করলাম। পর মুহূর্তে তিনি সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলেন। আমি দৌড়ে বারান্দায় বের হয়ে তাঁকে হাত নাড়িয়ে বিদায় জানালাম। পরে তিনি গাড়ীতে গিয়ে উঠলেন। গাড়ীটা তাঁর জন্য বাইরে অপেক্ষা করছিল। গাড়ীটা মোড় ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেল। তাঁর কথাগুলো আমার কানের মধ্যে তখনও

বাজছিল। আমি যে বিশেষ একজন তা ভুলে যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল, কারণ প্রত্যেকেই সে কথা আমাকে মনে করিয়ে দিত যে, আমি একজন বড় পণ্ডিত হব— তার চেয়েও বড় বিষয় হলো যে আমি একজন যোগী হব। আমার বাবার মত একজন পবিত্র লোক হব।

মা-ও আমার পাশে দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছিলেন। তিনি এবার আমাকে জড়িয়ে ধরে আমার পিঠ চাপ্‌ড়ে আদর করলেন। আমি মনে করলাম মা যা ভাবছেন তা আমি বুঝতে পেরেছি। তিনি নিশ্চয়ই ভাবছেন যে, আমি বাবার মতই হব; বাবার বোঝা এখন আমার উপর পড়েছে আর আমি ও মা দু'জনে বাবার পদচিহ্ন ধরেই চলব।

কিন্তু আমার চিন্তা ভুল ছিল। তিনি তখন ভাবছিলেন অন্য কথা— কিভাবে বললে আমি আঘাতটা কম পাব। শেষে তিনি বললেন, "রবি, তোমার বাবার ছাই নিয়ে গিয়ে সবচেয়ে পবিত্র নদী গংগায় ছিটিয়ে দিতে হবে যাতে তা গিয়ে সমুদ্রে পড়ে। বাবা, আমি চাই আমি মরে গেলে তুমি আমার জন্যও তা-ই করবে।"

গংগা! ঐ নামটা ঘিরে কি রহস্যের জালই না জড়িয়ে আছে। গংগা হল সমস্ত নদীর মা—যেমন গরু আমাদের সকলের মা। সবচেয়ে উঁচু পর্বত হিমালয় থেকে শুদ্ধভাবে নেমে এসে গাছপালাহীন লম্বা প্রান্তর ও উপত্যকা দিয়ে বয়ে গিয়ে গংগা বংগোপসাগরে পড়েছে। পবিত্র শহর বারানসীতে গিয়ে মাকে সেই ছাই জলের উপর ছিটিয়ে দিতে হবে। এটাই হবে আমার বাবার জন্য শেষ কাজ—তাঁর আত্মাকে শ্রীকৃষ্ণের হাতে তুলে দেওয়া।

মাকে আমি অনুনয় করে বললাম, "মাগো, তুমি আমাকে নিয়ে যাবে না? আমি তোমার সংগে যাবই। আমাকে তোমার নিতেই হবে!"

"রবি, আমি তোমাকে নিতে পারলে খুশী হতাম, কিন্তু যাত্রাটা তোমার জন্যে অনেক দূর হবে। তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়বে। তাছাড়া তোমার স্কুল কামাই হবে।"

"আমি কক্ষনো ক্লান্ত হব না; তাছাড়া আমি তো ভারতেই স্কুলে যেতে পারি।"

মা দুঃখিত হয়ে আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে বললেন, "না, বাবা, তা হয় না। তুমি চিন্তা কোর না, আমি শিগ্গির ফিরে আসবই আসব।"

আমি কাতর হয়ে বললাম, "আমাকে একা রেখে যেয়ো না, মা। তুমি ছাড়া আমি এখানে একা থাকতে পারব না।"

"তুমি তো একা থাকবে না। দিদিমা থাকবেন, রেবতী মাসীমা থাকবেন আর তোমার মামাতো-মাসতুতো ভাই-বোনেরা থাকবে। তোমার কুমার মামা ও ল্যারী মামা থাকবেন...।" এই বলে তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে আমার কাঁধ চাপড়ে দিলেন। তারপর বললেন, "রবি, আমি সত্যি বলছি, আমি খুব শিগ্গির ফিরে আসব। আমি তোমার জন্য ভারত থেকে কি আনব? তুমি কি চাও?"

আমি খুব আগ্রহের সংগে বললাম, "একটা হাতী এনো। ঐ ছবিতে যেমন দেখা যাচ্ছে ঠিক ঐ রকম একটা হাতী আমার জন্যে এনো।"

* * * * * *

মা আমাকে শিখিয়েছিলেন হিন্দু হিসাবে আমার কর্তব্য হল, কোন অসন্তোষ প্রকাশ না করে কপালে যা থাকে তা-ই মেনে নিতে হয়। শ্রীকৃষ্ণ যে কর্ম আমার উপর চাপিয়ে দিয়েছেন তাতে আমার কর্তব্য হল সুখ-দুঃখে উদাসীন থেকে সব কিছু গ্রহণ করা, কিন্তু আমার মত ছোটি ছেলের পক্ষে সেই কর্তব্যের বোঝা খুব ভারী ছিল। শেষে আমার মায়ের যাবার দিন এসে গেল। আমি মনে দুঃখ নিয়ে মায়ের পাশে গাড়ীতে উঠে বসলাম। মাকে বিদায় দেবার জন্য আমি কেবল পোর্ট অফ্ স্পেনের জাহাজ-ঘটি পর্যন্ত যেতে পারব। তিনি সেখান থেকে জাহাজে উঠবেন। জাহাজটা ইংল্যাণ্ড হয়ে ভারতে যাবে। দিদিমা আমাদের সংগে আসতে পারলেন না বলে ঘরের জানলা দিয়ে হাত

নেড়ে মাকে বিদায় জানালেন এবং মা-ও ফিরে হাত নাড়লেন। দিনটা আমার জন্য ছিল সবচেয়ে দুঃখের। যাহোক্, আমাদের গাড়ীটা রওনা হয়ে গেল। আমিও হাত নেড়ে সবাইকে বিদায় জানালাম, কারণ মনে মনে স্থির করেছিলাম, আমিও মায়ের সংগে ভারতে যাব। জোর বাতাসে নতুন পতাকাটি মদ ও সাধারণ মালের দোকানের উপরে একটা লাঠির মাথায় উড়ছিল। দিদিমা সাদা কাপড় থেকে আমার প্রিয় বীর বানর-দেবতা শ্রীহনুমানের মূর্তি কেটে নিয়ে লাল কাপড়ের উপরে বসিয়ে সুন্দর করে সেলাই করে পতাকা তৈরী করেছিলেন। মনে হচ্ছিল সেই পতাকা থেকে শ্রীহনুমান আমাকে বিদায় জানাচ্ছেন। মনে হল লক্ষণটা শুভ।

প্রায় ডজন খানেক গাড়ীভরা আত্মীয়-স্বজন এসেছিলেন মাকে বিদায় জানাতে। প্রায় বছরখানেক আগে আমরা এই জাহাজ-ঘাটেই এসেছিলাম আমার বড় মামা দেবনারায়ণকে বিদায় জানাতে। তিনি ইংল্যাণ্ডে যাচ্ছিলেন। তিনি ছিলেন আমার মায়ের সবচেয়ে বড় ভাই। তিনি লণ্ডনের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে গিয়েছিলেন। তিনি আমার কাছে আমার বাবার মতই ছিলেন। জাহাজ যখন বন্দর ছেড়ে আস্তে আস্তে চলতে শুরু করেছিল তখন আমরা সবাই কেঁদেছিলাম। আমার মনে হচ্ছিল, আমার বুক বুঝি ফেটেই যাবে। আর এখন আমার মা চলে যাচ্ছেন! গোপনে আমার জামার হাতায় আমি চোখ মুছে ফেললাম। আমি সাহসী থাকতে চেয়েছিলাম কিন্তু বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনেরা যখন বার বার বলছিলেন আমার মায়ের কত সৌভাগ্য যে, তিনি এই রকম একটা পবিত্র তীর্থযাত্রা করতে পারছেন তখন আমার কাছে তা অসহ্য হয়ে উঠল। তাঁরা বলছিলেন, "রবি, তোমার মা ভারতে গংগার কাছে যাচ্ছেন! তাঁর কি সৌভাগ্য! মন খারাপ কোরো না, তিনি তো শিগগিরই ফিরে আসবেন।" আমি কেমন করে তাঁদের অথবা আমার মাকে বলব যে, আমার বুক ফেটে যাচ্ছে?

আমরা সবাই জাহাজে গিয়ে উঠলাম। আমি অসাড়ের মত সব উত্তেজনাপূর্ণ কথাবার্তা শুনতে লাগলাম-কত বড় আর কত সুন্দর

জাহাজটা; থাকবার জায়গাও কি আরামদায়ক। আর খাবার? এই ডাচ্ জাহাজের বিদেশী রান্নাবান্নাও কত মজার! আমার কাছে সব কিছুই উপহাসের মতই লাগল। আমি জানি ও সব আরাম আমার মায়ের প্রয়োজন হয় না। যাত্রাপথে খাওয়ার জন্য তিনি আমার এক মামাকে জাহাজ-ঘাটে পাঠিয়ে অনেক ফল ও সবজী কিনে আনিয়েছিলেন। আমার যখন মাত্র চার বছর বয়স তখন থেকে আমি নিজের ইচ্ছায় 'অহিংসা' পালন করব বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম। এই 'অহিংসা' হল কারও উপর জবরদস্তি না করা, সমস্ত প্রাণীর প্রাণ রক্ষা করা। সেজন্য আমি আমার মায়ের মতই নিরামিষ খেতাম। কাজেই আমি ভাবলাম এই সব বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনেরা কেমন করে ভাবতে পারছেন যে,আমার মা সেই একই খাবার ঘরে খেতে বসবেন যেখানে অবিশ্বাসীরা পবিত্র গরুর মাংস খায়!

ধর্মের প্রতি আমার যে আগ্রহ তা কেবল দেব-দেবতাকে খুশী করা অথবা আমার বাবার পদানুসরণ করা তা নয়। কিন্তু তা ছিল আমার মাকে খুশী করা,যিনি আমাকে হিন্দু ধর্ম শিক্ষা দিয়েছিলেন। মা আর আমার মধ্যে আকর্ষণ ছিল খুব বেশী আর আমি তাঁকে খুব ভালবাসতাম। কাজেই এই সব শুভাকাংখী, যাঁরা জোরে জোরে মায়ের এই যাত্রার ব্যবস্থাকে বোকার মত খুব ভাল বলছেন, তাঁদের কথায় আমি বেশী মনোদুঃখ পাচ্ছিলাম, কারণ আমি হিন্দু আদর্শকে তাঁদের চেয়ে আরও গভীরভাবে অনুসরণ করতাম।

জাহাজের বাঁশী অনেকক্ষণ ধরে জোরে জোরে বাজতে লাগল। সবাই বিদায় নেবার আগে শেষ কথা বলতে লাগলেন,"আচ্ছা চলি, তোমার যাত্রা শুভ হোক, গিয়েই চিঠি লিখো, তুমি থাকবে না, আমাদের খুব খালি-খালি লাগবে!"

রেবতী মাসীমা আমাকে সামনের দিকে ঠেলে দিয়ে বললেন, "রবি, এবার তোমার মাকে চুমু দাও।" নিঃসংগতাবোধ যেন আমার উপর ভেংগে পড়ল। আমি দুই হাতে মায়ের কামরার দরজার হাতলটা মরনপণ করে আঁকড়ে ধরে চিৎকার করে বললাম, "আমিও ভারতে

যাব।"

আমার দাদুর বড়,কালো মেটির, গাড়ীর চালকের নাম ছিল কাকা নাখী। তিনি এক ঠোংগা টট্‌কা চিনেবাদাম বের করে আমাকে ভুলাবার জন্য বললেন, "এই যে রবি, চিনেবাদাম, নাও।" আমি চিনেবাদাম খেতে ভালবাসতাম; কিন্তু এখন বাদাম দিয়ে আমাকে ভুলানো যাবে না। তাঁরা কোন উপায়েই আমাকে দরজার হাতল থেকে ছাড়িয়ে আনতে পারলেন না।

মা আমাকে বুঝাতে চেষ্টা করলেন, "রবি, বাবা আমার, তুমি তো এরকম নও। হাতলটা ছেড়ে দিয়ে রেবতী মাসীমার সংগে যাও। তুমি জাহাজ-ঘটি থেকে আমাকে হাত নেড়ে বিদায় জানাতে পারবে।"

আমি হাতলটা আরও শক্ত করে ধরে বললাম, "মা, আমি তোমার সংগে যাবই। মা, মাগো, আমাকে তোমার সংগে নিয়ে যাও।"

বোন চলে যাচ্ছে বলে রেবতী মাসীমা কাঁদছিলেন, চোখ ভরা জল নিয়েই তিনি আমাকে বললেন, "চলে এস, আমাদের যেতেই হবে। জাহাজ এখনই ছেড়ে দেবে।" তিনি দরজার হাতল থেকে আমাকে আস্তে আস্তে ছাড়াবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু ভয়ে আমি হাতলটা আরও জোরে আঁকড়ে ধরলাম । আমি মায়ের চোখে-মুখে একটা হতাশার ভাব দেখলাম। আমাকে আঘাত করা বা জোর করার কথা কেউ চিন্তাও করতে পারত না। আমি একজন বালক-সাধু, একজন ব্রাহ্মণ, একজন মস্ত বড় যোগীর সন্তান; কিন্তু জাহাজের বাঁশী আর একবার সতর্ক করে দেবার জন্য বেজে উঠল।

"আমাদের এখনই যেতে হবে!" এই বলে আমার কুমার মামা শক্ত ভাবে আমাকে ধরলেন। কুমার মামা আমাদের গ্রামের আইন-সংক্রান্ত বিষয়ের পরামর্শদাতা ছিলেন। তাঁর গলায় কর্তৃত্বের স্বর ফুটে উঠত; কিন্তু আমিও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলাম, তাই দরজার হাতল শক্ত করে ধরে চিৎকার করতে লাগলাম। কাকা নাখীও কুমার মামার সংগে যোগ দিয়ে দরজার হাতল থেকে আমার হাত আস্তে করে ছাড়াবার চেষ্টা করলেন। একটা হাত ছাড়ানো হল; তারপর যেই অন্য হাতটা

প্রায় ছাড়িয়ে আনা হল এমন সময় ছাড়িয়ে নেওয়া হাতটা দিয়ে আমি আরও জোরে হাতলটা ধরলাম আর তার সংগে আমার চিৎকার যোগ হল, "আমি মায়ের সংগে যাব। আমি মায়ের সংগে যাব!"

আমি আগে কখনও এরকম করি নি। সেই ছোট সাধুর এইরকম অদ্ভুত আচরণে আত্মীয়-স্বজনেরা বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু তখন নষ্ট করার মত সময় আর ছিল না। ল্যারী মামা আর কাকা নাখী জোর করে হাতল থেকে আমার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে মায়ের কামরা থেকে আমাকে বের করে নিয়ে গেলেন। আমি চিৎকার করে হাত-পা ছুঁড়তে থাকলেও আমাকে জাহাজ-ঘাটায় নামিয়ে নিয়ে যাওয়া হল।

কেমন অদ্ভুত বিদায়! তখন সমস্ত শক্তি আমার ফুরিয়ে গিয়েছিল। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফোঁপাতে লাগলাম। ঘাট থেকে জাহাজ ছেড়ে গেলে পর চোখে জল ভরা থাকাতে মায়ের বিদায় জানানো আমি দেখতে পেলাম না। সারা পথটা কাঁদতে কাঁদতে আমি বাড়ী ফিরে এলাম। কিছুতেই আমি সান্ত্বনা পাচ্ছিলাম না। সারা রাত কাঁদতে কাদঁতে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। পরদিন আমি কিছুই খেতে চাইলাম না। আমাকে সব রকমেই সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করা হলেও আমি পাগলের মত কাঁদতে থাকলাম। আমি জানতাম যে, আমার ভাগ্যে যা লেখা আছে তা হবেই, কিন্তু আমি তো তখন ছোট একটা ছেলে, একজন অসহায় মানুষ মাত্র, যার তখন একমাত্র প্রয়োজন ছিল মায়ের ভালবাসার, মায়ের মমতার।

তখন আমার মনে এই ভাবনাই হয়েছিল যে, আমার মাকে আমি আর দেখতে পাব না। প্রত্যেকটা ফোঁপানির সংগে ঐ রকম একটা মনোভাব আমার মধ্যে জেগে উঠছিল।

৪
কর্ম ও ভাগ্য

"তোমাকে ধৈর্য ধরতে শিখতে হবে রবি। এমন আর কোন বিষয় নেই যা আরও প্রয়োজনীয়, আরও কঠিন।"

"কিন্তু আমার মা যে বলেছিলেন তিনি শিগ্‌গিরই ফিরে আসবেন? দু'বছর তো হয়ে গেল আর এখন লিখেছেন আগামী বছরে তিনি আসবেন। সব সময়ই তিনি লিখছেন আগামী বছর!" বন্ধুরা জিজ্ঞেস করলে আমি বলি তিনি আগামী বছরে ফিরে আসবেন, কিন্তু আমি নিজে তা আর বিশ্বাস করি না।

আমি প্রত্যেক দিন সকাল বেলা দিদিমার সংগে দেখা করতে যেতাম। তিনি সব সময়ই জানলার কাছে বসে থাকতেন। আমি হাত জোড় করে নীচু হয়ে তাঁকে নমস্কার জানিয়ে তাঁর সামনে মাটিতে হাঁটু মুড়ে বসতাম। তিনি প্রায় সারাদিনই সূঁচ দিয়ে জটিল কোন সেলাইয়ের কাজ করতেন আর আমি মাটিতে বসে তাঁর আংগুলের দিকে তাকিয়ে থাকতাম। তিনি সেই সব জিনিষ প্রায়ই অন্যদের দিয়ে দিতেন। সন্তান জন্মের পর পোলিও রোগ হয়ে তার কোমর থেকে পা পর্যন্ত অসাড় হয়ে গিয়েছিল। আগে আমার দাদুর অত্যাচারের দরুন অনেক রাত তাঁকে বাইরে আমগাছ তলায় বৃষ্টির মধ্যে কটাতে হয়েছে। তিনি সব দুঃখ-কষ্ট বিনা বাক্যে সহ্য করতেন। তবুও তিনি বাড়ীর সবার চেয়ে হাসিখুশী ছিলেন। আমাদের কারও সান্ত্বনা বা উপদেশ পাবার দরকার হলে আমরা তাঁর খোঁজ করতাম।

তিনি আমাকে বললেন; "রবি, ধৈর্য ধর। আমরা সবাই তোমার

মায়ের অভাব বোধ করছি। তিনি বারানসীর একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বার জন্য বৃত্তি পেয়েছেন। তুমি তো জান না যে, তাঁর বিয়ের আগে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে চেয়েছিলেন। এটা তাঁর কর্মফল, তাঁর ভাগ্যের লিখন, কেউ তা বন্ধ করতে পারে না।"

"মা কি তাহলে আগামী বছর সত্যিই ফিরে আসবেন?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম। দিদিমা আস্তে আস্তে বললেন, "রবি, মাকে কখনও অবিশ্বাস কোরো না— কাউকেই কোরো না। তিনি আগামী বছরে ফিরে আসতে চাইছেন, কিন্তু যদি ফিরে আসতে না পারেন তবে বুঝবে নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে। সেজন্য তা ধৈর্যের সংগে গ্রহণ কোরো।" তাঁর এই কঠিন উপদেশ মেনে নেওয়া আমার পক্ষে সহজ হল না।

দিদিমার ব্যবহার খুব মিষ্টি ছিল। তিনি কখনও কাউকে কোন কড়া কথা বলতেন না। বাড়ীর অন্যদের মত তাঁর ব্যবহারে কোন রাগের স্পর্শও থাকত না। বাড়ীতে কোন ঝগড়া-বিবাদ যখন রাগের পর্যায়ে পৌঁছাত তখন মাঝে মাঝে মনে হত দাদুর ক্রুদ্ধ আত্মা বুঝি তাঁর বংশধরদের মধ্যে এসব খুঁচিয়ে তুলছে। দিদিমার শান্ত মুখখানা তখন ঘায়ের উপরে মলম লাগাবার মত মনে হত।

দাদু যে সব সময় রাগারাগি করতেন তা নয়। মাঝে মাঝে তাঁকে দেখে মনে হত তিনি যেন মহত্ব ও দয়ার অবতার— গরীবদের টাকা ধার দিতেন, এমন কি, নিম্নস্তরের হিন্দু, যাদের বর্ণবাদী হিন্দুরা ঘৃণা করত, তাদেরও তিনি টাকা ধার দিতেন। দাদু ছিলেন সকলের প্রিয় বন্ধু ও উপকারী লোক। বাবান্দায় দাঁড়িয়ে মাঝে মাঝে তিনি মুঠো মুঠো পয়সা নীচের দোকানের সামনে ছুঁড়ে ফেলতেন। ছেটি ছেলেমেয়েরা আর কাছাকাছি ক্ষেতের মজুরেরা খুব খুশী হয়ে তা কুড়িয়ে নিত। মনে হত যেন স্বর্গ থেকে ওগুলো পড়ছে। আমাদের দ্বীপের মধ্যে দাদু ছিলেন প্রথম ব্যক্তি, যাঁর একটা রেডিয়ো ছিল। তিনি সেই বড় ও দামী রেডিয়োটা আমেরিকা থেকে আনিয়েছিলেন। তিনি সেই আশ্চর্য বাক্সটা বের করে প্রায়ই সকলকে তা দেখতে ও

শুনতে দিতেন। বড় বৈঠকখানায় সারি সারি চেয়ার পাতা হত; প্রতিবেশী, দোকানের খদ্দের, বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়দের ডাকা হত এবং খুব জোরে তা বাজানো হত। মনে হত যেন পর্দা ছাড়াই সিনেমা দেখানো হচ্ছে। এইভাবে তিনি ধনী-গরীব সবাইকে বিশেষ সম্মান দেখাতেন। তারা সবাই সেই বিশেষ যন্ত্রটা দেখে আশ্চর্য হত।

কিন্তু দাদুর স্বভাবের মন্দ দিকটা মনে হত যেন উপরের স্তরের ঠিক নীচেই রয়েছে আর তা হঠাৎ করে বের হয়ে আসে। মদের দোকানে কোন খদ্দেরের সংগে দেনা-পাওনা নিয়ে কথা বলতে বলতে হঠাৎ কথার মাঝখানেই সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে ঘরে ঢুকে চামড়ার ভারী চাবুকটা নিয়ে ভীষণ রেগে গিয়ে আমি ছাড়া বাড়ীর আর সবাইকে তিনি মারতে শুরু করতেন। এই রাগের কারণ কেউ কোন দিন আবিষ্কার করতে পারে নি। আমরা মনে করতাম এটা তাঁর কর্মের ফল—তাঁর আগের জন্মের কোন কিছু তাঁকে এইভাবেই সম্পন্ন করতে হচ্ছে। হিন্দু পৌরাণিক কাহিনীর মধ্যে এমন অনেক গল্প আছে যেখানে দেখা যায় দৈত্য-দানবেরা কর্মের পরিচালনা করছে। মাঝে মাঝে মনে হত তাদের মধ্যে সবচেয়ে যে খারাপ সে-ই দাদুর মধ্যে ঢুকে তাঁকে হঠাৎ দানবের মত করে তুলেছে! মনে করা হত, যে দৈত্য তাঁর ধন-দৌলৎ পাহারা দিচ্ছে সে-ই বুঝি তাঁকে অধিকার করে বসেছে, কারণ তাঁর রাগটা স্বাভাবিক ধরণের ছিল না এবং সেই সময় তাঁর শক্তি ও চালাকী ফুটে উঠত, অথচ তিনি একজন ধার্মিক লোক ছিলেন। প্রত্যেক দিন সকাল ও বিকাল বেলা ছেলে মেয়েদের নিয়ে তিনি হিন্দু হিসাবে প্রার্থনা ও উপাসনা করতেন, ভজন গান করতেন এবং দেব-দেবতাদের কাছে মন্ত্র পাঠ করতেন।

দিদিমা পংগু হয়ে গেলে পর দাদু আবার বিয়ে করলেও মাঝে মাঝে দিদিমার সংগে খুব ভাল ব্যবহার করতেন। যে সব পণ্ডিতেরা সুস্থ করতে পারতেন তাঁরা যাতে দিদিমাকে সুস্থ করেন সেজন্য তিনি প্রচুর টাকা ব্যয় করতেন। তিনি দিদিমাকে অনেক বেদে-বেদেনী ও বৈদ্যদের কাছে, পোর্ট অফ্ স্পেনের বড় হাসপাতালে, এমন কি,

বিখ্যাত ক্যাথলিক উপাসনালয়েও নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর টাকা-পয়সা অথবা যে সব আত্মাদের উপর তিনি বিশ্বাস করতেন তারা কেউই দিদিমাকে একটুখানিও সুস্থ করতে পারে নি। দিদিমার কোমর থেকে পা পর্যন্ত আংশিকভাবে অসাড় হয়ে গিয়েছিল এবং খুব কষ্ট করে তিনি একটু-একটু নড়াচড়া করতেন।

তাঁর ছেলেমেয়েরা খুব মমতার সংগে তাঁকে বাড়ীর এদিক-ওদিক বয়ে নিয়ে যেত। তাঁর প্রয়োজন মত জানালার কাছে যেখানে তিনি বসতেন সেখানে, খাবার সময় খাবার ঘরে, আবার যখন আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধু-বান্ধবেরা আসত কিম্বা কোন বিশেষ পূজা করবার জন্য পণ্ডিতেরা আসতেন তখন তারাই তাঁকে বসবার ঘরে বয়ে নিয়ে যেত। যতক্ষণ তিনি জেগে থাকতেন ততক্ষণ তাঁর প্রিয় জায়গা জানলার কাছে বসে বসে বাইরের সব কিছু দেখতেন। তিনি দেখতেন নারকেল গাছের ওপাশে, দেখতেন আখ ক্ষেতের ওপাশে এবং উপসাগরের পাশে সেই গরান গাছগুলোর মধ্যেকার জলা জায়গাটা। সকালবেলা তাঁকে স্নান করাবার পরই সেই জানলার কাছে বসিয়ে দেওয়া হত। সেলাইয়ের কাজ থেকে তাঁর চোখকে বিশ্রাম দেবার জন্য তিনি মাঝে মাঝে বাইরে তাকাতেন-দেখতেন উজ্জ্বল রংয়ের প্রজাপতি, দেখতেন নানা রকমের পাখী এ গাছ থেকে ও গাছে উড়ে বেড়াচ্ছে কিম্বা উড়ে আকাশের দিকে চলে যাচ্ছে। কালো-হলুদে পাখী যেগুলো ক্ষেতে শস্য খায় ও ছোট্ট নীল পাখী। আমি বিশ্বাস করি এই ছোট্ট নীল পাখীই আমার বাবার ছাইয়ের উপরে পায়ের ছাপ ফেলেছিল।

দিদিমা যখন পোর্ট অফ স্পেনের হাসপাতালে ছিলেন তখন কেউ তাঁকে একটা বাইবেল দিয়েছিল। হাসপাতাল থেকে তিনি সেটা বাড়ীতে এনেছিলেন। তিনি সেই নিষিদ্ধ বইটা পড়তে ভালবাসতেন, বিশেষ করে গীতসংহিতা তাঁর প্রিয় ছিল। একদিন তিনি যখন চুপি চুপি তাঁর ছেলেমেয়েদের কাছে সেটা পড়ছেন তখন দাদু তা দেখতে পেয়ে রাগে জ্বলে উঠলেন।

তিনি হিন্দি ভাষায় গর্জন করে বললেন, "আমি তোমাকে এমন

শিক্ষা দেব যাতে তুমি আর কখনও ঐ খ্রীষ্টানদের মিথ্যা কথাগুলো বাড়ীতে আনতে না পার।" এই বলে তিনি তাঁর চামড়ার বেল্টটা খুলে নিয়ে দিদিমাকে এমন ভাবে মারলেন যে, তাঁর পিঠে, কাঁধে কালশিরা পড়ে গেল। তারপর তিনি দিদিমাকে দুহাতে তুলে নিয়ে বারান্দায় গিয়ে লম্বা সিঁড়ির উপর ফেলে দিলেন। তিনি যখন সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে পড়ে কাতরাচ্ছিলেন তখন দাদু সেই বাইবেলটা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ময়লার মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। দিদিমা আবার কোথা থেকে আর একটা বাইবেল জোগাড় করে পড়ার সময় দাদু আবার তাঁকে ভীষণ ভাবে মেরে সিঁড়িতে ফেলে দিয়েছিলেন। দাদুর দ্বিতীয় স্ত্রীর অবস্থাও হয়তো একই রকম হত, কিন্তু অন্য কোন কারণে তাঁকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। দিদিমা পংগু ছিলেন বলে পালাতে পারেন নি, তাই নীরবে সব কিছু সহ্য করতেন, ভাবতেন এ সবই তাঁর কর্মফল।

দিদিমা যে সেই ঘৃণিত খ্রীষ্টান-বই পড়তেন তাতে আমার খুব আশ্চর্য লাগত। আমার জানা একজন পণ্ডিত যখন বাইবেল থেকে কোন উদ্ধৃতি দিতেন তখন রাগে আমি জ্বলে উঠতাম। তিনি ছিলেন রামকৃষ্ণ ভক্ত। রামকৃষ্ণ কালীর একজন ভক্ত ও বিবেকানন্দের শিক্ষক ছিলেন। তিনি বেদান্ত সমাজের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। দিদিমার মত তিনি বিশ্বাস করতেন যে, সব ধর্মের মধ্যেই কিছু সত্য আছে এবং যে কোন ধর্ম পালন করেই ব্রহ্মার কাছে পৌঁছানো যায়। এই বিশ্বাস আমি মানতে পারতাম না, কারণ আমি আগে থেকেই অতি উৎসাহী হিন্দু ছিলাম। ভগবদ্‌গীতায় যখন আমি শ্রীকৃষ্ণের বাণী শুনতাম যে, সব পথ গিয়ে তাঁর কাছেই পৌঁছায় তখন আমার খুব রাগ হত। কথাগুলো গীতায় আছে বলে আমাকে তা মেনে নিতে হলেও এই ভেবে আমি সান্ত্বনা পেতাম যে, আমার ধর্মই শ্রেষ্ঠ। দিদিমা তাঁর ধর্মের সংগে খ্রীষ্টধর্মকেও মিশাতে চেয়েছিলেন। আমরা যদিও তাঁর সংগে একমত ছিলাম না তবুও তা নিয়ে কখনও আলোচনা করতাম না।

রেবতী মাসীমা খুব গোঁড়া হিন্দু ছিলেন। তিনি কখনো বাইবেল

পড়বেন না! আমাকে বলতেন, "রবি, পড়তে হলে ভগবদ্ গীতা পড়বে, বারবার পড়বে।" এ কথা বলে তিনি প্রায়ই আমাকে উৎসাহিত করতেন। তাঁর ধর্মীয় জীবন কটিানোকে আমি সম্মানের চোখে দেখতাম। মা যেমন করতেন সেইভাবেই তিনি আমাকে বেদ থেকে অনেক শিক্ষা দিতেন, বিশেষ করে বেদান্ত থেকে শিক্ষা দেওয়া তাঁর খুব প্রিয় ছিল।

পবিত্র শাস্ত্রে যা লেখা আছে তা আমি গ্রহণ করতাম যদিও তার বেশীর ভাগ আমার পক্ষে বোঝা কঠিন ছিল এবং পরস্পর বিরোধী ছিল। একটা বিষয়ে আমার তীব্র অনুভূতি ছিল যে, ঈশ্বর অনাদি-অনন্ত কাল ধরেই আছেন এবং তিনিই সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু বেদে লেখা আছে এমন এক সময় ছিল যখন কিছুই ছিল না এবং কিছু না থেকেই ব্রহ্মার সৃষ্টি হয়েছে। এমন কি, গোঁসাই পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের এই কথা মেনে নিতে পারতেন না যে, যা নেই তা কখনও হতেও পারে না। আমার কাছে ওটা একটা হেঁয়ালী হয়েই রইল।

হিন্দু ধর্মের মধ্যে ঈশ্বর সম্বন্ধে যে ধারণা আমি পেয়েছি তা হল, একটা পাতা, একটা পোকা, একটা নক্ষত্রও ঈশ্বর— ব্রহ্মাই সব এবং সবই ব্রহ্মা। কিন্তু ঈশ্বর সম্বন্ধে আমার যে চেতনা ছিল তাতে আমি বুঝতাম ব্রহ্মা জগতের এক একটা অংশ নন বরং তিনি এর স্রষ্টা। আমাকে যেমন শেখানো হয়েছিল সেইভাবে আমি বুঝতাম না, বুঝতাম তিনি অন্য একজন এবং আমার চেয়ে অনেক মহান। তিনি আমার মধ্যে থাকেন না। রেবতী মাসীমা ও গোঁসাই দু'জনেই বলতেন যে, আমি এবং অন্যান্য সবাই মায়ার অধীন। সত্য সম্বন্ধে এটা ভুল ধারণা, বিশেষ করে যারা এখনও আলো পায় নি তারা সেই ধারণাই করে। আমি এই ভুল ধারণা থেকে মুক্ত হতে চেয়েছিলাম। আমার বাবা এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন এবং ব্রহ্মা থেকে বিচ্ছিন্নতার ভুল ধারণার উপর জয়ী হয়েছিলেন। আমিও তাই হতে চেয়েছিলাম।

আমার বাবার রহস্যময় মৃত্যুর পরে আমি হস্ত রেখাবিদ, গণক এবং ভবিষ্যদ্বক্তাদের একটা প্রিয় বিষয় হয়ে দাঁড়ালাম। তারা প্রায়ই

আমাদের বাড়ীতে আসত। আমাদের পরিবার একজন গণকের পরামর্শ না নিয়ে কোন বিশেষ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করত না। কাজেই আমার ভবিষ্যৎ যে তাদের দ্বারাই স্থির করা হবে এটা বলা অনাবশ্যক। আমি এমন কিছু আগ্রহের সংগে আকাংখা করতে পারতাম না যা আমার ভাগ্যে নেই। সেইজন্য আমি জেনে উৎসাহ পেতাম যে, আমার হস্তরেখা, গ্রহ ও ভাগ্য সবই স্বীকার করে যে, আমি একজন মহান হিন্দু নেতা হব। যোগী, গুরু, পণ্ডিত, সন্ন্যাসী, মন্দিরের মহাপুরোহিত ইত্যাদি সকলের মুখ থেকে পূর্বসংকেতের এসব কথা শুনে শুনে আমার অল্প বয়সী মন ঝক্‌মকিয়ে উঠত।

একজন বিশিষ্ট হস্তরেখাবিদ স্ত্রীলোক প্রায় সাত মাইল দূরে মায়ো নামে একটা ছোটি গ্রামে বাস করতেন। একজন ব্রাহ্মণ পুরোহিতের সেই আকর্ষনীয়া মেয়ের কাছে ভবিষ্যতের বিষয় জেনে নেবার জন্য দ্বীপের সব জায়গা থেকে লোকেরা তাঁর কাছে যেত। পণ্ডিতদের কাছে তিনি বিশেষ প্রিয় ছিলেন বলে তাঁরা প্রায়ই তাঁর কাছে আসতেন। একদিন তিনি আমাদের বাড়ীতে এসে আমার হাত দেখে বললেন, "২০ বছর বয়সের সময় তোমার খুব অসুখ হবে, তারপর তুমি অনেক দিন বেঁচে থাকবে। তুমি একজন বিখ্যাত হিন্দু যোগী হবে। তোমার ২৫ বছর বয়সের আগেই তুমি একজন সুন্দরী হিন্দু মেয়েকে বিয়ে করবে। তোমার ৪, জন ছেলে মেয়ে হবে এবং তুমি ধনী হবে।"এর বেশী মানুষ আর কি চাইতে পারে? তাহলে সত্যিই দেবতারা আমার উপর খুব খুশী আছেন।

দ্বীপের মধ্যে আর একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন যিনি আত্মার সাহায্যে ভবিষ্যৎ গণনা করতেন। গভীর ধ্যানে মগ্ন হলে তিনি দেখতেন তাঁর পাশে গোখরা সাপ এসে বসে আছে। তিনিও প্রায়ই আমাদের বাড়ীতে আসতেন। তিনি আমার রেবতী মাসীমাকে ভালবাসতেন এবং তাঁকে বিয়ে করার আশা রাখতেন। আমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তিনি বলেছিলেন যে, আমি একজন বিখ্যাত ও ধনী পণ্ডিত হব। আমার কাছে এটা ছিল উত্তেজনাপূর্ণ। তিনি যাদুর শক্তিতে অনেক কঠিন রোগ ভাল

করেছিলেন, অবশ্য আমার দিদিমাকে ভাল করতে পারেন নি। লোকে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীকে অভ্রান্ত মনে করত। এত জন ভবিষ্যদ্বক্তার কথা শুনে আমার ভাগ্য সম্বন্ধে কার সন্দেহ থাকতে পারে? সাধু জানকী প্রসাদ যে বলতেন, আমি বিশেষ একজন হব, তাতেই বা কার সন্দেহ থাকতে পারে?

যতবার আমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বলা হত ততবারই সকলের বিশ্বাস বেড়ে যেত যে, কোন একজন উচ্চতর হিন্দু যোগী বা ঐ রকম কিছু হবার জন্য আমাকে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাহলে এটা হঠাৎ কোন একটা ঘটনা নয় যে, আমি একজন বিখ্যাত যোগীর ছেলে হয়ে জন্মাব যে যোগীকে লোকে অবতার হিসাবে শ্রদ্ধা করত। এটা হল আমার ভাগ্যের লিখন। কর্ম সম্বন্ধে আমার জ্ঞান বৃদ্ধিও ছিল অনেকগুলো কারণের মধ্যে একটা, কারণ যা পরবর্তীকালে সিদ্ধান্ত নিতে আমাকে প্রভাবিত করেছিল। আমার আগেকার জীবনের সমস্ত কর্মফল নিশ্চয়ই আমার এখনকার জীবনের প্রস্তুতির জন্য অনিবার্য করে তুলেছিল যাতে আমি হিন্দু পুরোহিত হবার জন্য আন্তরিকতার সংগে খুব তাড়াতাড়ি পড়াশোনা আরম্ভ করতে পারি।

আমি যখন বললাম যে, আগামী গ্রীষ্মের ছুটিতে আমি একটা মন্দিরে গিয়ে পড়াশোনা করব তখন আমার বাবার সৎ বোন পূয়া মোহানী সবচেয়ে বেশী খুশী হয়েছিলেন। তিনি খুবই ধার্মিকা ছিলেন এবং প্রায়ই তিনি বড় বড় উৎসবে হিন্দিতে বক্তৃতা দিতেন। তাঁর জ্ঞানকে আমি সম্মানের চোখে দেখতাম এবং মনোযোগ দিয়ে তাঁর উপদেশ শুনতাম। আমার বাবাকে তিনি যেভাবে ভক্তি-শ্রদ্ধা করতেন, বাবা মারা যাবার পর থেকে তিনি আমাকে সেভাবেই ভক্তি-শ্রদ্ধা করতে লাগলেন। তিনি প্রায়ই আমাদের বাড়ীতে আসতেন এবং আসবার সময় আমার জন্য মিষ্টি, না হয় কাপড়-চোপড়, না হয় টাকা-পয়সা নিয়ে আসতেন। এই রকম উপহার ব্রাহ্মণকে দিলে দেবতারা খুশী হন এবং যে দেয় সে নিজের জন্য পুণ্য সঞ্চয় করে। আমার সিদ্ধান্তের কথা শুনেই পূয়া আমাকে অভিনন্দন জানাতে আসলেন।

আমাকে জড়িয়ে ধরে তিনি বললেন, "রবি, তোমার বাবা তোমার জন্য গর্ব বোধ করবেন। তুমি কোন্ মন্দিরে যাবে?"

উত্তরে আমি বললাম,"যে মন্দিরে ভারতের স্বামীজি আছেন আমি সেখানে যাব।"

আমার ঠাকুরমা খুশী হয়ে বললেন, "তাহলে দূর্গা আশ্রমই হবে তোমার জন্য ঠিক জায়গা।"

একজন পণ্ডিতের ঘরে-তৈরী ওষুধে আমার ঠাকুরমা অন্ধ হয়ে গেলে আমার ঠাকুরদাদা আর একজন স্ত্রী গ্রহণ করেছিলেন। ভারত থেকে যে সব ধনী স্ত্রীলোক এ দেশে এসেছিলেন তাদের মতই আমার ঠাকুরমা ছিলেন একজন চলমান গহনার দোকান। হাতের কব্জি থেকে কনুই পর্যন্ত সোনা ও রূপার চুড়ীতে ঢাকা। গলায় ছিল সোনার মোটা শিকল আর তাতে ঝুলানো ছিল সোনার টাকা। তাঁর নাকের একপাশে ছিল সোনার ফুল আর তাঁর খালি পায়ের গোছার উপরে অনেকদূর পর্যন্ত সোনা-রূপার খাড়ু ছিল। কিন্তু আমার দিদিমা ছিলেন এর সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি মাঝে মাঝে কেবল সোনার এক জোড়া বালা পরতেন।

পূয়া খুশী হয়ে বললেন, "তুমি ঠিক বলেছ যে স্বামীজী ঐ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন তিনি সত্যিই ভাল।" একথা বলতে বলতে উৎসাহে তাঁর চোখ জ্বল জ্বল করে উঠল।" তুমি তখন ছোট ছিলে, তিনি ভারত থেকে আসলে পর তোমার মা ও রেবতী তাঁর সংগে সংগে সব জায়গায় গিয়ে সমস্ত পূজা-পার্বনে অংশ নিত। স্বামীজী ঐ মন্দিরের অনেক উন্নতি করেছেন, এখন যিনি ঐ মন্দিরে আছেন, তিনিও ভাল লোক। তিনি একেবারেই কোন হাসি-ঠট্টা করেন না।"

পূয়া আমার মাথার উপর হাত রেখে আমার মুখের দিকে তাকালেন। একটা গভীর গর্ববোধ তাঁর চোখে ছিল, কিন্তু তাঁর গলার স্বরে গর্ববোধের চেয়ে আরও বেশী কিছু ছিল— একজন ভবিষ্যদ্দ্রষ্টার প্রভুত্বপূর্ণ বাণী যা আমার ভিতরে কাঁপুনি ধরিয়ে দিল। তিনি ভাবগম্ভীর ভাবে বললেন, "তুমি একজন বড় যোগী হবে, মানুষ যতখানি ভাবতে

পারে তার চেয়েও বড় হবে।" আমার সমস্ত অন্তর দিয়ে আমি তাঁর কথা বিশ্বাস করলাম। আমার মনে কোন সন্দেহ ছিল না, কারণ এটা আমার কর্মফল।

দূর্গা মন্দিরের ভারপ্রাপ্ত বিখ্যাত ব্রহ্মচারীর অধীনে শিক্ষালাভ করার সুযোগ পাওয়া একটা সম্মানজনক ব্যাপার। আমার বয়স তখন ছিল দশ। এর মধ্যে দ্বীপের চারপাশে আমাদের অংশের লোকদের কাছে আমার সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। আমাদের অংশের আশেপাশে বেশ কয়েক মাইলের মধ্যে যে সব পণ্ডিতেরা ছিলেন তাঁরা সবাই আমার বাবাকে চিনতেন এবং সম্মান করতেন আর আমার সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণীও করেছিলেন। আমার বাবা একজন মহান হিন্দু ছিলেন সেজন্য যে তাঁরা এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তা নয় বরং তাঁরা তা করেছিলেন আমার সুশৃঙ্খল ধর্মীয় জীবন লক্ষ্য করে। আমার জন্মের ১২ দিন পরে পণ্ডিতেরা যে বিরাট উৎসবের ব্যবস্থা করেছিলেন তা সকলেরই মনে গেঁথে গিয়েছিল।

বেদ ও মনুসংহিতার নিয়মাবলীর প্রতি পরিপূর্ণ বাধ্যতা নিয়ে দ্বিজ হিসাবে ব্রাহ্মণের প্রাত্যহিক পাঁচটি কর্তব্য আমি কঠোর ভাবে পালন করতাম। সেই কর্তব্যগুলো ছিল দেবদেবতা, ভবিষ্যদ্বাণী, পূর্বপুরুষ, নিম্ন শ্রেণীর প্রাণী ও মানুষের পূজা। প্রতিদিনের এই পূজা আমি সূর্যোদয়ে শুরু করে সূর্যাস্তে শেষ করতাম। অনেক ধার্মিক হিন্দু চামড়ার বেল্ট বা জুতা পরতেন কিন্তু কোন প্রাণীর চামড়া, বিশেষ ভাবে গরুর চামড়া পরার চিন্তাও আমি করতে পারতাম না। যে প্রাণীর চামড়া আমি পরব সে হয়তো পূর্বজন্মে আমার কোন পূর্বপুরুষ অথবা নিকট আত্মীয় ছিলেন। আমার ধর্মের সংগে কোন আপোষ-নিষ্পত্তি ছিল না। অল্প বয়স থেকেই যে আমি একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত হয়ে উঠছি সেই সুখ্যাতি আমার শহর ছাড়াও অন্যান্য জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছিল।

খুব সকালে উঠেই আমি বিষ্ণুমন্ত্র উচ্চারণ করতাম এবং আমাদের পারিবারিক গুরুকে মনে মনে প্রণাম করতাম। আমি খুব আগ্রহের

সংগে সকাল বেলার স্মরণার্থক প্রার্থনা করতাম এবং প্রতিজ্ঞা করতাম যে, আমি সারাদিন বিষ্ণুর পরিচালনায় চলব, কারণ আমি ব্রহ্মার সংগে এক হয়ে গেছি। সেই প্রার্থনা ছিল এইরকম— "আমিই প্রভু, কোনমতেই ব্রহ্মা থেকে পৃথক নই, কোনরকম দুঃখ-কষ্ট, ও মনস্তাপের দরুন দুর্বলতায় আমি ভুগি না। আমিই অস্তিত্বজ্ঞান, আশীর্বাদ ও চির স্বাধীন। হে জগতের প্রভু, সর্বজ্ঞানী, সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা, লক্ষ্মীর স্বামী, হে বিষ্ণু, ভোর বেলায় জেগে উঠে আমি আমার জাগতিক অস্তিত্বের দায়-দায়িত্ব পালন করব... হে প্রভু হৃষিকেশ, আমার ইন্দ্রিয়ের উপর প্রভাব বিস্তারকারী অস্তিত্বকে দমন করে, আমার হৃদয়ের অন্তস্থলে তোমাকে রেখে তোমার নির্দেশ মতই আমি সব কাজ করব।"

তারপর আমাকে আনুষ্ঠানিক-স্নান করতে হত। এই স্নানের দ্বারা আমি নিজেকে শুচি করে নিতাম যাতে পরবর্তী উপাসনার জন্য প্রস্তুত হতে পারি। তারপর আমি গায়ত্রী মন্ত্র উচ্চারণ করতাম। সেটা ত্রিভুবনের নাম দিয়ে শুরু করতে হত— "ওঁম, ভুঃ, ভুবঃ, শুভঃ— আমরা সেই প্রেরণা দানকারী সমুজ্জ্বল প্রিয় দীপ্তি সবিতার ধ্যান করি। তিনি আমাদের বুদ্ধিকে উদ্দীপিত করুন।" এই মন্ত্রকে আমি সমস্ত মন্ত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মনে করতাম। একজন ব্রাহ্মণের পক্ষে আত্মিক শক্তি পাবার শ্রেষ্ঠ উপাদান হল এই মন্ত্র। এই মন্ত্র ঋগ্বেদ থেকে আহরণ করা হয়েছে। সূর্যের উদ্দেশে এই গান আমি দেবতাদের ভাষা সংস্কৃতে প্রতিদিন শত শত বার গাইতাম। এর আশীর্বাদ লাভ করা যায় বার বার বলাতে ... যতবার বলা যায় ততই মংগল, ছেটি বেলায় অর্থ না বুঝলেও আমি তাড়াতাড়ি করে হাজার হাজার বার সেই মন্ত্র বলতাম। অর্থ না বুঝলেও শুদ্ধভাবে সংস্কৃতে সেই মন্ত্র উচ্চারণ করতে পারাটাই ছিল বেশী দরকারী। এর দ্বারাই ইপ্সিত ফলদানের ক্ষমতার ভিত্তি গঠিত হত। আমি অন্যান্য গোঁড়া হিন্দুদের মত দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতাম যে, সেই মন্ত্র দেব-দেবীর মধ্যে রূপায়িত হয়েছে এবং যা বলা হয় তারই সৃষ্টি হয়েছে। এই গায়ত্রী মন্ত্র উপযুক্ত ভাবে বললে

এবং প্রতিদিন সূর্য-দেবতার উপাসনা করলে সেই দেবতাকে ঠিক জায়গায় রাখা যায়।

তারপর আমি ঠাকুরঘরে সকাল বেলার উপাসনা করতাম। ভাব গম্ভীর ভাবে ধ্যান করতে করতে ভক্তিভরে আমি একটা ম্যাচকাঠি জ্বালিয়ে 'দেয়ার', অর্থাৎ প্রদীপের ঘিয়ে-ভেজানো শল্‌তেটা জ্বালিয়ে দিতাম। তারপর আমার সমস্ত মন সেই কাঁপা কাঁপা আলোর দিকে নিবিষ্ট রাখতাম, কারণ আলোও তো একজন দেবতা। টাট্‌কা চন্দনবাটা নিয়ে আমি ভক্তিভরে প্রত্যেকটি দেবতার কপালে এবং শিবলিংগে লাগিয়ে দিতাম এবং এই কাজ করার উপযুক্ত বলে আমি নিজেকে মনে করতাম। তখন নিজের মধ্যে একটা পবিত্র ভাবের উদয় হত। চন্দনের সুবাসে ঠাকুর-ঘর ভরে যেত আর তাতে আমার মধ্যে একটা উত্তেজনার সৃষ্টি হত। অনেক দেব-দেবতার সংগে আমার ঘনিষ্ঠতা থাকাতে আমি একরকম দৈহিক সুখ অনুভব করতাম।

পূর্ব দিকে মুখ করে আমি পদ্মাসনে বসতাম এবং অল্প অল্প করে জল খেতাম। আনুষ্ঠানিকভাব শুচি হবার জন্য আমার গায়ে ও গায়ের চারপাশে জল ছিটাতাম, নিঃশ্বাস বন্ধ করে যোগ অভ্যাস করতাম, তারপর আমার পূজার দেবতাকে আমার দেহে আহ্বান করতাম (এটাকে 'ন্যাস' বলে) নিজের কপাল, বাহু, বুক ও জানু স্পর্শ করিয়ে সেই দেবতাকে আমার দেহে আনতাম। যখন যে দেবতার পূজা আমি করতাম তাঁর সংগে একটা রহস্যজনক দেহের মিলন আমি অনুভব করতাম। বেদীর সামনে বসে আমি ঘন্টাখানেক গভীরভাবে ধ্যান করতাম এবং আমার সমস্ত মনোযোগ আমার নাকের ডগার উপর স্থাপন করতাম। তাতে আমার চারপাশের জগতের সংগে আমার যোগাযোগ থাকত না এবং তখন আমি সেই একমাত্র সত্য, যিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ধারণ করে আছেন, তাঁর সংগে আমার অপরিহার্য মিলনের অবস্থাকে বুঝতে পারতাম। তারপর অল্প সময় ধরে দেবতার উদ্দেশে জল-উৎসর্গ ও প্রণাম করে তাঁর সংগ ত্যাগ করতাম। এর পর বাইরে গিয়ে এক ঘন্টা ধরে সূর্যের উপাসনা করতাম। তখন অনেকক্ষণ

ধরে দুই চোখ খোলা রেখে প্রায়ই সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকতাম এবং শত শত বার গায়ত্রী মন্ত্র বলতাম। আমি যেমন শিক্ষা পেয়েছি সেইভাবেই আমি বিশ্বাস করতাম; যাদের পুরোপুরিভাবে এই মন্ত্রের প্রতি ভক্তি আছে তাদের আত্মার উদ্ধার এর শক্তি দ্বারাই হয়। আমার ধর্মকে আমি ভালবাসতাম। আমি জানতাম, আমার বাবার স্মৃতির উপাসনা করলে তিনি সন্তুষ্ট হবেন।

একদিন সকাল বেলায় আমার কুমার মামা আসলেন আমাকে বড় হলুদ গাড়ী করে দূর্গামন্দিরে নিয়ে যাবার জন্য। এই রকম গাড়ী আমাদের দ্বীপে আর কারও ছিল না। তখন আমার মনে যদিও উত্তেজনাপূর্ণ আগ্রহ ছিল, তবুও একটা দুঃখবোধও ছিল। আমার প্রিয় বন্ধু গোঁসাইকে ছেড়ে যেতে হবে। গোঁসাই যেন দিনে দিনে আরও বুড়ো হয়ে যাচ্ছেন। গেট পেরিয়ে পরিচিত পথ বেয়ে সরু গলিটা পার হতেই দেখলাম গোঁসাই রোদে বসে আস্তে আস্তে তাঁর সকাল বেলাকার মন্ত্র বলছেন। আমি তাঁর দিকে এগিয়ে যেতেই তিনি তাঁর উপাসনা বন্ধ করলেন।

আমরা পরস্পরকে অভিবাদন করলাম। তিনি বললেন, "তাহলে তুমি আজকেই যাচ্ছ। আজ সকালে উঠতেই তোমার কথা মনে করলাম, তারপর মনে পড়ল তোমার ঠাকুরদার কথা। এটা খুব ভাল লক্ষণ। শেষের দিনগুলোতে তিনি যে এত মদ খেতেন সেকথা তুমি মনে রেখো না; মনে রেখো তিনি একজন বড় পণ্ডিত ছিলেন। আমি এর আগে তাঁর কথা অনেক দিন চিন্তা করি নি, কিন্তু আজ মনে পড়ল। এটা খুব ভাল লক্ষণ।"

আশাভরা কন্ঠে আমি বললাম, "আজ যদি তিনি বেঁচে থাকতেন! লোকে বলে তিনি একজন উচুঁদরের ভারতীয় ছিলেন।" তাঁকে আমার খুব ভালই মনে আছে— লম্বা, ফরশা, বাদামী চোখ, দেখতে প্রায় বিদেশীর মতই, কিন্তু একজন খাঁটি ব্রাহ্মণ ছিলেন।

গোঁসাই গম্ভীর ভাবে বললেন, "মানুষটির পাওনা-সম্মান তাঁকে দিতেই হবে।" যেভাবে কথাটা তিনি বললেন তাতে মনে হল যেন

তিনি বিচারক হিসাবে সব সাক্ষ্য- প্রমাণ ভাল করে দেখছেন। গোঁসাই আরও বললেন, "ভারত থেকে তাকে বেরিয়ে আসতে হয় নি এবং এখানে তাঁর আসবার প্রায়োজনও ছিলনা... তবে এখানে যখন কোন পণ্ডিত ছিল না তখন তিনি এসেছিলেন। সেই সময়ের কথা আমার বেশ মনে আছে। কি ভাল সময়ই না ছিল! তাঁর আসাটা খুবই ভাল হয়েছিল। তিনি আসাতে আমাদের, অর্থাৎ ভারতীয়দের খুব সাহায্য হয়েছিল। ভারতীয়েরা তাঁকে কাজে লাগিয়েছিল। তিনি আমার সময়কার লোকদেরও উপকার করেছিলেন। তাতে তিনি যে "গুরুদক্ষিণা" পেতেন তা ব্যবহার করতেন।" কথাগুলো তিনি একটু দুষ্টামিভরা চোখ টিপে বললেন।

"আপনি তখন থেকেই তাঁকে জানতেন?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম। উত্তরটা অবশ্য আমার জানাই ছিল তবুও জিজ্ঞাসা না করাটা অভদ্রতা হত।

"আমি তাঁকে জানতাম কিনা? তুমি বুড়ো গোঁসাইকে এই কথা জিজ্ঞাসা করছ? লোকেরা তাঁকে নানা রকম জিনিষ মণকে মণ দিত। তাঁর কাছে ঘি, মাখন, চাল, ময়দার স্তুপ হয়ে যেত। তিনি অনেক ধূতিও পেতেন। তবুও আমি নিশ্চয় করে জানি যে, তাঁর অবস্থা ভারতে আরও ভাল ছিল।"

এর পর তিনি স্বর নীচু করে গোপন কথা বলবার জন্য আমার দিকে ঝুঁকে চুপি চুপি বললেন, "আমরা দু'জন ছিলাম সত্যিকারের বন্ধু। তিনি ধনী ছিলেন; অবশ্য শেষের দিকে মদ খেয়ে প্রায় সব কিছু শেষ করে দিয়েছিলেন। আমার কোনকালে কোন কিছুই ছিল না। আমি গরীব ছিলাম। ওটা আমার কর্মফল। কিন্তু তবুও তিনি আমার ভাল বন্ধু ছিলেন। তিনি যেমন ভাল হিন্দু ছিলেন, তেমনি ছিলেন ভাল পণ্ডিত। তিনি যথেষ্ট সময় নিয়ে পূজা করতেন, কখনও সময় সংক্ষেপ করতেন না। কিন্তু এটাই, রহস্যজনক ছিল যে, কেন তিনি এত অসুখী ছিলেন, কেন এত মদ খেতেন। দেখ, আজকেই আমি তাঁর কথা ভাবছি, হঠাৎ তাঁর কথা আমার মনে আসল। খুব ভাল লক্ষণ।" এই

বলে তিনি আমার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন, "দূর্গা মন্দিরে যাবার এটাই ভাল সময়। তুমি একজন বড় পণ্ডিত হবে, বড় যোগী হবে। ভাই, আমি তোমাকে বলছি, তুমি সত্যিই তোমার বাবার উপযুক্ত সন্তান।"

গাড়ীটা বড় রাস্তায় যাবার জন্য যাত্রা শুরু করতেই আমি গাড়ী থেকে হাত নেড়ে সবাইকে বিদায় জানালাম। আমার চোখ তখন জলে ভরে উঠেছিল। দিদিমাকে সামনের জানলার কাছে বয়ে আনা হয়েছিল। তিনিও হাত নেড়ে আমাকে বিদায় জানাচ্ছিলেন। আমার মামা ও মাসীমার ছেলেমেয়েরা নীচে দোকানের সামনে লাফালাফি করে চেঁচিয়ে আমাকে বিদায় জানাচ্ছিল। তাদের সবাইকে ছেড়ে যাওয়া আমার পক্ষে সহজ না হলেও আমি জানতাম আমার সিদ্ধান্ত নেওয়াটা ঠিক হয়েছে। আমি ভাবছিলাম, আমার বাবা যদি এই সময় বেঁচে থাকতেন! নিশ্চয়ই তিনি খুশী হতেন। রেবতী মাসীমাকে বলা হয়েছিল যেন তিনি আমার মাকে খবরটা দেন। আমার বেশ ভালই লাগছিল। বাবার পদানুসরণ করাতে বেশ অহংকার বোধ হচ্ছিল। কানের মধ্যে গোঁসাইয়ের কথাগুলো বাজছিল এবং ভেতরে একটা উত্তেজনা বোধ করছিলাম। আমার কর্ম ভাল, আর ভাগ্য আমাকে ডাক দিচ্ছে।

৫
পণ্ডিতজী

দূর্গা মন্দিরটা দেবী লক্ষ্মীর স্বামী বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়েছিল। এক পলকে মন্দিরটা দেখলে মনে হয় ত্রিনিদাদের অন্যান্য ছোটি মন্দিরের মতই। চুনকাম করা দেয়াল, ময়লা মাটির মেঝে এবং টিনের ছাদ আড়ম্বরের দিক থেকে বড় বড় শহরের মন্দিরগুলোর কাছে কিছুই না। যদিও তার ছোটি উঠানে অনেক পতাকা ও দেবমূর্তি ছিল তবুও তার উঁচু দেয়াল ছিল না; উঁচু ও কারুকার্য করা ফটকও ছিল না যেমন ছিল ভারতের পুরানো দালানগুলোর। হিন্দু মনে বাইরের কারুকাজের যথেষ্ট দাম ছিল। তবে ভিতরের পবিত্র স্থানটা ছিল মন্দিরের আসল জায়গা, মানুষের অন্তরের ছবি, যেখানে মূর্তির মধ্যে দেবতা বাস করেন। ছোটি উঠানের প্রধান দরজার সামনে বিষ্ণুর বড় একটা মূর্তি যেন মন্দিরটা পাহারা দিচ্ছিল। দরজার মধ্যে দিয়ে সর্বসাধারণের জন্য নির্দিষ্ট জায়গা থেকে দূরে লোকে সেই পবিত্র স্থানটা দেখতে পেত। জায়গাটা লোহার বেড়া দিয়ে ঘেরা ছিল।

আমি উঠানে পৌছে দেখলাম একজন ব্যবসায়ী তার জুতা বাইরের দরজার কাছে খুলে রেখেছে। আর সংগের ছোটি বাক্সটা নিজের পাশে রেখে উপাসনার উদ্দেশ্যে বিরাট শিবলিংগের সামনে উবুড় হয়ে পড়ে আছে। উপাসনাকারীদের মধ্যে কয়েকজন উঠানের নীচু দেয়ালের মধ্যে একটা পবিত্র স্থানের মধ্যে কতগুলো দেবমূর্তির চারপাশে দ্রুতবেগে ঘুরছে। এইভাবে দেবতার অনুগ্রহ লাভের চেষ্টা করছে।

দূর্গা মন্দিরের এইরকম চেহারা সত্বেও দ্বীপের শ্রেষ্ঠ মন্দির হিসাবে তার সুখ্যাতি ছিল, কারণ সেখানকার প্রধান পুরোহিত ছিলেন একজন বুদ্ধিমান, মহা সম্মানিত যুবক ব্রাহ্মণ, যিনি হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ শিক্ষালাভ করেছিলেন। তাঁর বয়স তখন ৩৫ বছরের মধ্যে, চেহারা খুব সুন্দর, দেহের গঠন খেলোয়াড়ের মত এবং তাঁর ব্যক্তিত্ব মানুষকে চুম্বকের মত আকর্ষণ করত। এই যুবক স্বামীজী সমস্ত ব্রাহ্মণের আদর্শ স্থানীয় ছিলেন। তিনি ব্রহ্মচারী ছিলেন এবং চিরকুমার থাকার শপথ নিয়েছিলেন। এইরকম একজন উপযুক্ত হিন্দুর কাছে পড়াশোনা করতে পারটাকে আমি একটা বিশেষ সৌভাগ্য বলে মনে করতাম। মনে হত তিনিও আমাকে পেয়ে খুব খুশী হয়েছেন। অন্য আর একজন যুবকের সংগে আমি একই কামরায় থাকতাম। তার বয়স ছিল বিশের কাছাকাছি। ঘরের দেয়াল ও মেঝেতে কোন কিছুই ছিল না এবং দরজায় কপাট ছিল না বলে কোন গোপনীয়তাই ছিল না। আমাদের দু'জনের একটা করে তক্তার তৈরী পুরোনো, সরু ও নীচু খাট ছিল। আমার সংগী বয়সের তুলনায় যদিও খুব ধার্মিক ছিল তবুও ব্রাহ্মণ ছিল না বলে আমি যে শিক্ষা পেতাম তা সে পেত না।

খুব ভোরেই আমাদের দিন আরম্ভ হয়ে যেত। রাতের শেষ ভাগে মন্দিরের দেবতা বিষ্ণুকে জাগাবার জন্য শুভ লক্ষণযুক্ত বাতির অনুষ্ঠান হত। প্রতিমাকে স্নান করাবার পর তার পূজা করে সকাল সাড়ে পাঁচটায় বেদের বাক্য শুনবার জন্য সবাই একত্র হতাম। হিন্দিতে জোরে জোরে বেদ পড়া হত। তারপর আমরা ২/৩ ঘন্টা ধরে ধ্যান করতাম। প্রথম মন্ত্র, যা আমাকে দেওয়া হয়েছিল সেটা হল 'হরি ওঁ তৎ সৎ'। ব্রহ্মচারী সবসময় তাঁর ধ্যান শুরু করতেন মাত্র একটা শব্দ, 'ওঁ' দিয়ে। সবচেয়ে চড়া স্বরের কম্পন দিয়ে সেটা উচ্চারণ করা খুব কঠিন ছিল। অন্য সব মন্ত্রের মতই 'ওঁ' শব্দটি শিক্ষা করার জন্য গুরুর প্রয়োজন। বেদে লেখা আছে—

পদ্মের উপরে... ব্রহ্মা চিন্তা করতে লাগলেন, "কোন্ শব্দটি দিয়ে আমি সমস্ত বাসনা, সমস্ত জগৎ ...দেব-দেবতা...বেদ...পুরস্কার

উপভোগ করতে পারব?" তিনি এই 'ওঁ' শব্দটি দেখলেন...। সর্বস্থানে ব্যাপ্ত ও সর্বত্র বিদ্যমান... ব্রাহ্মণের নিজস্ব প্রতীকরূপ অক্ষর... এর মধ্য দিয়ে তিনি সমস্ত জগতের কামনা-বাসনা, সমস্ত দেব-দেবতা, সমস্ত বেদ... সমস্ত পুরস্কার, সমস্ত অস্তিত্ব উপভোগ করলেন...কাজেই কোন ব্রাহ্মণ যখন কোন কিছু কামনা করে তিন রাত উপবাস করে, পূর্ব দিকে মুখ করে পবিত্র ঘাসের উপর বসে এই অক্ষয় "ওঁ" শব্দটি বার বার বলে তখন তার সব কিছুই পাওয়া হয়ে যায় এবং সব কাজেই সফলতা আসে।

চিরন্তন স্বর্গসুখ ভোগ করার নিশ্চিত উপায় হিসাবে আমাদের প্রাত্যহিক ধ্যান ছিল সবচেয়ে প্রয়োজনীয়। এই ধ্যান ছিল যোগ সাধনার কেন্দ্র এবং এর পরামর্শ দিয়েছেন শ্রীকৃষ্ণ। আবার এটি বিপদজনকও ছিল। অক্লান্ত ধ্যানের ফলে ভীতিজনক আত্মার অনুভূতি হতে পারে যেমন মাদক দ্রব্য ব্যবহার করার ফলে হয়। বেদে যে সব দানবদের বর্ণনা রয়েছে অনেক সময় সেগুলো যোগীদের মধ্যে প্রবেশ করে। কুণ্ডলিনী শক্তি মেরুদণ্ডের নীচে সাপের মত কুণ্ডলী পাকায় এবং গভীর ধ্যানের মধ্যে কুণ্ডলী ছেড়ে অত্যন্ত সুখানুভূতি জাগায়, আবার যদি এই শক্তিকে উপযুক্তভাবে দমন করা না হয় তবে মানসিক, এমন কি, শারীরিক ক্ষতিও হতে পারে। সুখানুভূতি ও ভীতির মধ্যে একটা সূক্ষ্ম সীমারেখা আছে। সেইজন্য আমরা যারা দীক্ষা গ্রহণ করছিলাম আমাদের খুব মনোযোগের সংগে তত্ত্বাবধান করতেন ব্রহ্মচারী ও তাঁর সাহায্যকারী।

প্রাত্যহিক ধ্যানের মধ্যে আমি অসাধারণ রং দেখতাম, অপার্থিব বাজনা শুনতাম এবং নানা গ্রহে ঘুরে বেড়াতাম, যেখানে দেব-দেবতারা আমার সংগে কথা বলতেন এবং আরও উচ্চতর চেতনা লাভ করতে উৎসাহ দিতেন। মাঝে মাঝে সম্মোহিত অবস্থায় আমি ভয়ংকর ভয়ংকর দানবের সংগে শত্রুর মত মুখোমুখি হতাম। এই সব দানবদের মূর্তি আমি হিন্দু, বৌদ্ধ, শিন্টো ধর্মমন্দিরগুলোতে ছবির মধ্যে দেখেছি। এসব ভীষণ ভীতিজনক অভিজ্ঞতা: কিন্তু ব্রহ্মচারী

এগুলোকে স্বাভাবিক বলে ব্যাখ্যা করতেন এবং আত্মোপলব্ধির চেষ্টা করতে বলতেন। মাঝে মাঝে আমি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সংগে এক অদ্ভুত একত্ব বোধ করতাম। তখন আমি নিজেকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, সকলের প্রভু, সর্বশক্তিমান, সর্বত্র বিদ্যমান মনে করতাম। আমার শিক্ষাদাতারা এতে খুব উত্তেজনা বোধ করতেন। এটা সুস্পষ্ট যে, আমি একজন মনোনীত পাত্র, ব্রহ্মের সংগে মিলনের চেষ্টায় অল্পতেই সফলতা লাভের জন্য ভাগ্য কর্তৃক নির্ধারিত। যে শক্তি আমার বাবাকে পরিচালিত করেছে তা এখন আমাকেও পরিচালিত করছে।

আমি আগে থেকেই অল্প খেতাম, এখন মন্দিরে তিন মাস থাকাকালে আত্মত্যাগের শিক্ষায় আরও কম খেতে শিখলাম। আমি দিনে মাত্র একবারই খেতাম। মন্দিরের একটা ধনী হিন্দু পরিবারের বাড়ীতে আমি খেতাম এদের দুধ সরবাহের দোকান ছিল। দুপুর বেলা একজন ব্রাহ্মণকে খাওয়াতে পেরে তারা খুব খুশী ছিল। একজন ব্রাহ্মণকে খাওয়ানো মানেই একটা ভাল কর্ম। এর পরিবর্তে আমি যে একপাল গরুর উপাসনা করতে পারতাম সেজন্য আমি সন্তুষ্ট ছিলাম।

আমি খুব আশ্চর্য হয়ে আবিষ্কার করলাম যে, যারা আত্মত্যাগের অভ্যাস করছে তারা কতগুলো ক্ষেত্রে একই সময়ে অন্যান্য উপায়ে জীবনটাকে উপভোগ করছে। তিরিশ বছর বয়সের একজন যুবক সাধু হবার শিক্ষা করার সময় নিজের চেহারার দিকে বেশী দৃষ্টি দিত। তার লম্বা কালো চুল অনেকক্ষণ ধরে আঁচড়াত এবং কাপড়-চোপড় ঠিক-ঠাক করত। তার চেহারার একটা দিকে সে লক্ষ্য রাখত না সেটা হল তার ভুঁড়ি। এত বেশী খেত যে, সেটা ক্রমশঃ বেড়ে চলেছিল। আমি জেনে খুব দুঃখিত হয়েছিলাম যে, কতগুলো মেয়ের সংগে তার সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। এরা প্রায়ই মন্দিরে আসা-যাওয়া করত।

একদিন আমাকে সে জিজ্ঞাসা করল, "এই শোন, শ্যামাকে তোমার কেমন লাগে? বেশ সুন্দরী না?" শ্যামার বয়স ছিল বারো, চেহারাটা সুন্দর এবং চুল লম্বা, কালো ও কোঁকড়ানো। সে ছিল অনেকগুলো মেয়ের মধ্যে একজন যারা মন্দিরের চারপাশে ঘোরাঘুরি

করত কিন্তু খুব অল্প সময়ই উপাসনা করত। যুবকটি বলল, "জান, শ্যামা তোমাকে ভালবাসে। সে তোমার জন্যে পিঠা তৈরী করে এনেছে, এই নাও।"

আমি বুঝতে পারলাম যে, রাগে আমার মুখ লাল হয়ে উঠেছে। আমি ঘৃণাভরে কড়া জবাব দিলাম, "আমি তাকে ভালবাসি না, ওদের কাউকেই না।"

সে এতে বিচলিত হল না বরং চোখ টিপে ধূর্তামির হাসি হেসে বলল, "তাকে একা পাবার জন্যে ভাল ভাল জায়গা আছে— কেউ জানতেও পারবে না।"

আমি এবার রাগে জ্বলে উঠলাম,"থামুন, আমি ঐ সব কথা শুনতেও চাই না।"

"আমাকে বোকা বানায়ো না। তুমি যে মেয়েদের দিকে তাকাও আমি তা দেখি নি মনে করছ?"

"কথাটা সত্যি নয়। আমি কখনও বিয়ে করব না। আমি ব্রহ্মচারীর মত হব।"

সে তার মাথা পিছন দিকে হেলিয়ে হো হো করে হেসে উঠে বলল, "তুমি মনে করছ সে একজন ব্রহ্মচারী? এখন আমি তোমাকে যা বলি শোন—" এমন সময় কারও পায়ের শব্দ শোনা গেল আর তার মুখও বন্ধ হয়ে গেল। রাগ দমন করে আমি ঘর থেকে দৌড়ে বের হয়ে দরজার কাছে ব্রহ্মচারীর মুখোমুখি হলাম। আমি খুব লজ্জা পেলাম এই ভেবে যে, তিনি হয়তো ভাবছেন তাঁর বিষয় গুজবের কথা আমি শুনছিলাম; কিন্তু বাইরে থেকে মনে হল তিনি কিছুই শোনেন নি।

"মনে হচ্ছে তুমি যেন তাড়াতাড়ি কোথাও যাচ্ছ," তিনি এ কথা বলে হেসে নিজের ঘরের দিকে চলে গেলেন।

এর কয়েকদিন পরে বাতি জ্বালানো অনুষ্ঠানের পরে আমি শোবার ঘরের মধ্যে আস্তে আস্তে পায়চারি করছিলাম। (তখন দেবতাকে রাতের জন্য বিশ্রাম করতে দেওয়া হয়ে গেছে)। এমন

সময় শুনলাম কেউ একজন তার ঘরের মধ্যে কাঁদছে। কৌতূহলী হয়ে আমি তার দরজার বাইরে থামলাম। সেখানে ব্রহ্মচারীর গলা শুনে আমি যেন জমে বরফ হয়ে গেলাম। চাপা রাগে তিনি হিস্ হিস্ শব্দে বলছেন, "তুমিই বাইরে আমার বিষয় বলাবলি করছ। অস্বীকার করার চেষ্টা কোরো না।" তারপর গলাটা নরম করে বললেন, "প্রত্যেক মন্দিরে সব সময় মেয়েরা আসবেই। অন্যান্যদের মত তাদেরও এখানে আসার অধিকার আছে। আর আমার খুশীমত তাদের কারো সংগে সময় কাটাবার অধিকার আছে। যদি তোমার মুখ থেকে আর কোন গল্প শুনতে পাই তবে তোমাকে এখান থেকে বের করে দেওয়া হবে।"

কি গল্প বলা হয়েছে সে সম্বন্ধে আমার কোন ধারণাই ছিল না। ও সব যে মিথ্যা কথা তাতে কোন সন্দেহই নেই। স্বামীজীর প্রতি আমার যেমন সহানুভূতি ছিল তেমনি ছিল আনুগত্য। তাঁর পবিত্রতা সম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহ ছিল না। অন্যান্য মন্দিরে যেমন আসে তেমনি এখানেও যে মেয়েরা আসবে তাতে অস্বাভাবিকতা কিছু নেই। এর পর থেকে আমি লক্ষ্য করতে লাগলাম হালকা পাত্‌লা গড়নের একটা মেয়ে, বয়েস তিরিশের নীচে ব্রহ্মচারীকে ভালবাসে। নাম তার হয়তো পার্বতী। অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমাকে মেনে নিতে হল যে, তিনি প্রেমিকের মতই তার সংগে কোমল ব্যবহার করেন। কেউ তাদের লক্ষ্য করলে তিনি সাবধানতা অবলম্বন করেন। আমার কাছে আশ্চর্য লাগল যে, আমি এতদিন এ সব লক্ষ্যই করি নি। অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে পার্বতী। সে একা অনেক সময় স্বামীজীর ঘরে কাটাত। লোকে জানত যে, সে তাঁর ঘরে তাঁর জন্য খাবার-দাবার ঠিক করে। প্রতিদিন সে তাঁর জন্য খাবার নিয়ে আসত, কিন্তু সেজন্য অতক্ষণ তাঁর ঘরে থাকার কোন প্রয়োজন ছিল না। আমার অল্পবয়েসী মন পুরোপুরি সব কিছু বুঝতে না পারলেও একটু বুঝত, যে লোক বিয়ে না করার শপথ নিয়েছে তার পক্ষে এরকম করা ঠিক নয়। এই বুদ্ধিমান যুবক ব্রাহ্মণকে আমি পছন্দ করেছিলাম কিন্তু এখন আমি মোহমুক্ত ও বিরক্ত হয়েছি।

যারা প্রতিদিন সেখানে পূজা করতে আসত একদিন এই ব্যাপারে

তাদের কথাবার্তা আমি শুনে ফেললাম। তারা উঠানের মাটিতেই কাছাকাছি বসে হিন্দিতে কথা বলছিল। প্রায় চল্লিশ বছর বয়স্ক একজন লোক বলল, "এটা ব্যক্তিগত ব্যাপার— আমরা এতে নাক না গলালেই ভাল।"

একজন বয়স্ক লোক, যার চুল সাদা হয়ে গেছে এবং লম্বা দাড়ি আছে তিনি গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বললেন, "এটা অবশ্যই তাঁর কর্ম। তাঁদের পূর্বজন্মের এমন কোন কিছু আছে যা একসংগে করতে হবে।" লোকটিকে আমি প্রায়ই মন্দিরে দেখতাম। তার কথা শুনে সবাই যখন সম্মতিসূচক মাথা নাড়ল তখন আমার বেশ ভাল লাগল।

কাজ ও পড়াশোনার চাপ আমার এত বেশী ছিল যে, ব্রহ্মচারীর ত্রুটির বিষয় চিন্তা করার সময় ছিল না। ভাবতাম, কর্মই শেষে সব কিছু ঠিক করে দেবে। এ বিষয়ে আমার মনে কোন সন্দেহ ছিল না। প্রতিবেশীর যে কুকুরটাকে বেশ কয়েক বছর ধরে দেখেছি সেটাও আমার কাছে কর্ম ও পুনর্জন্মের জীবন্ত প্রমাণ বলে মনে হত। আদর করে তার নাম দেওয়া হয়েছিল যোগী। সেই রোগা, কালো কুকুরটার মুখের নীচে সাদা দাড়ির মত লোম ছিল। যোগী কখনও হাড় বা মাংস খেত না, এমন কি ডিমও না। সে কেবল শাক-সব্জী খেত। তার মনিব ছিলেন একজন মুসলমান কিন্তু পরিষ্কারভাবে দেখা যেত সে হিন্দু ভাবাপন্ন সমস্ত বড় বড় ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সে বিশ্বস্তভাবে যোগ দিত। আগের জন্মে সে হয়তো খুব কষ্ট ভোগ করেছে তাই এখন নিশ্চয়ই সে ভাল কর্ম সঞ্চয় করছে। সে প্রায়ই জোরে জোরে ডাকত ও অন্যান্য কুকুরদের সংগে ঝগড়া করত, তাতে আমি নিশ্চিত হয়েছিলাম যে, সে আগের জন্মে যোগী ছিল এবং খারাপ কর্মের দরুন তার পতন হয়েছে। আমি একজন পণ্ডিতকে জানতাম যাঁর আচরণ ছিল যোগীর মত অথচ তিনি যোগী ছিলেন না। আমার খুব রাগ হত যখন আমি কোন হিন্দুকে কুকুরের উপর অত্যাচার করতে দেখতাম। যারা পুনর্জন্মে বিশ্বাস করে তারা কেমন করে জীব-জানোয়ারের প্রতি মানুষের মত ব্যবহার না করে পারে? আমি দেখতে

পেলাম যোগী, অর্থাৎ সেই কুকুরটা অনুষ্ঠানের পর যে খাবার দেওয়া হয় তা খেতে আসে। তাতে পুনর্জন্মের উপর আমার বিশ্বাস দৃঢ় হল। আমি জানতাম এমন অনেক পণ্ডিত আছেন যাঁরা এই সব খাবার খেতে ভালবাসেন এবং অনেকের এই সব ধর্মীয় অনুষ্ঠানের চেয়ে খাবারের প্রতি বেশী লোভ থাকে।

গ্রীষ্মের শেষে আমি বাড়ী ফিরে এসে দেখলাম মন্দিরে শিক্ষা লাভের ফলে ধার্মিক হিন্দুদের কাছে আমি অনেক উচ্চে স্থান পেয়েছি। শহরের রাস্তা দিয়ে স্কুলে যাবার সময় লোকে ভক্তিভরে আমার দিকে চেয়ে দেখত, আর চিৎকার করে বলত "সীতা-রাম পণ্ডিতজী।" তারা তাড়াতাড়ি আমার সামনে এসে নীচু হয়ে আমাকে নমস্কার করত। এসব আমার বেশ ভালই লাগত। বিশেষভাবে পণ্ডিতদের স্বীকৃতি আমাকে আরও তৃপ্ত করত।

স্কুলে যাবার সময় পণ্ডিত ভজনের বাড়ীর পাশ দিয়ে আমাকে যেতে হত। তিনি ছিলেন বেশ মোটাসোটা। তাঁর লম্বা কালো চুল পিছন দিকে গেরো দেওয়া থাকত। কোনোদিন দেখতাম তিনি প্রাত্যহিক পূজার জন্য তাঁর বাগানে ফুল তুলছেন না হয় কোন বাড়ীতে পূজা করতে যাচ্ছেন। আমাকে আসতে দেখে তিনি হাত জোড় করে নীচু হয়ে নমস্কার করে বলতেন, "পণ্ডিত মহারাজ, নমস্তে।"

ভিতরে ভিতরে আমি খুশী হতাম, কিন্তু বাইরে গম্ভীর ভাব বজায় রেখে উত্তর দিতাম, "নমস্তে পণ্ডিতজী।"

যদিও তখন আমার পুরোপুরি আত্মোপলব্ধি হয় নি তবুও ভগবদ্‌গীতায় মানুষের জন্য যে সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শের কথা লিখিত আছে সেই "জীবনমুক্তির" খুব কাছাকাছি আমি এসেছিলাম। মৌলিক অজ্ঞতা থেকে এই মুক্তিলাভ আমার দেহে অবস্থানকালেই আমাকে নিশ্চিত করবে যে, আমাকে আর জন্মলাভ করতে হবে না বরং আমার প্রকৃত "আমি" চিরকালের জন্য ব্রহ্মার সংগে পুনর্মিলিত হবে। আমার এখন বিশ্বাস জন্মালো যে, আমার বাবা সেই অবস্থায় পৌঁছেছিলেন আর আমিও ব্যক্তি হিসাবে আমার পৃথক অস্তিত্বের এই বিভ্রম থেকে একই

মুক্তি চাইছিলাম। আমি বুঝতে পারলাম, আমি এক এবং একমাত্র ব্রহ্ম, শুদ্ধ অস্তিত্ব-বোধের পরম সুখ; কাজেই এটাই আশা করা যায় যে, এই উন্নত আদর্শের যে পর্যন্ত আমি পৌঁছেছি তা বুঝতে পেরে নিশ্চয়ই অন্য লোকেরা আমার সামনে নত হবে এবং আমাকে পূজা করবে।

সত্যিসত্যিই আয়নার সামনে বসে আমি নিজেই নিজেকে পূজা করতাম। আর তা কেনই বা করব না? আমি তো ঈশ্বর। যারা যোগ অভ্যাস করে তাদের জন্য অতি মূল্যবান ও সুন্দর ভগবদ্‌গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ এই স্বর্গীয় জ্ঞানলাভের প্রতিজ্ঞা করেছেন। যারা ধ্যান করে তারা এই অমৃতই পান করে থাকে। ঈশ্বর হয়ে যাওয়াটা বড় কথা নয় বরং আমি সত্যিই কে এবং চিরকাল ধরে কে ছিলাম সেটা বুঝতে পারাই বড় কথা। রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমি অনুভব করতাম যে, আমি আসলেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রভু আর আমার প্রাণীরা আমার সামনে নত হচ্ছে।

যদিও এই পূজা আমার পক্ষে গ্রহণ করা সহজ ছিল না তবুও আমি আস্তে আস্তে শিখে ফেললাম আমার দেবত্বের সংগে আপোষ না করেও কেমন করে বিনম্রভাব দেখানো যায়। এর জন্য কেবল এটাই মনে রাখা প্রয়োজন যে, হিন্দুদের চারটি শ্রেণীর মধ্যে যাদের ধরা হয় না তারা ছাড়া আর সবাই একই উপাদানে তৈরী। আমার খুবই ইচ্ছা হত যেন শিক্ষিত হিন্দুদের কাছে আমি তাদের দেবত্বের মূলনীতি সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে পারি, তাদের অজ্ঞতার শিকল থেকে মুক্ত করতে পারি। আমাকে একজন গুরু হতে হবে, কারণ গুরু হলেন শিক্ষক আর গুরুর শিক্ষা ছাড়া কোন্ হিন্দু পুনর্জন্মের চক্র থেকে মুক্তি পেতে পারে না।

ত্রিনিদাদের লোকদের কাছে মহাপবিত্র স্বামী শিবানন্দ নামে একজন গুরু খুবই প্রিয়পাত্র ছিলেন। ভারত থেকে আমরা নিয়মিত ভাবে একটা পত্রিকায় তার খরবাখবর জানতে পারতাম। তাঁর মন্দিরে যে সব বড় বড় পূজা বা ঘটনা ঘটত সে সম্বন্ধে জানা যেত। এছাড়া সেখানে থাকত তাঁর সম্বন্ধে লেখা বইয়ের বিজ্ঞাপন। এইরকম একটা বইয়ের নাম ছিল 'আমার প্রভু শিবানন্দ'—তাঁর শিক্ষার ব্যাখ্যা এবং

তাঁর শিষ্যদের দেওয়া প্রশংসাপত্র। যাতে আমরা তাঁকে পূজা করতে পারি সেজন্য সেখানে ছিল তাঁর অনেকগুলো ছবি। আমাদের বেদীর উপরে একটা বিশেষ জায়গায় শিবানন্দের একটা বড় ছবি রাখা ছিল। প্রতিদিন সেই ছবির কপালে টটিকা চন্দন দেওয়া হত। আমাদের পরিবারের জন্য একটা আনন্দের খবর হত যখন মায়ের চিঠিতে আমরা জানতে পারতাম যে, তিনি শিবানন্দ আশ্রমে বেড়াতে গিয়েছিলেন। শিবানন্দকে দেখে তিনি খুব খুশী হয়েছিলেন এবং আমাদের জানিয়েছিলেন যে, তিনি একজন খুব পবিত্র লোক, আত্মোপলব্ধি প্রাপ্ত একজন গুরু। আমি তাঁর মত হব বলে স্থির করেছিলাম। ক্যান্সার হয়ে হঠাৎ তিনি মারা গেলেন। ঋষিদের যুগ থেকে যে সব গুরুরা স্বর্গে গেছেন তাঁদের একজনের মতই আমরা তাঁকে পূজা করতাম।

আমার ঈশ্বরভক্তির সুখ্যাতি বেড়ে যাচ্ছিল এবং লোকে আমাকে দেবতার মত ভক্তি করলেও আমার মধ্যে একটা ছোটি ছেলের মনোভাব ছিল। উপহার পাবার আশা এবং বড়দিনের সময়ে "ক্রীস্মাস ফাদারের" দেওয়া মোজাভর্তি উপহার বরাবরই আমাকে বেশ আনন্দ দিত। ত্রিদিদাদ ছিল একটা ব্রিটিশ উপনিবেশ; কাজেই কয়েক সপ্তা ধরে বড়দিনের বিভিন্ন গানে আকাশ-বাতাস যেন মুখরিত হয়ে উঠত। এই সব উৎসবে যোগ দেবার জন্য হিন্দু ও বৌদ্ধ ব্যবসায়ীদের মনে কোন সংশয় ছিল না। তাঁরা মনে করতেন এগুলো বাড়তি লাভ এবং এই রকম বিশেষ ব্যাপারে যোগ দেওয়াটা তাঁদের ধর্মে কোন অপরাধ জনক কিছু নয়। এমন কি, মুসলমানেরাও এই বার্ষিক উৎসবে যোগ দিতেন। বছরের সেই সময়টায় 'ক্রীসমাস ফাদার' হতেন সকলের অভিভাবকরূপ সাধু, সেই মুহূর্তের সবচেয়ে প্রিয় দেবতা।

বড়দিনের আগের রাতে ছোটি ছেলেমেয়েদের তাড়াতাড়ি ঘুমাতে যেতে হত আর বড়রা ব্যস্ত হয়ে পড়তেন ছুটির দিনটা কটানোর শেষ মুহূর্তের আয়োজনে। আবার অনেকে গ্লাসের পর গ্লাস মদ খেতেন। একটু বড় ছেলে মেয়েরা সেই সময় শিটি বাজিয়ে, ঢোল বা বড় কোন পাত্র বাজিয়ে, পট্‌কা বা বাজি ফুটিয়ে, তারাবাজি জ্বালিয়ে রাতটা

উপভোগ করত। এত গোলমাল হত যে, ছোট ছেলেমেয়েদের পক্ষে ঘুমানো একটা অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাঁড়াত; কিন্তু আমরা জানতাম যে, যতক্ষণ পর্যন্ত সকলের নড়াচড়া বন্ধ না হবে ততক্ষণ 'ক্রীসমাস ফাদার' তাঁর বল্গা হারিণে চড়ে আসবেন না এবং আমাদের উপহারও দেবেন না। একবার বড়দিনের রাতটা আমি জেগে কাটিয়ে 'ক্রীসমাস ফাদার' দেখবার আশা করেছিলাম। আমি এমনভাবে লুকিয়ে ছিলাম যাতে তিনি আমাকে দেখতে না পান।

মা ভারতে চলে যাবার পর আনন্দ নামে আমার এক মামাতো ভাই আমার সংগে বড় খাটে ঘুমাতো। সে আমাকে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কেন এমন করছ? আমি তখন দিদিমার কাঁচি দিয়ে বিছানার চাদর কেটে দু'টা ফুটো করছিলাম। গ্রীষ্মমণ্ডলীয় আবহাওয়ায় কম্বলের পরিবর্তে একটা চাদর গায়ে দেওয়াটাই যথেষ্ট ছিল, আর তা গায়ে দিতে হত কেবল মশার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য।

"চুপ" আমি তাকে বললাম, "চুপ, চুপ কর।"

আমি তখন চাদরের ফুটো আমার চোখের উপর ঠিক জায়গায় বসাচ্ছিলাম বলে নড়াচড়ার ফলে খটিটা নড়ছিল। তাই আনন্দ আমাকে বলল, "তুমি ঘুমাবে না?"

"চুপ, তোমার এখন ঘুমিয়ে থাকার কথা।"

"তোমারও তো!"

"তুমি যে আওয়াজ করছ, তাতে কেউ ঘুমাতে পারে না।"

"তুমিই তো আওয়াজ করছ। নড়াচড়া কোরো না।"

"চুপ্, চুপ্!"

একটু পরেই আনন্দের নাক ডাকার মৃদু শব্দ শোনা গেল। আমি জেগে থাকার চেষ্টা করতে লাগলাম; চেয়ে রইলাম সেই জানলার দিকে যেখান দিয়ে 'ক্রীসমাস ফাদার' বছরে একবার আমাদের ঘরে ঢোকেন। বড় দিনের সকাল বেলায় বিছানার পায়ের দিকে আমার মোজার মধ্যে সারা বছরের একটা আপেল ও নানা রকম সুস্বাদু বাদাম পেতাম। কিন্তু এইবার ক্রীসমাস ফাদারকে ওগুলো মোজায় ভরতে

দেখবই দেখব। সময় যেন কটিছেই না মনে হচ্ছে আর এক মিনিটও বুঝি জেগে থাকতে পারব না। এমন সময় কামরার মধ্যে আওয়াজ শুনতে পেলাম। সেই আওয়াজ কিন্তু জানলার দিক থেকে আসছে না, আসছে আমার পিছন দিক থেকে। আমি পিছন দিকে চাইছিলাম, কিন্তু নিজেকে দমন করে খুব সাবধানে আস্তে মাথাটা ঘুরালাম আর চোখের উপর ফুটোদুটা ঠিক মতই রাখলাম। আমি ঝাপ্‌সা ঝাপ্‌সা দেখলাম আমার কুমার মামা পা টিপে আমাদের বিছানার পায়ের দিকে গেলেন। তাঁর হাতে একটা বোঝা। হাতের বোঝা বিছানার উপর নামিয়ে বড় থলির মধ্যে থেকে আমাদের দু'জনের মোজার মধ্যে কিছু খেলনা একটা করে আপেল ও কিছু বাদাম ভরলেন। তারপর তিনি শেষ বারের মত বিছানার উপর পড়ে থাকা দেহ দুটো দেখলেন আর নিশ্চিত হলেন যে, তিনি যা করলেন তা কেউ দেখে নি।

আমার এই চমক লাগানো আবিষ্কারের কথা কউকে না বলে আমি যেন আর থাকতে পারছিলাম না; কিন্তু সকালবেলাকার খাওয়া-দাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমাকে অপেক্ষা করতে হল। তারপর আমার দুই বড় মামাতো ভাইবোন কৃষ্ণ ও শান্তিকে নাটকের ভংগীতে বললাম, "'ক্রীসমাস ফাদার' বলতে কেউ নেই।"

শান্তি অবিশ্বাসে চোখ বড় বড় করে বলল, "কি?"

আমি আবার বললাম, 'ক্রীসমাস ফাদার' বলতে কেউ নেই তবে কুমার মামাকে 'ক্রীসমাস ফাদার' বলতে পার।

কৃষ্ণ বড় ও জ্ঞানী হিসাবে ভারিক্কি গলায় বলল, "ঠাট্টা করবার আর জায়গা পাও না, না? তবে ঐ উপহারগুলো কোথা থেকে আসে?"

আমি বেশ কিছু জানি সেইভাবে বললাম, "না 'ক্রীসমাস ফাদার' ওগুলো মোটেই আনে না, আনেন কুমার মামা, তাঁকেই 'ক্রীসমাস ফাদার' বলতে পার।"

শান্তির মুখে-চোখে বিহ্বলতার ভাব ফুটে উঠল। সে প্রায় কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলল, "কেন তুমি আমাদের বোকা বানাচ্ছ?"

"কাল রাতে তাঁর উপর আমি চালাকী খাটিয়েছি। আমি তাঁকে নিজের চোখে দেখেছি।"

"কাকে দেখেছ?"

"আমি তোমাদের বলবার চেষ্টা করছি যে, কুমার মামাই মোজাগুলো ভরতি করেছেন।"

এই ভয়ংকর খবর খুব তাড়াতাড়িই আমাদের বাড়ীর ছেলে-মেয়েদের কানে পৌঁছে গেল, তারপর ছড়িয়ে গেল আমাদের পাড়ায়। শেষে আমি স্থির করলাম, এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। হিন্দুরা যে সব দেবতাদের পূজা করে খ্রীষ্টানদের দেবতারা তাদের মত সত্যি নয়, তারা কাল্পনিক। ধ্যানের মধ্যে এবং আত্মার আকারে হিন্দুদের দেবতাদের মাঝে মাঝে দেখা যায়। মনস্তত্ত্ববিদেরা এবং অন্যান্য বৈজ্ঞানিক গবেষকেরা যে এই বিষয় নিয়ে খুব যত্ন সহকারে সাক্ষ্য প্রমাণের ব্যবস্থা করেছেন সে বিষয়ে আমরা কিছুই জানতাম না। আমরা কেবল অভিজ্ঞতা দ্বারা যা জানা যায় তাই জানতাম আর তা আমাদের কাছে বাস্তব ছিল।

* * * * * *

"এ---- এ----রেব-----এ ---------দেখ্ ------ ঐখানে!"

আমি ঘুম থেকে বসে, চোখ কচ্‌লাতে লাগলাম এবং ভয়ে ভয়ে অন্ধকারেই দেখবার চেষ্টা করলাম। আমার শোবার ঘরের সামনে দিয়ে দৌড়ে যাবার শব্দ পেলাম, আর কতগুলো উত্তেজিত গলার স্বর শুনলাম। এদিকে দিদিমা হিন্দিতে চিৎকার করে রেবতী মাসীমাকে ডাকছিলেন।

সারা বাড়ীতে বাতি জ্বালানোর পর আমি বিছানা থেকে নেমে দিদিমার শোবার ঘরের দিকে দৌড়ে গেলাম। সেখানে সবাই উত্তেজিত হয়ে একসংগে চেঁচামেচি করে যা বলছিল তা বোঝা যাচ্ছিল

না।

দৌড়ে দিদিমার ঘরে ঢুকতেই শুনলাম দিদিমা ভয়ে চিৎকার করে হিন্দিতে বলছেন, "আমি এইমাত্র তোমাদের বাবাকে দেখলাম—— এইমাত্র দেখলাম।" বাড়ীর প্রায় সবাই দিদিমার বিছানার কাছে জড়ো হয়ে রুদ্ধশ্বাসে শুনছিল। কাঁপতে, কাঁপতে ফ্যাকাশে হয়ে গিয়ে জানলার দিকে আংগুল দেখিয়ে তিনি বললেন, "হ্যাঁ, তোমাদের বাবা; আমি ঠিক দেখেছি, উনি তোমাদের বাবা, কিন্তু তাঁর মাথা নেই! আমার কেমন যেন লাগছিল, আমি জেগে উঠলাম———আর উনি ঐখানে! চাঁদের আলোতে আমি তাঁকে স্পষ্ট দেখতে পেলাম।"

রেবতী মাসীমা জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি ঠিক দেখেছ? স্বপ্ন দেখছিলে না তো?"

"তিনি হিন্দিতে বললেন, 'নেহি জী!' আমি সম্পূর্ণভাবে জেগে ছিলাম। উনি আমার দিকে আসতে লাগলেন। কেমন করে যে, আমি এত জোরে চিৎকার করলাম তা আমি জানি না।"

* * * * * *

সেই দিনই সকালবেলা আমি গোঁসাইয়ের ঘরের সামনে যখন সেই বিষয় নিয়ে তাঁর সংগে কথা বলছিলাম তখন গোঁসাই চিন্তাযুক্ত হয়ে বললেন, "ওটা যে সত্যিই তোমার দাদুর আত্মা তা তুমি নিশ্চয় করে বলতে পার না। অনেক অনেক আত্মা চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে।"

"কিন্তু দিদিমা বললেন তিনি দাদুকেই দেখেছেন।"

গোঁসাই জোর দিয়ে বললেন, "তোমার দাদুকে দেখা অত সোজা নয়।" এই বলে তিনি বেশ কয়েকবার তাঁর খুত্‌নি চুলকিয়ে ট্যারা চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "এমন অনেক পণ্ডিত আছেন যাঁরা আত্মাদের কাজে লাগান। ঐ রকম একজন পণ্ডিতের বাড়ী তো ঐ রাস্তায়- নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ আমি কার কথা বলছি। তিনি যা করতে বলেন আত্মা তা-ই করে। অনেক সময় খারাপ করে আবার

অনেক সময় ভালও করে।"

"তাহলে আপনি বলতে চাইছেন পণ্ডিত হয়ে আমাকেও আত্মা ব্যবহার করতে হবে?"

গোঁসাই কাঁধ নাচিয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে বললেন, "আমি তো বলছি না সবাই তা ব্যবহার করে। কিছু পণ্ডিত আছেন যাঁরা মাথার খুলি ছাড়াই কাজ করেন।"

"কেমন করে পণ্ডিতেরা আত্মা পান আর কেমন করে সেই আত্মাদের দিয়ে কাজ করান?"

"ভাই একথা সবাই জানে যে, তাঁরা কবরস্থানে গিয়ে কবর খুঁড়ে কোন মানুষের মাথার খুলি তুলে আনেন। যে মানুষের মাথার খুলি তুলে আনা হয় তাকে দিয়েই সব কাজ করানো যায়।"

"তাহলে আপনি বলতে চাইছেন কেউ একজন দাদুর মাথার খুলি নিয়ে গেছে সেইজন্য দিদিমা যাকে দেখেছেন তার মাথা ছিল না? কিন্তু দাদুর কবরের জন্য তো পাহারাদার আছে।"

গোঁসাইয়ের চোখে -মুখে অস্বস্তি দেখা দিল। গোঁসাই আবার কাঁধ নাচিয়ে কষ্ট করে উঠে দাঁড়িয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে আকাশের দিকে তাকালেন। উপসাগরের উপরে মেঘ জমা হচ্ছিল। গোঁসাই বললেন, "মনে হয় এখনই বৃষ্টি নামবে।" তারপর এদিক থেকে ওদিকে মাথা নেড়ে একটা হতবুদ্ধি ভাব নিয়ে তাঁর ঘরে ঢুকবার জন্য প্রস্তুত হলেন। নীচু দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন, "আমি ওসব আত্মা নিয়ে নাড়াচড়া করি না। ওগুলো খুব খারাপ জিনিষ।"

আকাশ চিরে বিদ্যুৎ চমকে উঠল এবং ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নেমে এল আর আমি বাড়ীর দিকে দৌড় দিলাম। এত জোরে মেঘ ডাকছিল যে, ভয় লাগছিল। মনে হয় দেবতারা রেগে গেছেন।

৬

অল্প বয়সী গুরু

খোলা জানলা দিয়ে ঢাকের আওয়াজ আমাদের ক্লাশ-ঘরে ঢুকছিল এবং তাতে ছাত্ররা অস্থির হয়ে উঠছিল। এই সব বড় বড় ঢাকের আওয়াজ কয়েক মাইল দূর থেকেও শোনা যেত। সেদিন সন্ধ্যাবেলা মহাবীর গ্রামে রামলীলা উৎসব হবার কথা। সেজন্য ঢাকগুলো গরম করে সুর বাঁধা হচ্ছিল। আমাদের বাড়ী থেকে প্রায় এক মাইল দূরে ছিল আমাদের স্কুল। রামায়ণ মহাকাব্যের ঐতিহাসিক ঘটনাটি এক সপ্তা ধরে ব্যাখ্যা করা হত। একজন পণ্ডিত আমাকে বলেছিলেন যে, পূর্বজন্মে আমি ভারতের একটা গ্রামে বাস করতাম। আমি ভারতের সেই গ্রাম নিয়ে দিবাস্বপ্ন দেখছিলাম এবং গ্রামটা কল্পনা করার চেষ্টা করছিলাম। এমন সময় তালে তালে পড়া ঢাকের আওয়াজ আমার কল্পনাকে নতুনভাবে উদ্দীপিত করে তুলল। আমি নিজেকে ভাবতে লাগলাম রাম, তারপর সেই বানর-দেবতা হনুমান, দুষ্ট রাবণের সংগে যেন আমরা যুদ্ধ করছি। এর পরিবর্তে স্কুলটা খুব নিষ্প্রভ মনে হল। যিনি বিশ্বব্রাহ্মাণ্ডের প্রভু, ব্রহ্মা ও তাঁর উপাদানের সংগে এক হয়ে গেছি যে আমি, সেই আমাকে কেন ইংরাজী ব্যাকরণের একটা পাঠ নিয়ে হিমশিম খেতে হবে? শিক্ষক যা বলছিলেন তার একটা অক্ষরও আমি শুনি নি।

আমার বয়স তখন মাত্র ১১ বছর আর সেই বয়েস থেকে অনেক লোক আমাকে প্রণাম করত, টাকা পয়সা, কাপড়-চোপড় ও অন্যান্য দামী জিনিষ আমার পায়ে উপহার দিত এবং ধর্মীয় উৎসবে আমার

গলায় মালা দিত। আমি ভাবতে লাগলাম, স্কুলের পড়া ছেড়ে দিয়ে কি আমি আবার মন্দিরে ফিরে গিয়ে ধর্ম নিয়ে আরও গভীরভাবে পড়াশোনা করব? দিদিমা ও রেবতী মাসীমার এতে মত ছিল না, কিন্তু আমি খুব বেশী প্রলোভিত হতে লাগলাম; বিশেষ করে গরমকালে স্কুলের কামরায় যখন শ্বাস বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হত তখন আরও সেকথা ভাবতে লাগলাম। এ ছাড়া অনেক সময় ধরে আমি ধ্যান ও অন্যান্য ধর্মীয় কাজ করতাম যার ফলে পড়াশোনা করার জন্য আমার সময় ও শক্তি খুব কমই থাকত।

যখন ছুটীর ঘন্টা পড়ল তখন আনন্দের সংগে স্কুল থেকে আমি দৌড়ে বের হয়ে গেলাম। যারা আমাকে ভালবাসত তাদের কয়েকজনকে নিয়ে আমি দৌড়ে বাজারের মাঠে গেলাম এবং তামাশার জায়গায় সবার আগে পৌঁছাবার চেষ্টা করলাম। আমরা যতই এগিয়ে গেলাম ততই ঢাকের আওয়াজ জোরে শুনতে পেলাম।

দৌড়ে যাবার সময় রঞ্জিৎ আগ্রহের সংগে বলল, "রবি, আমি চাই তুমি আমার গুরু হবে।" তার বাবা ছিলেন জাতে আমার দাদুর মতই ক্ষত্রিয়।

তিনি আখ-ক্ষেতের তদারককারী ছিলেন। শোলার টুপী মাথায় দিয়ে তিনি গর্বভরে তত্ত্বাবধায়কের কাজ করতেন।

মোহন বলল, "আমারও", সে খুব ধর্মপরায়ণ ছিল। সন্ধ্যা-পূজার দলের সংগে আমি আন্তরিকভাবে যুক্ত ছিলাম এবং অল্পবয়েসী হিন্দু ছেলেদের ধর্মীয় কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দিতাম। মোহন নিয়মিত সেই দলে যোগ দিত। মোহনের বাবা জাতে ছিলেন বৈশ্য। তিনি বেশ ধনী ছিলেন। কাছের একটা চিনির কারখানা থেকে চিনি এনে তিনি পাইকারীভাবে বিক্রি করতেন। আমার বাবা তাঁর বিয়ের আগে সেই কারখানায় যন্ত্রবিদ্ হিসাবে কাজ করতেন।

রঞ্জিত আর মোহনের আগ্রহ দেখে আমি খুশী হলাম। দৌড়ের মধ্যে একটু দম নিয়ে বললাম, "দৌড়াতে দৌড়াতে এ বিষয়ে কথা বলতে পারছি না।" ইদানীং আমার বুকে বেশ ব্যথা করছিল এবং

সেটা যে আমার অতিরিক্ত সিগারেট খাওয়ার দরুন হচ্ছিল তা আমি জানতাম। হাঁপাতে হাঁপাতে আমি বললাম, "ওখানে পৌঁছে এ বিষয়ে কথা বলব।" আত্মিক সাহায্যের জন্য আমাদের শহরের অনেকে আমার কাছে আসত। একদিন তো আমি হাজার হাজার লোকের গুরু হব।

মহাবীর গ্রামের রাস্তাগুলো ছিল সরু এবং চাকার দাগে ভরা। রাস্তার দু'পাশে ছিল আখ ক্ষেতের মজুরদের মাটির ও কাঠের ছোট ছোট কুঁড়ে ঘর। সেগুলোর মধ্যে লোক জনের ঠাঁসাঠাঁসি। আমরা তাড়াতাড়ি করে সাজানো দোকান ঘরগুলো পার হয়ে গ্রামের মাঝখানের খোলা মাঠে উপস্থিত হলাম। এই মাঠেই প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা রামায়ণের কিছু অংশের নটিক হত। ভীড়ের জন্য লোকের ধাক্কাধাক্কি ও গোলমাল চলছিল, আর তার মধ্যে সরবৎ, মিষ্টি ও ঝাল-মশলাদার খাবারের বিক্রেতারা তাদের অস্থায়ী দোকান, ঠেলাগাড়ী ও সাইকেলের উপরে সাজানো দোকান থেকে চিৎকার করে ক্রেতাদের ডাকছিল। আবার অনেকে বড় বড় গামলা বা চ্যাপ্টা থালার উপরে বড়া, আমের চাটনী, ঝাল-চানা, ভাজা-চানা; জিলিপী ও অন্যান্য মিষ্টি সাজিয়ে মাটিতেই দোকান পেতেছিল। এখানে-ওখানে গণক ও হস্তরেখাবিদেরা ভীড়ের একপাশে বসে মাটির উপরে তাস অথবা হাতের ছবি পেতে রেখে লোকদের আকর্ষণ করার চেষ্টা করছিল।

খরচ করার জন্য আমার হাতে যথেষ্ট টাকা ছিল। আমার ভক্তেরা আমার পায়ের কাছে যে সব টাকা-পয়সা উপহার দিত, আমি সেগুলো একটা আলমারীতে রেখে তালা দিয়ে রাখতাম। হিন্দুদের মধ্যে অনেক পণ্ডিত খুব তাড়াতাড়ি ধনী হয়ে উঠতেন এবং বিনা কষ্টে কেমন করে টাকা-পয়সা জমাতেন তা আমি জানতে পেরেছি। পণ্ডিতদের আয়ের একটা বিরাট উৎস ছিল নীচু জাতের গরীবেরা। একজন পণ্ডিতকে আমি জানতাম যিনি সৌভাগ্য নিয়ে আসা পূজার বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তিনি লটারী, ঘোড়দৌড় বা জুয়া খেলায় কোন লোককে জিতিয়ে

দেবার জন্য পূজা করতেন এবং তাদের দেওয়া টাকায় ধনী হয়ে উঠেছিলেন। যে সব গরীব লোকেরা তাঁকে টাকা-পয়সা দিত তারা গরীবই রয়ে যেত আর তিনি ধনী হয়ে উঠতেন। তিনি যে সেই যাদুর শক্তিতে ধনী হয়েছেন তা নিজেকে দেখিয়ে প্রমাণ করতেন।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা আমি দর্শকদের একেবারে প্রথম সারিতে বসেছিলাম। পণ্ডিত এসে একটা লম্বা ফুঁ দিয়ে শাঁখ বাজালেন এবং তাঁর আশীর্বচন দিয়ে সেই নাটক শুরু করার ইংগীত দিলেন। সেই নাটকের দুই দিকের যুদ্ধযাত্রার সৈন্যদল হতেন উঁচু জাতের লোকেরা। তাঁরা খুব ঝলমলে পোষাক পরে আগেই মাঠের দু'পাশে এসে দাঁড়াতেন। তারপর জোরে জোরে ঢাক বেজে উঠতেই তাঁরা তালে তালে নেচে নেচে এক দল অন্য দলের দিকে এগিয়ে যেতেন। দুষ্ট রাবণ চুরি করে নিয়ে গেছে রামের স্ত্রী সীতাকে। একজন যুবক খুব দামী শাড়ী পরে সীতার অভিনয় করত, কারণ কোন স্ত্রীলোক তখন প্রকাশ্যে অভিনয় করত না। এই কাহিনীর আসল বীর হলেন বানরদের রাজা হনুমান। সীতাকে কোথায় বন্দিনী করে রাখা হয়েছে তা জানতে পেরেছেন হনুমান। রাম, তাঁর ভাইদের ও সাহায্যকারীদের নিয়ে হনুমান ও তাঁর বানর সৈন্যদলের সংগে যোগ দিয়ে রাবণ ও তাঁর দুষ্ট সংগীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে লাগলেন। সে কি জমকালো ও বিচিত্র দৃশ্য যখন তারা উৎসবের বড় ঢাকের বাজনা ও দর্শকদের তীব্র চিৎকারের সংগে সংগে একবার এগিয়ে ও আর একবার পিছিয়ে যুদ্ধের অভিনয় করতে লাগল। এই নাটকের প্রত্যেকটি মুহূর্ত আমার ভালো লাগছিল। আমি কত সহজেই ভুলে গেলাম যে, স্কুলে আমি নিজেকে একজন অল্পবয়েসী মহাত্মা গান্ধী ভেবে হিন্দু ও মুসলিম ছেলেদের মধ্যে শান্তি রক্ষার চেষ্টা করতাম। এরা পরস্পরকে গালাগালি দিত এবং ঘুঁসি মারামারি করত। হিন্দু ছেলেদের আমি প্রায়ই উপদেশ দিয়ে বলতাম, "অহিংসা পালন করা সমস্ত জাতিরই কর্তব্য।" ছেলেরা আমাকে তাদের আত্মিক নেতা হিসাবে মান্য করত। কিন্তু রামলীলা উৎসবের সময় আমি এবং অন্যান্য শত শত অহিংসার

পক্ষপাতী নিরামিষভোজীরা যুদ্ধক্ষেত্রে হনুমান ও রামের বীরোচিত কাজে উল্লাসিত হতাম এবং তাঁরা যত বেশী ভয়ংকর হতেন ততই আমরা খুশী হ'তাম।

এই মহাকাব্যের মধ্যে যে আধ্যাত্মিক সংবাদ আছে তা আমার মা আমাকে খুব যত্ন করে শিক্ষা দিয়েছিলেন। সেই শিক্ষা হল রাম হলেন ভালোর প্রতিনিধি এবং রাবণ মন্দের প্রতিনিধি। এই দু'য়ের মধ্যে যে যুদ্ধ তা হল প্রত্যেকটি মানুষের অন্তরে ভালো ও মন্দের যে যুদ্ধ চলে সেটাই। উৎসব মুখর আবহাওয়ায় এবং ঐ সব ঢাকের বাজনার যাদুতে কয়েক মুহূর্তের জন্য আমি সব কিছু ভুলে যেতাম, কিন্তু অনেক রাতে শান্তি, সান্দ্রা, আনন্দ ও অমরের সংগে ঘরে ফিরে এসে আমার অন্তরে ভালো-মন্দের যুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত হ'তাম। তখন আমি ভাবতাম সব কিছুই যখন সেই "একের" তখন কেন আমার অন্তরে এই ভালো-মন্দের সংঘাত? এতে আমি যেন ধাঁধায় পড়ে গেলাম। ব্রহ্মা হলেন একমাত্র সত্য, আর সবই মায়া বা বিভ্রম। তাহলে দেখা যাচ্ছে রাম অবতার যেমন ব্রহ্মা তেমনি দুষ্ট রাবণও ব্রহ্মা। আমিও তো ব্রহ্মা। যোগ সাধনার আবেশের মধ্যে থাকাকালে আমি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের প্রভু হই। তখন কোন সমস্যা, কোন অস্থিরতা এবং কোন অনিশ্চয়তা থাকে না। কিন্তু আমি যখন ধ্যান করছি না তখন এই আত্মজ্ঞান কোন্ কৌশলে ধরে রাখা যায়? হয়তো আমার বাবা যা করেছিলেন সেটাই হল একমাত্র উপায়— এই মায়ার জগৎ থেকে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সরিয়ে রাখা। কিন্তু তা হলে তো আমি গুরু হয়ে অন্যদের শিক্ষা দিতে পারব না।

রেবতী মাসীমার সবচেয়ে ছোট ছেলে অমর ছিল আমার ভাল ছাত্রদের মধ্যে একজন। তার বয়স তখন মাত্র পাঁচ। তাকে দেখলে আমার নিজের সেই বয়েসের কথা মনে পড়ত। হয়তো সেই জন্যই আমার তাকে এত ভাল লাগত। সে তখনই নিজে নিজে পূজা করত, প্রতিদিন সকালে সূর্যদেবতাকে জলোৎসর্গ করত এবং তার মধ্যে অসাধারণ ধর্মীয় আগ্রহের চিহ্ন দেখা যেত। আমি তাকে ধ্যান করার

শিক্ষা দিচ্ছিলাম এবং বিশেষ বিশেষ মন্ত্র শিখাচ্ছিলাম। এর বদলে সে আমাকে খুব ভক্তি-শ্রদ্ধা করত।

* * * * * *

আমি একদিন সকালবেলা স্কুলে যাবার আগে দিদিমার কাছে গিয়ে বসলাম। দিদিমা আমাকে বললেন, "রবি, তোমাকে আজকাল মোটেই সুস্থ দেখাচ্ছে না। তোমার স্বাস্থ্য সম্পর্কে আমি বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েছি। তুমি ফ্যাকাশে হয়ে গেছ আর আজকাল খুব কাশছ।"

আমি জোর দিয়ে বললাম, "আমার তো কিছু হয় নি দিদিমা; আমি ভালই আছি-" এ কথা বলতে বলতে আমি এমন কাশতে লাগলাম যে, প্রায় দুমড়ে গেলাম।

"রবি, তোমার মামা ইংল্যাণ্ডে যাবার আগে তোমাকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে যাবে।"

আমি কোন রকমে শ্বাস নিয়ে বললাম," আমার কিছু হয় নি, দিদিমা। আমি ভাল হয়ে যাব।" আমার বুকে তখন খুব ব্যথা করছিল, বিশেষ করে হৃদপিণ্ডের কাছে।

"বেশ কয়েক সপ্তা ধরে তুমি খুব কাশছ। প্রত্যেক রাতে আমি তোমার কাশির শব্দ শুনতে পাই।"

"দিদিমা, তুমি চিন্তা কর না, আমার কিছুই হয় নি। সবাই তো কাশে। তুমি কেমন আছ বল তো?" আমি লজ্জা পেয়ে বিষয়টা বদলাতে চাইলাম, ভাবলাম এইবার আসল কথাটা বেরিয়ে যাবে। আমি বেশ কয়েক মাস ধরে খুব সিগারেট খাচ্ছিলাম আর এটাও জানতাম যে, আমার দিদিমা, মাসীমারা, মামারা জানতে পারলে ভীষণ আপত্তি করবেন, কিন্তু তখন সেই অভ্যাস ত্যাগ করা আমার শক্তির বাইরে চলে গেছে। আমি প্রায়ই ভাবতাম আমার নিরামিষ খাওয়ার ব্যাপার সম্বন্ধে। যে ছুরি দিয়ে মাংস কাটা হত সেই ছুরি দিয়ে পনীর কাটা হলে আমি সেই দোকান থেকে তা কিনতাম না, অথচ আমি এই

ধূমপানের অভ্যাস ত্যাগ করতে পারছিলাম না, যদিও আমি জানতাম যে, এতে আমার ফুসফুসের ক্ষতি হচ্ছে। মাঠে গিয়ে আমি একটার পর একটা সিগারেট খেতাম এবং প্রত্যেকটি টানে সেই ধূমা গভীরভাবে ভিতরে নিতাম। আমি চাইতাম না যে, কেউ আমার এই গুপ্ত অভ্যাসের কথা জানতে পারুক; সেইজন্য সবচেয়ে খারাপ ব্যাপার হল আমার অনেক টাকা থাকলেও মাঝে মাঝে আমাকে সিগারেট চুরি করতে হত আর চুরির ব্যাপারটায় আমার বিবেকে আমি ভীষণ কষ্ট পেতাম। রাম-রাবণের যুদ্ধটা আসলে আমার অন্তরের মধ্যেই চলছিল এবং এর পরিণামের কাছে আমি নিজেকে অসহায় মনে করতাম। হনূমানের কাছে আমার কাতর প্রার্থনা সত্বেও রাবণ জয়লাভ করছিল।

সেদিন স্কুলে যাবার সময় এই প্রথমবার আমার ভেতরে আমি একটা শূন্যতা বোধ করছিলাম যখন লোকেরা নিয়ম মতই আমাকে "সীতা-রাম, পণ্ডিতজী" বলছিল। দিদিমার কাছে যখন মিথ্যা কথা বলছিলাম তখন অতটা খারাপ লাগছিল না। সেদিন সকালে আমার যে তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছিল সেটা নিয়েই আমি চিন্তা করছিলাম।

সেদিন সকালে আমার এক হাতে ছিল একটা ছোটি পিতলের ঘটি। তাতে ছিল শুচি হবার জন্য পবিত্র জল। আমি গরুর মাথার উপর একটা টাটকা ফুল দিয়ে প্রতিদিনের মতই গরুটাকে প্রণাম করছিলাম। এমন সময় সেই বিরাট কালো জন্তুটা মাথা নীচু করে আমাকে মারতে আসল। আমি পিছন দিকে লাফ দিয়ে তার শিংয়ের গুঁতা থেকে বাঁচলাম। তারপর ফিরে আমার ঘটি ও জপমালা মাটিতে ফেলে দিয়ে দৌড় দিলাম। আমার দেবতা আমাকে তাড়া করেছে। আমার ভাগ্য ভাল যে, আমি তখনও গরুর দড়ি খুলি নি। খাটো করে বাঁধা থাকাতে সে বেশীদূর এগিয়ে আসতে পারে নি এবং তার শিং দিয়ে আমাকে আঘাত করতে পারে নি। কাঁপতে কাঁপতে, হাঁপাতে হাঁপাতে আমি চ্যাপ্টা হয়ে যাওয়া ঘটি ও জপমালা আর গরুর পা আছড়ানো দেখছিলাম। তারপর মুখ তুলে দেখলাম গরুটা তার বড় বড় বাদামী চোখে আমার দিকে ভীষণ ঘৃণাভরে তাকিয়ে আছে। 'আমার দেবতা

আমাকে আক্রমণ করল আর আমি তাকে বছরের পর বছর ধরে প্রতিদিন বিশ্বস্তভাবে পূজা করছি!

এই ঘটনার দু'ঘন্টা পরে স্কুলে যাবার পথে আমি ভিতরে ভিতরে কাঁপছিলাম। কিন্তু আমার এই কাঁপা ভয়ে নয়, হতবুদ্ধি হয়ে যাওয়া দুঃখে। কেন এই দুঃখ? শিব, কালী ও অন্যান্য দেবতাদের আমি ভয় পেতাম কিন্তু গরু— যে দেবতাকে আমি সব সময়ই ভালবাসতাম। তাকে ঘাস খাওয়াতে নিয়ে যেতাম, তাকে যত্ন করতাম আর সেই কাজ করতে আমি খুব পছন্দ করতাম। গরু ও অন্যান্য জীব-জানোয়ারকে আমি দয়ার দৃষ্টিতে দেখতাম। তাহলে এই দেবতা আমাকে আক্রমণ করল কেন? এই একটা প্রশ্নই আমাকে ভাবিয়ে তুলতে লাগল। গোঁসাই পর্যন্ত আমার এই প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারলেন না।

৭

শিব ও আমি

দাদুর বয়সের তিরিশের কোঠার প্রথম দিকে বেশ টাকা-পয়সা খরচ করে আমাদের দ্বীপের সব চেয়ে ভালো ফটোগ্রাফারকে দিয়ে তিনি নিজের ছবি তোলাবার ব্যবস্থা করেছিলেন। দাদুকে সন্তুষ্ট করা খুব সহজ ছিল না; তার ফলে ছবির দাম তিনি সেইভাবেই দিয়েছিলেন। ফটোগ্রাফার শেষে দাদুকে একজন গোষ্ঠীপতির মত বসিয়েছিলেন। তাঁর চোখের দৃষ্টি ছিল তীক্ষ্ণ। খুব বড় ও দামী ফ্রেমে ছবিটা বাঁধিয়ে বসবার ঘরের একটা বিশেষ জায়গায় টাংগিয়ে দেওয়া হল। যে কোন দিক দিয়ে সেই ঘরে ঢুকলে, কিম্বা সেই ঘরের মধ্যে দিয়ে অন্য ঘরে যাবার সময় মনে হত যেন দাদু তার দিকে তাকিয়ে আছেন। আমরা যেখানেই যেতাম মনে হত ছবির মধ্যে থেকে দাদুর আত্মা যেন দেখছেন তাঁর যে বাড়ীটা তিনি অজানা জায়গা থেকে পাওয়া টাকা দিয়ে তৈরী করেছিলেন সেখানে কি হচ্ছে। সেই চোখ দু'টার দিকে তাকাতে আমার ভয় করত। মনে হত আমি যেখানেই যাই না কেন সেখানেই সেই চোখ আমাকে লক্ষ্য করছে।

একইভাবে দেবতা শিবকে আমি ভয় করতাম। কাজেই তাঁকে সন্তুষ্ট করবার জন্য বেশী করে তাঁর পূজা করতাম। কিন্তু দাদুর আত্মার যেন সন্তুষ্টি নেই। সেই আত্মা আমাদের ভয় দেখাতে থাকল। কোন সময় শুনতাম কেউ পাগলের মত দৌড়াচ্ছে কিম্বা থপ্ থপ্ করে হাঁটছে। আবার মাঝে মাঝে অনেকক্ষণ ধরে বিশ্রী গন্ধ পেতাম। আমাদের অবাক হয়ে যাওয়া চোখের সামনেই কখনও কখনও

আলমারী থেকে জিনিষপত্র ছুঁড়ে ফেলা হত কিম্বা টেবিলের উপরকার জিনিষপত্র ধাক্কা মেরে ফেলে দেওয়া হত।

শিবকে সন্তুষ্ট করার আমার এত চেষ্টা সত্বেও আমি বুঝতে পারতাম তিনি আমার উপর সন্তুষ্ট নন। অনেক মন্ত্র পড়ে, আচার-অনুষ্ঠান করে এবং তাঁর পূজা করেও এই বিনাশকারী, ভয়ংকর দেবতার সংগে আমার যে সম্বন্ধ তাতে কোন শান্তি আমি খুঁজে পাই নি। গভীর ধ্যানের মধ্যে আমি অন্য এক জগতে একা শিবের সংগলাভ করতাম, কিন্তু সবসময় তাঁর ব্যবহার ছিল ভয় প্রদর্শনের। একদিন আমি সুমিত্রা মাসীমার উঠানের মধ্যে দিয়ে দৌড়ে যাচ্ছিলাম এমন সময় একটা পেরেক আমার খালি পায়ে ঢুকে গেল। আমার পায়ের ঘা দূষিত হয়ে যাবার দরুন জ্বর হওয়াতে আমি বিছানায় শুয়ে ছিলাম। আমার ধারণা সুস্পষ্ট ছিল যে, শিব ঐ বড় পেরেকটা উঠানে রেখেছিলেন এবং আমার পা ওটার উপর নিয়ে গিয়েছিলেন। ওটা ফেলতে চাইলাম, কিন্তু আমার মামাতো ভাই কৃষ্ণকে যখন কথাটা বললাম তখন তার চোখে এমন একটা দৃষ্টি দেখলাম যাতে বোঝা যায় যে, সে ব্যাপারটা জানে। সে আমাকে বলল তারও এই একই রকম অভিজ্ঞতা হয়েছে! শিব তাকেও আক্রমণ করেছিলেন। একদিন গভীর রাতে কৃষ্ণ পড়াশোনা করছিল এমন সময় এক অদৃশ্য হাতে কে যেন তাকে এমন জোরে চড় মেরেছিল যে, সে পড়ে গিয়েছিল। পরদিন সকালে আমরা সবাই সেই চড়ের দাগ দেখতে পেয়েছিলাম। আর একদিন রাতে কে যেন তার গলা টিপে ধরেছিল। সে তখন বিছানায় শুয়ে ছিল। সে বুঝতে পেরেছিল যে, এটা শিবেরই কাজ। আমাকেও অন্যভাবে কয়েকবার আক্রমণ করা হয়েছিল, আর আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, এ সব শিবেরই কাজ। কিন্তু আমি কৃষ্ণকে বুঝাতে পারছিলাম না কেন এসব আমাদের উপর হচ্ছে। এ বিষয়ে গোঁসাই কিছু বলতে পারলেন না। তিনি এসব সম্বন্ধে কোন কথা বলতে চাইতেন না— আর আমি জানতাম কেন তিনি চাইতেন না।

এই সব রহস্যজনক শারীরিক আক্রমণ এবং বাড়ীর মধ্যে দাদুর

এই বারবার যাতায়াত আমাদের সকলের মনকে দুর্বল করে তুলেছিল। ভিতরে ভিতরে সবাই এমন একটা মানসিক চাপ অনুভব করছিল যা কোন সাহায্য না করে বরং পরস্পরের সম্বন্ধের মধ্যে একটা ফাটল ধরিয়েছিল। বিশেষ করে আমার ও রেবতী মাসীমার মধ্যে তা ঘটেছিল। যদিও আমাদের মধ্যে একটা মমতাবোধ ছিল কিন্তু এখন তা যেন আর নেই। এমন কি, পারিবারিক পূজার সময় মাঝে মাঝে তাঁর সংগে আমার ঝগড়া বেধে যেত। আমার মা প্রায় ছয় বছর হল ভারতে আছেন আর মাসীমা যে আমার সংগে তাঁর একজন সন্তানের মত ব্যবহার করেন তা আমার ভাল লাগত না। তাঁর মুখের চেহারা ছিল গোল। তিনি প্রাণ খুলে হাসতেন। তাঁর মেজাজ সহজেই বদলে যেত। তিনি ছেলেমেয়েদের মিষ্টি খেতে দিতেন আবার পরমুহূর্তে বদলে গিয়ে তাদের মারধর করতেন। তাঁর প্রফুল্ল ব্যক্তিত্বের জন্যে অনেকে আমাদের বাড়ীতে আসতেন কিন্তু মাঝে মাঝে আমার মনে হত তিনি খুবই অসুখী। অবশ্য এর একটা কারণ হল, তিনি তাঁর স্বামীর হাতে খুব কষ্ট পেয়েছিলেন। আমার মনে হত তিনি গত জন্মে একজন পুরুষলোক ছিলেন এবং তাঁর স্ত্রীকে মারতেন। সেজন্য এখন এই জন্মে কর্মফলের জন্য তাঁর ভাগ্যে একই অবস্থা হয়েছে।

আমি ছোটি থাকতে রেবতী মাসীমাই ছিলেন আমাদের বাড়ীর ধর্মীয় নেতা, কিন্তু এখন আমরা দু'জনেই আত্মিক নেতৃত্বের দাবীদার। কাজেই আমাদের মধ্যে একটা মানসিক চাপের সৃষ্টি হয়েছিল। এতে আমি যত বড় হতে লাগলাম আমার মধ্যে একটা হিংসার ভাব জেগে উঠল। প্রতিদিন তিনি অনেকক্ষণ ধরে পূজা, ধ্যান এবং সূর্য ও গরুর উপাসনা করতেন। সেইজন্য তিনি পারিবারিক কাজকর্ম সময়মত করতে পারতেন না। এতে ক্লান্ত হয়ে পড়তেন বলে প্রায়ই তিনি আমাদের উপর ঝাল্ ঝাড়তেন— বিশেষভাবে আমার উপর। এর পরিবর্তে আমি ঘরের কোন কাজে যোগ দিতাম না। আমার কাছে এ সব ছিল আমার মহত্তর ডাকের বিরুদ্ধে। ধর্মীয় ক্রিয়াকাণ্ড বাদ দিয়ে অন্যান্য কাজ করা আমার পক্ষে উপযুক্ত নয়, কারণ অন্যেরা তো সেই

জিজ্ঞাসা করলাম। ওটা তাহলে সেই একই বই যেটা পড়ার দরুন দাদু দিদিমাকে সিঁড়িতে ফেলে দিয়েছিলেন। গরু-খাওয়া খ্রীষ্টানদের বই! আর ইনি হলেন আমার বাবার ভাই!

"ঐ চাদরে সব রকম জীব-জানোয়ার ছিল আর জান, ঈশ্বর পিতরকে কি বলেছিলেন? তিনি বলেছিলেন— পিতর যেন সেগুলো মেরে তার যতটা ইচ্ছা খায়।" জ্যেঠার চোখে বিজয়ের চিহ্ন দেখা গেল— মনে হল বাড়ীতে যে অত্যাচার ও মৃত্যুর জঘন্য গন্ধ বের হচ্ছে তার পক্ষে তিনি যতদূর পেরেছেন বলেছেন।

আমি খুব কড়া গলায় উত্তর দিলাম, "হ'তে পারে, কিন্তু তিনি তো তোমাকে বলেন নি!"

জ্যেঠামশাই বললেন, "কিন্তু আমরা কালীর নামে এটা করছি। কোলকাতার কালী মন্দিরে পুরাহিতেরা প্রতিদিন সকালে ১৬টা ছাগল কাটেন।" আমার জ্যেঠিমা রান্নাঘরে বসে মাথা নাড়ছিলেন। তিনি আমার রাগের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য সেখানে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

আমি কড়া সুরেই তাঁকে জবাব দিলাম, "কিন্তু ব্রাহ্মণেরা ওগুলো খায় না।"

আমি সেদিন কিছুই খেলাম না। মাংসের গন্ধে সারা ঘর দূষিত হয়ে গেছে। আমার নীতিতে আমি অবিচলিত থাকতাম বলে লোকে আমাকে শ্রদ্ধা করত। বাড়ীতে আমার জন্য আলাদা থালা-গ্লাশ ও বাসনপত্র ছিল, এমন কি, বালিশের ওয়াড় ও বিছানার চাদরও আলাদা ছিল। কেউ সেগুলো ব্যবহার করতে সাহস করত না। যে সব রুটি বা পিঠার মধ্যে ডিম দেওয়া হ'ত আমি সেগুলো খেতাম না। জ্যেঠামশাই এ সবই জানতেন। এর আগে আমরা একসংগে বসে নানা বিষয় নিয়ে কথা বলতে কত ভালবাসতাম! আর এখন আমরা বসে রয়েছি একটা বিশ্রি বিরক্তির নীরবতায়। মাঝে মাঝে দু' একটা কথা ছাড়া আর কোন কথাই আমাদের মধ্যে বলাবলি হচ্ছে না। জ্যেঠিমা আর আমার জ্যাঠাতো ভাইবোনেরা আমার দৃষ্টির বাইরে রইল। শেষে

আমার জ্যেঠামশাই আমাকে নিয়ে কাছের একটা বন্দরে যেতে চাইলেন। সেখানে একটা ডাচ্ তেলবাহী জাহাজ আগের দিন এসে ভিড়ে ছিল। বাড়ীর ও সেই বিশ্রী গন্ধের বাইরে যাবার অজুহাত পেয়ে আমি যেতে রাজী হলাম।

আমি যতগুলো জাহাজ দেখেছি সেগুলোর মধ্যে এই জাহাজটা ছিল সুন্দর, মসৃণ, লম্বা আর বড়। জাহাজটা তীর থেকে দূরে দাঁড়িয়ে ছিল আর বার্জগুলো থেকে মোটা মোটা পাইপের মধ্যে দিয়ে কালো কালো তেল যতই তার মধ্যে ঢালা হচ্ছিল ততই সেটা নীচের দিকে ডুবে যাচ্ছিল। আমাদের কাছাকাছি একটা মালবাহী জাহাজে মাল তোলা হচ্ছিল। জাহাজ ঘাটা থেকে ক্রেনে করে মাল তোলার সময় ভীষণ আওয়াজ হচ্ছিল। খালি গায়ে কুলীরা মাল তুলছিল আর গরমে ভীষণভাবে ঘামছিল। বন্দরে এ সব দেখতে আমার খুব ভাল লাগত। এই রকম ব্যস্ততা দেখে আমি একটা উত্তেজনা অনুভব করতাম। জাহাজগুলোর বিভিন্ন অদ্ভুত নাম দেখতে দেখতে আমি দূরে অজানা জায়গায় যাবার ডাক শুনতে পেতাম। জ্যেঠামশাই আমার মত বন্দরের এসব দেখতে ভালবাসতেন। আমরা খেয়াল না করলেও আমাদের মধ্যেকার মানসিক চাপ তখন দূর হয়ে গিয়েছিল আমরা সহজ ভাবেই আলাপ করছিলাম আমার স্কুলে পড়বার কথা। স্কুলটা জ্যেঠামশাইয়ের বাড়ীর কাছাকাছি হওয়াতে শরৎকালে স্কুল খুললে প্রায়ই তাঁর সংগে আমার দেখা হবে। সব কথা শুনে তিনি খুশী হলেন, বললেন আমি ঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছি। আমার বাবা বেঁচে থাকলে এতে খুশীই হতেন।

আমরা হাঁটতে হাঁটতে একটা খালি মালবাহী জাহাজের কাছে আসলে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "এই জাহাজটায় কোন কাজ হচ্ছে না কেন?"

জ্যেঠামশাই জাহাজটা দেখতে দেখতে একটু আশ্চর্য হয়ে বললেন, "সত্যি, আশ্চর্য তো!"

একটা মোটা দড়ি ক্রেন থেকে ঝুলছিল, আমি সেটা ধরে বললাম,

তিনি আগ্রহের সংগে বললেন আর দিদিমাও এতে জোরে জোরে মাথা নেড়ে সায় দিলেন। মামা আরও বললেন, "তোমাকে বিশ্ববিদ্যালয়েও পড়তে হবে। তোমার মতামত প্রকাশের জন্যও এটা প্রয়োজন। তুমি নিজেকে যতই জ্ঞানী করে তোল না কেন যদি ভাল শিক্ষক হ'তে না পার তবে অন্যদের কাছে সব কিছু ব্যাখ্যা করবে কি করে? এ ছাড়া বেদ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করার জন্য তোমাকে সাধারণ শিক্ষাও লাভ করতে হবে।"

হতাশ হয়ে মাথা নীচু করে বললাম, "হ্যাঁ, তোমার কথা ঠিক। স্কুলের কষ্টকর পড়াশোনা কবে শেষ হবে সেদিকে আমার চিন্তা ছিল, কিন্তু যুক্তির দিক থেকে তাঁর কথা ঠিক। আমার মাস্‌তুতো ভাই কৃষ্ণ দক্ষিণের যে হাই স্কুলে পড়ত সেখান থেকেই আমি প্রবেশিকা পরীক্ষা দেব বলে ঠিক করেছিলাম। আমার জ্যেঠামশাই রামচাঁদের সংগে থাকতে আমার কোন অসুবিধাই হবে না, কারণ আমি তাঁকে খুব সম্মান করতাম। স্কুলের কাছেই ছিল তাঁর বাড়ীটা।

* * * * * *

"রবি আসছে! রবি আসছে!" জ্যেঠিমা আমার আসার খবরটা সকলকে জানালেন। তিনি আমাকে আসতে দেখলে সর্বদাই এইভাবে সবাইকে জানাতেন।

সুটকেশটা এক হাতে নিয়ে আমি খুব কষ্টে বাস থেকে নেমে আমার বাবার বড় ভাই রামচাঁদ মহারাজের বাড়ীর দিকে চললাম। গরম ও স্যাঁতস্যেতে আবহাওয়ার জন্য আমি তখন ঘামছিলাম। রামচাঁদ জ্যেঠার বাড়ীটা ছিল দ্বীপের দক্ষিণ দিকে। আমি মাঝে মাঝে সেখানে যেতে ভালবাসতাম। জ্যেঠিমার নাম ছিল ডাদি। তিনি খুব বর্হিমূখী ও উত্তেজনায় পূর্ণ মানুষ ছিলেন। আমি দূরে থাকতেই তিনি সবসময় আনন্দে চিৎকার করে আমাকে অভ্যর্থনা জানাতেন। কিন্তু এইবার তাঁর চিৎকারের মধ্যে একটু ভয়ের সুর ছিল। কারণটা অবশ্য

আমি একটু পরেই আবিষ্কার করলাম। ঘরে ঢুকতেই আমার নাকে ছাগলের মাংস রান্নার কটু গন্ধ আসল। আমি কখনও ভাবি নি যে, তারা মাংস খায়। সেদিন কি কষ্টকর মোহভংগ হল আমার!

মনে হল রামচাঁদ জ্যেঠা লজ্জা পেয়ে কি বলবেন তা ভেবে পাচ্ছেন না। শেষে বললেন, "তুমি যে আজকেই এখানে আসবে তা জানতাম না।"

"আমি তোমাদের অবাক করে দিতে চেয়েছিলাম। জ্যেঠার অবস্থা বুঝে আমি যে কোন্ দিকে তাকাব তা বুঝতে পারছিলাম না। কি লজ্জার কথা! ব্রাহ্মণ হয়ে মাংস খাওয়া! আর তাঁর মত একজন ভাল ও ধার্মিক লোকের পক্ষে!

জ্যেঠামশাই সাধারণ কথাবার্তায় আমাকে ব্যস্ত রাখতে চাইলেন। তিনি দিদিমা ও বাড়ীর অন্যান্য সকলে কেমন আছে জিজ্ঞাসা করলেন। আমি গম্ভীরভাবে উত্তর দিলাম, আমার অসন্তুষ্টি লুকাবার চেষ্টা করলাম না। শেষে আমাদের কথা বলবার মত আর কিছুই রইল না। আমি কি ভাবছি তা জ্যেঠামশাই তো বুঝতেই পেরেছিলেন তাই নিজের সাফাই গাইবার জন্য বললেন, "রবি, তুমি জান কেন খ্রীষ্টানেরা মাংস খায়?"

প্রশ্নটা আমার কাছে খুব অদ্ভুত মনে হল। খ্রীষ্টানেরা আমার দেবতা গরু খেয়ে জঘন্য পাপ করে এবং তা খাবার পক্ষে যে কোন অজুহাত দেখাক না কেন তাতে কি এসে যায়? আমি মাথা নাড়লাম। আমার তখন খুব বমি-বমি লাগছিল, ভাল লাগছিল না।

জ্যেঠামশাই বললেন, "ঈশ্বর মস্ত বড় একটা চাদরে করে সব রকম জীব-জানোয়ার আকাশ থেকে নামিয়ে দিয়েছিলেন।"

"তোমরা কথাটা কোথায় পেলে?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

"কেন? ওই খ্রীষ্টানদের বইয়ে লেখা আছে।"

"তার মানে তুমি ওটা পড়েছ?"

"আমি নিজে পড়ি নি, তবে ঐ বিষয়ে শুনেছি।"

"এখন ঐ মস্ত বড় চাদরটা কি হল?" আমি রেগে নিষ্ঠুরভাবে

আহ্ববানের প্রমাণের সত্যিকারের একটা চিহ্ন। "শক্তি" হল কালীর অনেক নামের একটা নাম। কালী হলেন শিবের রক্তপিপাসু স্ত্রী, শক্তির দেবীমাতা যিনি ব্রহ্মাণ্ডে আদিম শক্তি প্রবাহিত করেন। আমি যে তাঁর সেই শক্তির গমনাগমনের পথ তা ভেবে আমি উত্তেজিত হয়ে উঠতাম।

প্রায়ই আমি যখন গভীর ধ্যানে ডুবে যেতাম তখন দেব-দেবতারা আমার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠতেন এবং তাঁরা আমার সংগে কথা বলতেন। সময়ে সময়ে মনে হত সূক্ষ্ম শরীরে আমাকে যেন দূরে কোন গ্রহে অথবা অন্য আকৃতির কোন জগতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বেশ অনেক বছর পরে আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, ঐ ধরণের অভিজ্ঞতা মনস্তত্ত্ববিদ্‌দের পরীক্ষাগারে সম্মোহনের মাধ্যমে হতে পারে। যোগাভ্যাসের আবেশে থাকার সময় প্রায়ই সেই প্রলয়কারী শিবের সংগে আমার দেখা হত। ভয়ে ভয়ে তাঁর পায়ের কাছে আমি বসে থাকতাম। তাঁর গলায় জড়িয়ে থাকা বিরাট গোখ্‌রো সাপ আমার দিকে তাকিয়ে থাকত আর হিস্ হিস্ শব্দে অনবরত তার জিভ বের করে আমাকে ভয় দেখাত। মাঝে মাঝে আমার মনে হত, যে সব দেবতা-দের সংগে আমার দেখা হয় তাদের কেউ কেন দয়ালু, শান্ত ও স্নেহময় হন না? তবে তাঁদের সত্যিকারের এক এক জন বলে মনে হত— অবশ্য এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ ছিল না। অন্ততঃ তাঁরা খ্রীষ্টানদের দেবতা 'ক্রীসমাস ফাদারের' মত মিথ্যা নয়।

* * * * * *

দিনটা আমার জন্যে কি আনন্দেরই না ছিল যেদিন দাদামশাইয়ের বড় ছেলে দেবনারায়ণ মামা লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসহ পাশ করে ফিরে আসলেন! এর কয়েকমাস আগে কুমার মামা লণ্ডনে চলে গিয়েছিলেন। তাতে রেবতী মাসীমার মাতৃত্ব ও প্রভুত্বের হাত বাড়ীর উপরে খুব শক্ত হয়ে উঠল। এখন দেবনারায়ণ মামা আসাতে

পরিবারের মাথার উপর আবার একজন পুরুষ কর্তৃত্ব করবে। দেবনারায়ণ মামা ছিলেন প্রায় আমার সত্যিকারের বাবার মতই। আমি ভাবলাম বড় মামা ফিরে আসাতে মাকে ফিরে আসতে উৎসাহ জোগাবে। মা দুই তিনি মাস বাদে চিঠি লেখেন কিন্তু তাতে "আগামী বছরে" ফিরে আসার কথা আর লেখা থাকে না।

বড় মামা ফিরে আসার কিছুদিন পরে আমাকে চুপি চুপি বললেন, "রবি, আমি একটা নতুন গাড়ী কিনেছি। আমি চাই তুমি ওটাকে আশীর্বাদ করবে।" তারপর আগ্রহের সংগে বললেন, "তুমি ওটাকে আশীর্বাদ না করলে আমি ওটা চালাব না।"

আমার চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আমি ভেবেছিলাম লণ্ডন থেকে ফিরে এসে মামা হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করবেন। বেশ কয়েক বছর ধরে ধর্মের প্রতি তাঁর কোন আগ্রহই ছিল না, কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে তিনি একজন গোঁড়া হিন্দু হয়ে উঠেছেন। মামার কথা শুনে আমি যতদূর সম্ভব শুদ্ধ ইংরেজীতে বললাম, "মামা একটু দাঁড়াও, আমি কতগুলো জিনিষ আনতে যাচ্ছি; এখনই ফিরে আসব।"

গাড়ীটাকে আমি পুরোপুরিভাবে আশীর্বাদ করলাম। সমস্ত মন্দ আত্মাদের তাড়িয়ে দিলাম এবং সবচেয়ে শক্তিশালী দেবতাদের রক্ষাকারী শক্তি তার উপর নামিয়ে আনলাম। বড় মামা আমাকে এর জন্যে যথেষ্ট টাকা দিলেন যদিও আমি দরকার নেই বলে আপত্তি জানিয়েছিলাম। অবশ্য শেষে আমি রাজী হয়েছিলাম কারণ, ব্রাহ্মণকে দান করার দরুন যে মহৎ আশীর্বাদ পাওয়া যায় তা থেকে আমি তাঁকে বঞ্চিত করতে চাই নি।

একদিন বড় মামা ও আমি সকালবেলা যখন দিদিমার কাছে গেলাম তখন বড় মামা আমাকে বললেন, "রবি, তোমাকে হাই স্কুলে পড়তে যেতে হবে।" তখন আমি মহাবীর গ্রামের স্কুলের পড়া প্রায় শেষ করেছিলাম এবং দূর্গা মন্দিরে কিম্বা পেটি অফ্ স্পেনের আরও বড় মন্দিরে পড়তে যাবার কথা বলছিলাম।

"রবি, তোমাকে আরও পড়াশুনা করতে হবে।"

সব কাজ করতে পারে। তবে একটা কাজ আমি খুব খুশী হয়ে করতাম সেটা হল গরু চরানো-পবিত্রতম প্রাণীর যত্ন করা, যে কোন একজনের পক্ষে এটা সবচেয়ে ভাল কর্ম। কিন্তু যখন থেকে সে আমাকে আক্রমণ করেছিল তখন থেকে সেই কাজের উৎসাহ আমার কমে গিয়েছিল। আমি আর গরুর পূজা করতাম না। বাড়ীর কাজে আমার যে অংশ আছে তা যখন আমি করছিলাম না তখন আমার মাসীমা আমাকে অলসতার জন্য বকুনি দিলেন। তাতে এতদিন ধরে ধ্যানের মধ্য দিয়ে যে শান্তি পাচ্ছিলাম তা এত সহজে নষ্ট হয়ে গেল বলে আমি মনে খুব কষ্ট পাচ্ছিলাম। আমি শান্ত ধরণের হলেও এইরকম সময়ে আমার মেজাজ গরম হত এবং নিজেকে রক্ষা করার জন্য খুব কড়া ভাষা ব্যবহার করতাম। মাঝে মাঝে মনে হত দাদুর ক্রুদ্ধ আত্মা এই রকম সময়ে আমার উপর ভর করে। অনেকবার আমি তাঁর মতই ব্যবহার করতাম। বারাণ্ডার পাকা থামগুলো গাছের ডাল দিয়ে পিটাতাম। তারপর ক্লান্ত হয়ে চুণকাম করা থামগুলোর উপর যে দাগ পড়েছে তার দিকে তাকিয়ে থাকতাম আর ভাবতাম আমার উপর কি ভর করেছে? দাদু যে চামড়ার বেল্ট দিয়ে বাড়ীর অন্যান্যদের মারতেন আমি একদিন সেটা নিয়ে আমার মামাতো বোনদের খুব মারলাম তারপরে লজ্জিত হয়ে থেমে গেলাম। ব্যাপারটা দাদুর ভীষণ রাগের কথাই মনে করিয়ে দিল। সেই ঘটনার পরে মনে হল দাদুর ছবিতে তাঁর চোখ যেন আমার দিকে তাকিয়ে হাসছে। আমি যদি ভুল করেও তাঁর ছবির দিকে তাকাতাম তখন মনে হত তাঁর চোখ যেন কোন গোপন কথা জানে। আমি তখন ভয় পেয়ে কাঁপতে কাঁপতে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে চলে যেতাম, কিন্তু সেই স্মৃতি আমি ভুলতে পারতাম না। এটা নিশ্চিত যে, তিনি আমাদের পিছনে লেগে আছেন, কেবল তাঁর পায়ের শব্দ দিয়ে নয়, কিন্তু আমার মধ্য দিয়েও তা করছেন। বাড়ীর মধ্যে আমার মত সবচেয়ে বেশী ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিকে দিয়ে কেন তাঁর আত্মা তাঁর মৃত্যুর এতদিন পরে পরিবারের অন্যান্যদের কষ্ট দিচ্ছে? এই প্রশ্নের মুখোমুখি হতে পারতাম না, কারণ আমি যা কিছু বিশ্বাস করতাম তার

সংগে এটা জড়িত।

এই সব ঘটনা ভুলে যাবার জন্যে আমি ধর্মীয় উৎসবের দিকে মনোযোগ দিলাম- তা সে মন্দিরে সর্বসাধারণের জন্য হোক, কিম্বা আমাদের নিজেদের বাড়ীতে বা অন্যান্যদের বাড়ীতে হোক। এই সব জায়গায় বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনেরা আসতেন। সেখানে সকলের চোখ আমার দিকে থাকত এবং সকলেই আমাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখত। আমি দর্শকদের মধ্যে ঘুরে বেড়িয়ে তাদের উপর পবিত্র জল ছিটাতাম কিম্বা পবিত্র চন্দন তাদের কপালে লাগিয়ে দিতাম এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকদের কাছ থেকে চাঁদা তুলতাম যতক্ষণ না পিতলের থালাটা নীল, লাল ও সবুজ টাকার নোটে পূর্ণ হয়ে যেত। সেটা দেখলে মনে হত যেন সেই থালার উপরে অনেক ফুল ফুটে আছে। আমি সবচেয়ে পছন্দ করতাম বেদীর কাছাকাছি থাকতে এবং যে পণ্ডিত পূজা করবেন তাঁর কাছে বসতে। সকলের চোখ আমাদের দিকে শ্রদ্ধাভরে তাকিয়ে থাকত। এই সব উৎসবে আমার গলায় ফুলের মালা পরিয়ে দিলে তার সুগন্ধে আমি খুব খুশী হ'তাম। উৎসব-শেষে উপাসনাকারীরা নীচু হয়ে আমাকে প্রণাম করে আমার পায়ের কাছে উপহারের জিনিষ রাখত।

আমি যদিও ধ্যানের মধ্যে শান্তি খুঁজে পেতাম কিন্তু তা অল্প সময়ের মধ্যে আমাকে ছেড়ে যেত, এবং যোগাভ্যাসের দরুন যে যাদুর শক্তি আমি পেয়েছিলাম তা এসে আমার উপর অনেকক্ষণ ধরে ভর করত এবং সাধারণ মানুষের সামনে প্রকাশ পেত। আমার এই অলৌকিক শক্তি প্রকাশ না পেলে তো আমি সকলের চোখে আরও মহান হতে পারব না। তাই আমার এই শক্তির বৃদ্ধিকে আমি আমন্ত্রণ জানাতাম। যারা আমাকে প্রণাম করত তাদের আশীর্বাদ করার জন্য যখন আমি তাদের কপাল স্পর্শ করতাম তখন তারা একটা উজ্জলতা অনুভব করত এবং তাদের অন্তর যেন আলোকিত হয়ে উঠত। আমার বয়স তখন তেরো কিন্তু তখনই অন্যদের আমি "শক্তিপথ" দেখিয়ে দিতাম। এটা গুরুদের মধ্যে বিখ্যাত ছিল আর সেটাই ছিল আমার

"জ্যেঠা, দেখ।" আমি সেটা ধরে ঝুলে নিজের ভার পরীক্ষা করে দেখলাম। কয়েক টন মাল বয়ে নেবার ক্ষমতা দড়িটার আছে। দড়ি ধরে ঝুলতে ঝুলতে বললাম, "দেখ, আমি টারজানের মত করতে পারি।" এই বলে আমি চিৎকার করে দৌড়ে গিয়ে শূন্যে লাফ্ দিলাম। দড়িটা ধরে আমি এদিক থেকে ওদিকে দুলতে লাগলাম—একবার উপরে উঠি আর একবার জ্যেঠারমশাইয়ের পাশ দিয়ে সোঁ করে নেমে যাই। জ্যেঠামশাই হাসছিলেন আর ব্যাপারটা উপভোগ করছিলেন। তারপর যা ঘটল! মনে হল ক্রেনের উপরের দিকে কেউ বোধহয় ছুরি দিয়ে দড়িটা কেটে রেখেছিল তাই হঠাৎ দড়িটা ঢিলে হয়ে আসল।

যা ঘটতে যাচ্ছে তার একটু আগে আমি জ্যেঠা মশাইয়ের চিৎকার শুনলাম, "রবি, সাবধান, সাবধান।"

নীচে নামবার সময় দেখে ভয় পেলাম যে, আমি জাহাজ ও জাহাজ ঘাটের মধ্যেকার সরু জায়গাটায় সোজা গিয়ে পৌঁছাচ্ছি। আমি দু'হাতে জেটির কিনারা ধরে অনিশ্চিতভাবে আধা-মূর্ছিত হয়ে ঝুলতে লাগলাম। জ্যেঠামশাই আমার একটা হাত ধরে আমাকে তুলে আনলেন। তিনি ঠিক সময়েই আমাকে নিয়ে এসেছিলেন, কারণ একটু পরেই জাহাজটা দুলতে দুলতে এসে ঘাটে ধাক্কা লাগল।

জ্যেঠামশাই বললেন, "তুমি খুব জোর বেঁচে গেছ।"
জাহাজের ধাক্কায় আমি শেষ হয়ে যেতে পারতাম। জ্যেঠামশাইয়ের ঠোঁট দু'টো কাঁপছিল আর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল।

আমার তখন দাঁড়াবার শক্তি ছিল না। আমরা দু'জনেই বোবা হয়ে জাহাজঘাটে সাপের মত পড়ে থাকা দড়িটার দিকে তাকালাম; তারপর তাকালাম আমার মাথার অনেক উপরে থাকা সেই ক্রেনের দিকে যেখান থেকে দড়িটা নেমে এসেছিল। মনে হল এর ব্যাখ্যা দেবার মত কিছু নেই। এক সময় দড়িটা শক্তভাবে লাগানো ছিল, আবার পর মুহূর্তে কোন অদৃশ্য হাত সেটা খুলে দিয়েছিল। আমার মনে কতগুলো স্মৃতি ভেসে ওঠাতে আমার শিরদাঁড়া বেয়ে একটা কাঁপুনি উঠে গেল।

আমার মনে পড়ল, কেউ যেন আমাকে দ্রুতগামী ট্রাকের সামনে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল আর আমি ভীষণ ভাবে আহত হয়েছিলাম। মনে পড়ল একটা বিকেলের কথা যা আমি কখনও ভুলতে পারব না। একটা কি যেন আমার পা দু'টো রাস্তার মধ্যে এমন ভাবে চেপে রাখল যে, আমি পা উঠাতেই পারলাম না, আর একটা ভারী রোলার আমার পা গুঁড়ো করে দিয়ে গেল ——— আরও ঐ রকম "দুর্ঘটনা" আমার জীবনে ঘটে গেছে। তখন এই পরিত্যক্ত জাহাজের ছায়ায় দাঁড়িয়ে আমি অদ্ভুতভাবে বুঝতে পারলাম যে, আমি যাঁকে খুব ভাল করেই জানি সেই ভয়প্রদর্শনকারী শিবেরই কাণ্ড এ সব। তাহলে শিবই কি ঐ দড়িটা খুলে দিয়েছিলেন? শিবের ক্রোধের কথা স্মরণ করে আমি সেই বিশ্রী চিন্তাটা বাদ দেবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু তাঁর উপস্থিতির অনুভূতি লেগেই রইল। কিন্তু কেন? আমি তো মাংসভোজী নই।

আমরা চুপ করে গম্ভীরভাবে বাড়ীতে ফিরে গেলাম, দু'জনেই চিন্তায় ডুবে ছিলাম। এই-ই যদি আমার গত জীবন থেকে আমার এখনকার কর্ম হয়ে থাকে তবে সেটা যে অত্যন্ত অন্যায় তা আমি বুঝতে পারলাম। কেন আমি আমার গত জীবনের পাপের জন্য এখনকার জীবনে কষ্ট পাব, যে পাপের কথা আমার এখন মনেই পড়ে না?

৮

পবিত্র গরু!

"রবি, রবি, শোন, পোর্ট অফ্ স্পেনের কুইন্‌স্ রয়েল কলেজে আমি শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছি, বুঝলে? তাহলে তুমি দক্ষিণে না গিয়ে ওখানেই পড়াশোনা কর না কেন?" এ কথা বলে দেবনারায়ণ মামা তাঁর নিযুক্তির চিঠিটা আমাকে দেখালেন। চিঠিটা তখনই ডাকে এসেছিল।

"মামা, তুমি কি মনে কর? আমার কি সেখানে যাওয়া ঠিক হবে?" অত বিরাট আর খ্যাতিসম্পন্ন স্কুলে যাওয়ার কথা ভেবে আমি ভয় পেলাম।

"নিশ্চয়ই! প্রত্যেক দিন তুমি গাড়ীতে করে আমার সংগে যাবে। কেমন ভাল হবে, তাই না?"

আমার এই বড় মামাকে আমি খুব ভালবাসতাম। প্রত্যেক দিন তাঁর সংগে যাওয়া, তাঁর সংগে কথা বলার সুযোগ পাওয়াকে আমি খুব বিরাট একটা কিছু বলে মনে করতাম—— তাই আমি রাজী হয়ে গেলাম।

রাজধানী পোর্ট অফ্ স্পেনের বড় বড় রাস্তা ধরে চলতে চলতে আমি পুলকিত হয়ে উঠলাম। রাস্তার দুপাশে ব্যস্ত- সমস্ত দোকানগুলো, লাল টিনের ছাদ-দেওয়া বড় বড় বাড়ী পার হয়ে গেলাম; পার হয়ে গেলাম সুন্দর সব পার্ক, যেখানে আছে সবুজ ঘাসে ঢাকা ফুটবল মাঠ আর ক্রিকেট ক্লাব। এ সব পার হয়ে গিয়ে পৌঁছালাম কুইনস্ রয়েল কলেজের ভাবগম্ভীর দালানগুলোর কাছে। বড় মামা আমার মতই খুশী

হয়ে উঠেছিলেন এবং তখনই গর্বভরে তাঁর কয়েকজন সহকর্মীর সংগে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, "আমার ব্রাহ্মণ ভাগনে।"

প্রথমে সবাই একটা বড় ঘরে জড়ো হলে পর অধ্যক্ষ এসে একটা লম্বা ও আমার কাছে দুর্বোধ্য বক্তৃতা দিলেন। আমি খুব কম ইংরেজের বক্তৃতাই শুনেছি এবং তাদের কথা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারি নি, কিন্তু এঁর কথা আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না।

বক্তৃতা শেষ হয়ে গেলে আমার পাশে বসা একটি ছাত্রকে আমি ফিস্ ফিস্ করে জিজ্ঞাসা করলাম, "উনি কি বললেন?" আমি দেখতে পেলাম এই স্কুলে পড়তে গেলে আমার একজন অনুবাদকের প্রয়োজন হবে।

সে আশ্চর্য হয়ে আমার দিকে তাকাল, তারপর জোরে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কি কালা?"

"না, আমি কালা নই, কিন্তু উনি কি বিষয়ে কথা বলছিলেন?"

"কতগুলো নিয়মকানুন ও ঐ সম্বন্ধে বলছিলেন। আমার মনে হয় তুমি দক্ষিণের কোন জায়গা থেকে এসেছ।"

আমি মাথা নাড়লাম। তখন আমার মনে হচ্ছিল কৃষ্ণ ও অন্যান্যদের সংগে অন্য হাই স্কুলে গেলে ভাল করতাম। দিনটা শেষ হবার আগেই আমি মনে করলাম কুইন্স্ রয়েল কলেজের নামটা না শুনলেই আমার পক্ষে ভাল ছিল। দ্বীপের যে জায়গাটায় আমরা থাকতাম সেখানকার প্রায় সব লোকই ছিল পূর্ব ভারতীয়, কিন্তু পোর্ট অফ্ স্পেনের বেশীর ভাগ লোক ছিল কালো আর তাতে আমার মনের ভিতরে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়েছিল। আমার সারা জীবন ধরে এই কালো লোকদের প্রতি আমার মনে একটা বিতৃষ্ণার ভাব ছিল, কারণ তারা আমার গরু দেবতার মাংস খেত। আমি তাদের নীচু জাতের থেকেও আরও নীচে ভাবতাম। আমি ক্লাশে কেমন করে তাদের পাশে বসব, হলঘরের ভীড়ের মধ্যে কাঁধ ঘসাঘসি করব এবং তাদের সংগে ফুটবল খেলব? প্রথম দিনেই আমার বিদ্বেষ ও অহংকারে একটা প্রবল ধাক্কা লাগল। দেশের যে সব কালো লোকদের আমি জানতাম তারা প্রায়

সবাই গরীব। এই স্কুলের কালো, ফর্সা, সাদা যে কোন ছাত্রই হোক্ না কেন সবাই ধনী ঘর থেকে এসেছে এবং তারা আমার চেয়ে ভাল ইংরেজী বলে। পদ্য পড়ার পালা যখন আমার আসল তখন অন্যান্য ছাত্রেরা আমার গ্রাম্য উচ্চারণ ও ভুল ব্যাকরণ শুনে বই আড়াল দিয়ে হাসতে লাগল। যাতে হাস্যাস্পদ না হই সেজন্য অনেক চেষ্টা করে আমি ঠিকভাবে উচ্চারণ করতে চেষ্টা করতাম।

সপ্তার পর সপ্তা কেটে যেতে লাগল আর কালো, পূর্ব দেশীয়, ইংরেজ যুবক ও অন্যান্য জাতির ছেলেদের সংগে মিশে প্রতিদিনই আমার ধর্মীয় বিশ্বাসে ঘা খেতে লাগল। হিন্দুধর্মের ভক্তি হল জাতি ভেদ। ব্রহ্মার নিজের দেহ থেকেই চারটি সামাজিক শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছে— বেদে যা বলা হয়েছে কোন সরকারই কোন নির্দেশ দিয়ে তা বদলাতে পারে না— তাহলে জগতে আর কোন জাতির অস্তিত্ব থাকবার কথা নয়; কিন্তু জগৎ অন্যান্য জাতিতেও ভরা। এরা সেই চারটি শ্রেণীর মধ্যে একেবারেই পড়ে না। তাহলে এরা কোথা থেকে আসল? তাদের জন্য যোগ ও পুনর্জন্মের মাধ্যমে মুক্তির উপায়ের কথা কেন বেদে উল্লেখ নেই? আমার ধর্মমতে পরিষ্কার দেখা যায় তাদের কোন আশা নেই। কিন্তু কোন দিক থেকেই তারা আমার চেয়ে কম নয়। প্রকৃত পক্ষে তাদের মধ্যে কয়েকজনের সংগে প্রতিযোগীতা করা আমার পক্ষে কষ্টকর হ'য়ে পড়ল। দ্বীপের যে অংশে আমি থাকতাম তারা সবাই আমার দিকে চেয়ে থাকত এবং আমাকে দেবতার মত দেখত। আর আমি নিজেকে দেবতাই মনে করতাম। কিন্তু কুইন্‌স কলেজের এই সব ছেলেরা আমাকে তাদের সমান হিসাবেই আমার সংগে ব্যবহার করত। আবার মাঝে মাঝে তা-ও মনে করত না। তারা প্রায়ই আমাকে প্রশ্ন করত মাঝে মাঝে কৌতুক করবার জন্য, আবার মাঝে মাঝে আন্তরিকভাবে। এইভাবে তারা আমার বিশ্বাসে আঘাত করত।

"এই কথা কি সত্যি যে, হিন্দুরা বিশ্বাস করে সব কিছুই ঈশ্বর?"

প্রশ্নকর্তার দিক থেকে আমার চারপাশে জড়ো হওয়া নানা

জাতের ও নানা ধর্মের ছেলেদের দিকে তাকিয়ে আমি মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলতাম। আমাকে এইভাবে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা তাদের স্বভাবে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। অন্যান্য হিন্দু ছেলেরা সতর্কতার সংগে আমাকে এড়িয়ে চলত— আমার পক্ষ হয়ে কিছু বলত না। মনে হত যেন তারা আমাকে নিয়ে লজ্জা পাচ্ছে অথবা ভয় পাচ্ছে।

"তাহলে তুমি বলতে চাইছ একটা মাছি, একটা পিপড়ে অথবা একটা গন্ধপোকাও ঈশ্বর?" এতে আমার চারপাশে দাঁড়ানো ছেলেদের একটা ছোটি দলের মধ্যে হাসির হুল্লোড় পড়ে যেত।

আমি শক্ত হয়ে বলতাম, "তোমরা হাসছ, কারণ তোমরা কিছুই বোঝো না। তোমরা একটা বিভ্রমের মধ্যে পড়ে আছ, আসলে একজন সত্যকে, অর্থাৎ ব্রহ্মাকে দেখতে পাচ্ছ না।"

একজন পর্তুগীজ ছেলে অবিশ্বাস ভরে জিজ্ঞাসা করল, "তাহলে তুমি কি ঈশ্বর?"

আমি ইতস্ততঃ করতে সাহস করলাম না, কারণ তাতে আমি আরও হাসির খোরাক জোগাতাম। তাই দৃঢ়ভাবে উত্তর দিলাম, "হ্যাঁ, কেবল আমি নই, সব হিন্দুরাই তা-ই, কিন্তু সে কথা তাদের বুঝতে হবে।"

সে আমাকে উপহাস করে বলল, "কথাটা যে সত্যি নয় তা তুমি কি করে বুঝাবে? তুমি তো জগৎ সৃষ্টি কর নি!

একজন ইংরেজ ছেলে মনে হল হিন্দু ধর্ম সম্বন্ধে বেশ ভালই জানে। সে বলল, "তুমি তো নিরামিষ ভোজী — কোন প্রাণ নষ্ট করাতে তুমি বিশ্বাস কর না ——।"

"আমি গান্ধীর মত অহিংসায় বিশ্বাস করি। সবাই তাঁকে সম্মান করে। তিনি একজন মস্ত বড় হিন্দু ছিলেন। কোন প্রাণ নেওয়া অন্যায়।"

"কোন প্রাণ?" তার গলার স্বরেও আমি বুঝতে পারলাম না যে, আমার কথাতেই সে আমাকে ফাঁদে ফেলবে।

আমি বেশ জোরের সংগেই 'হ্যাঁ' সূচক মাথা নাড়লাম, বললাম,

"সমস্ত প্রাণই পবিত্র। বেদে সেই কথা লেখা আছে। দলের মধ্যে কতগুলো চীনে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছেলে ছিল। তাদের কাছ থেকে সাড়া পাবার জন্য আমি তাদের দিকে তাকালাম। তারা তো আমার মত একই কথা বিশ্বাস করে- কিন্তু তারা সে কথা মেনে নিল না কেন? আমি বুঝলাম যে, আমি ফাঁদে পড়েছি তাই চাইলাম যেন তারা এই বিষয়ে আমার সাহায্যকারী হয় যদিও ধর্মীয় অনেক ব্যাপারে তারা আমার বিরুদ্ধে ছিল। আমি জীববিদ্যা ক্লাশে প্রাণীর সাতটি বৈশিষ্ট সম্বন্ধে শিখেছিলাম; সেগুলো হল- শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ, খাওয়া-দাওয়া, বর্জন, উত্তেজনা, বৃদ্ধি, জন্মদান ও চলৎশক্তি। আমি খুব ভাল করেই জানতাম যে, শাক-সব্জীর মধ্যেও এই সাতটি বৈশিষ্ট্য আছে। যখন আমি গাছ থেকে কলা অথবা আম ছিঁড়ে নিয়ে খাই তখন আমি প্রাণ হরণ করি। কাজেই নিরামিষ ভোজীরা যে, প্রাণ হরণ করে তা অস্বীকার করার কোন পথই আমার জানা নেই কিন্তু আমি বুঝাতে চাইছিলাম যে, সব্জীর প্রাণ ও কোন জীবের প্রাণ নেওয়ার মধ্যে পার্থক্য আছে।

আমার বিপক্ষ ছেলেটি তার বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপল, তারপর বলল, "উদ্ভিদেরও যে প্রাণের সাতটি বৈশিষ্ট্য আছে তা কি তুমি জান না? তাহলে নিরামিষ ভোজীরাও তো প্রাণ হরণ করে।"

উদ্ভিদ ও জীব-জানোয়ারের প্রাণের মধ্যে যে পার্থক্য আছে তা তুলে ধরবার জন্য আমি যেই মুখ খুললাম অম্নি আর একজন আমার পেছন থেকে বলে উঠল, "চা বানাবার জন্যে যখন কেউ জল ফুটায় তখন কি হয়? তখন সে কত লক্ষ লক্ষ জীবাণু হত্যা করে ভেবে দেখ। বেচারা, অসহায় ছোট্ট ছোট্ট প্রাণীগুলো! ওগুলো তো তা-ই। জানো, ওগুলো পুনর্জন্ম পেতে পেতে শেষ পর্যন্ত গরু ও মানুষে পরিণত হয়।"

এ কথা শুনে সবাই হেসে উঠল। আমার বাঁ দিক থেকে একজন বলে উঠল, "ইস্! ও তো রীতিমত একজন খুনী!" আর একজন বলল, "কেবল সবজী খেয়ে খেয়েই তো ও এত রোগা। তোমার মাংস

খাওয়া দরকার।"

আমি বীরের মত তাদের কথায় বাধা দিয়ে বললাম, "তোমরা কিছুই বোঝ না।" তখন আমার গাল দু'টা যেন জ্বলছিল আর ভেতরে ভেতরে আমি আঘাত পেয়ে বিহ্বল হয়ে পড়েছিলাম।

সেদিন বিকেলে গাড়ী করে ঘরে ফেরার সময় বড় মামা বললেন, "দেখ, হিন্দুধর্মকে তর্কশাস্ত্র সম্মত বা বিজ্ঞানসম্মত করার চেষ্টা কোরো না। ওটা হল একটা ধর্ম—ওটা তুমি বিশ্বাস করবে বলে বেছে নিয়েছ, প্রমাণ করবার জন্য নয়।"

আমি জোর দিয়ে বললাম, "কিন্তু সত্য চিরদিন সত্যই আর হিন্দুশাস্ত্রই হল সেই সত্য।"

বড় মামা মমতার স্বরে বললেন "শাস্ত্র যা বলে তার বেশীর ভাগই কাল্পনিক। শ্রীকৃষ্ণ বা রাম কেউ কোনদিন ছিলেন না। ভগবদগীতা আর রামায়ণ কাল্পনিক— চমৎকার গল্প।"

আমি দেখলাম মামার সংগে তর্ক করে কোনই লাভ হবে না। তিনি কোনদিনই ধর্মের প্রতি আগ্রহশীল ছিলেন না, যোগাভ্যাসও করতেন না। কাজেই আমি যা বুঝি তিনি তা বুঝতে পারছেন না। হয়তো তাঁর ভাগ্যের মধ্যে আছে যে, এই জীবনে তিনি এ সব বুঝতে পারবেন না। আমি যে সব দেব-দেবতাদের দেখেছি, তিনি হয়তো তাঁদের দেখতে পান নি। সত্য জানবার জন্য হয়তো তাঁকে আরও অনেকবার জন্ম নিতে হবে।

সেদিন বিকাল বেলা আমি গোঁসাইয়ের ঘরের পিছনে নারকেল গাছের তলায় গরু চরাচ্ছিলাম। গরুটা যেদিন আমাকে আক্রমণ করেছিল তারপর থেকে আমি তার উপর খুব ভালভাবে লক্ষ্য রাখতাম। সেই মহান দেবতাকে অবিশ্বাস করা ঠিক নয় তবে সাবধান থাকা উচিত। অনেক কিছুর মধ্যে আমি আর একটা জিনিষ সেই উচ্চ বিদ্যালয়ে শিখেছিলাম সেটা হল সব কিছু প্রমাণ করে দেখা। কোন ধর্মই বাস্তব জীবনে আক্ষরিকভাবে পালন করা যায় না। কতগুলো বাস্তব কারণে আমি গরুকে পূজা করা ছেড়ে দিয়েছিলাম।

দেখলাম, একই সময়ে তাকে পূজা করা আর তার আক্রমণ থেকে নিজেকে বাঁচানো সম্ভব নয়। তাই বলে আমার বিশ্বাস আমি ত্যাগ করব না যে, গরু হল মহান ও পবিত্র দেবতা। আমি এ কথা বিশ্বাস করতাম যে, এ জীবনে যদি আমি মুক্তি লাভ করতে না পারি তবে পরজন্মে গরু হয়ে জন্মানো হল ব্রহ্মার সংগে মিলিত হওয়ার একটা প্রধান ধাপ।

আমি খুব গম্ভীরভাবে গরুকে জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনি তো দেবী, তাই না?"

কিন্তু গরুটা মুখ ভরে সেই রসালো ঘাস ছিঁড়ে নিয়ে নিয়ে পরম তৃপ্তির সংগে খেতে থাকল। গরুটা যে আমাকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেছিল তা এখন বিশ্বাস করা কঠিন, কিন্তু সেই আক্রমণের স্মৃতি পরিষ্কারভাবে আমার মনে ছিল।

"নিশ্চয়ই আপনি দেবী! আমি তো তা জানি, তাই না?"

গরুটা মাথা তুলে আমার দিকে ঘুম-ঘুম চোখে তাকিয়ে আস্তে আস্তে শান্তিপূর্ণভাবে জাবর কটিতে লাগল। তারপর সে গম্ভীরভাবে ডাকল "হাম্বা!"

৯
ধনী – গরীব

একদিন সন্ধ্যেবেলায় আমি বড়মামাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "দাদু কেমন করে এত বড় লোক হয়েছিলেন?" ধনী হওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে এবং আরও অন্যান্য বিষয় নিয়ে আমি খুব চিন্তা করছিলাম, কিন্তু বড় মামাকে এ বিষয় নিয়ে আমি কখনও আলোচনা করতে শুনি নি। আমরা তখন সামনের বারান্দায় দাঁড়িয়ে শহরের উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত বাড়ীগুলোর দৃশ্য উপভোগ করছিলাম। তখন ছিল দেয়ালী উৎসব। প্রত্যেকটি হিন্দু পরিবার দীপ জ্বেলে প্রতিবেশীর সংগে আলোর প্রতিযোগীতায় নেমেছিল -কে কার চাইতে আরও উজ্জ্বল করে আলো জ্বালাতে পারে!

কাঁধ নাচিয়ে বড় মামা বললেন, "পণ্ডিতেরা বলেন, আত্মারা তাঁকে ঐ সব সোনা দিয়েছিলেন," তারপর চিন্তাযুক্ত স্বরে বললেন, "আসলে যুক্তিপূর্ণ কোন ব্যাখ্যাই এর দেওয়া যায় না। তোমার দাদু অবশ্য খুব পরিশ্রম করতেন। যদিও ক্ষত্রিয়ের উঁচু বংশে তাঁর জন্ম তবুও ছেলেবেলায় তিনি ১০ পয়সার বিনিময়ে ঘাস কাটার কাজ করতেন। একজন চীনে লোকের কাছ থেকে কোনরকমে ৫০ টাকা দিয়ে একটা কুঁড়েঘর কিনেছিলেন এবং সেখানে গহনার দোকান দিয়েছিলেন। এক রাতে রহস্যজনকভাবে ঘরটা পুড়ে যায়— আর তার পরে তিনি কোটিপতি হয়েছিলেন। পরিবারের বাইরে খুব কম লোকই সে কথা জানত।"

সন্ধ্যা মিলিয়ে অন্ধকার ঘনিয়ে এলে আমাদের চারপাশে সেই

পবিত্র দীপগুলো আরও উজ্জ্বল হয়ে জ্বলতে লাগল। সে কি সুন্দর দৃশ্য! দেয়ালী উৎসবের দিনটা ছিল আমার খুব প্রিয় ছুটীর দিন। আমার মনে খুব আনন্দ হত যখন আমি দেখতাম খ্রীষ্টানেরা বড়দিনের ছুটীতে যেমন আনন্দের সংগে বাড়ী যেত তার চেয়েও বেশী আনন্দ সহকারে হিন্দুরা দেয়ালী পূজার সময় বাড়ী যেত। দেখতাম হিন্দুরা বৈদ্যুতিক বাতি দিয়ে নয় কিন্তু ঘিয়ে ভেজানো শল্‌তের জীবন্ত জ্বলন্ত বাতি দিয়ে আনন্দ প্রকাশ করত। উজ্জ্বল মোমবাতির মত প্রদীপগুলো জানলায়, টেবিলের উপর, সিঁড়ির—উপর থেকে নীচের ধাপ পর্যন্ত লক্ষ্মী দেবীর সম্মানে প্রদীপগুলো জ্বালানো হত। লক্ষ্মী ছিলেন ধন ও সৌভাগ্যের দেবী।

বড় মামা একটা বিশেষ বাড়ীর দিকে হাত নাড়ালেন, বাড়ীটা সুন্দরভাবে আলোক সজ্জিত ছিল। তিনি বললেন, "তোমার দাদু দেয়ালীর সময় দিনে দু'বার একা একা তাঁর বিরটি লোহার সিন্দুকের সামনে বিশেষ লক্ষ্মী-পূজা করতেন। সেই কামরায় আরও অন্যান্য রহস্যময় পর্বও পালন করা হত, কিন্তু কারও তা দেখবার অনুমতি ছিল না।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "আচ্ছা, লক্ষ্মী দেবী, না আত্মারা তাঁকে ধনী বানিয়েছিলেন, তোমার কি মনে হয়? আমাদের পারিবারিক পণ্ডিত মাঝে মাঝে জ্বলন্ত প্রদীপ হাতে নিয়ে বাড়ীর প্রত্যেকটি কামরায় গিয়ে বাড়ী ও আত্মাদের পূজা করতেন। তিনি বিশেষভাবে দাদুর আত্মার পূজা করতেন, যিনি বাড়ীটা বানিয়েছিলেন। বসবার ঘরে দাদুর যে বিরটি ছবিটা ছিল সেটার চারদিকে তিনবার ভাবগম্ভীরভাবে প্রদীপটা ঘুরাতেন। আমরা দেবতাদের মত করেই আত্মাদের ভক্তি করতাম এবং মাঝে মাঝে তাঁদের সংগে একাত্মতা বোধ করতাম।

মামা বললেন, "তুমি যে নামেই ডাক না কেন জগৎ কি মাত্র একটা শক্তির দ্বারাই পরিচালিত নয়?"

আমি গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বললাম, "জগতে একমাত্র সত্য আছেন ব্রহ্মা; আর অন্য সবই বিভ্রম, মায়া।

এরপর আমরা নীরবে বাতি দেখতে থাকলাম। আমরা লক্ষ্মীর উপস্থিতি অনুভব করছিলাম এবং বুঝতে পারছিলাম যে, তিনি সন্তুষ্ট হয়েছেন। কিন্তু আর একটা প্রশ্ন আমার মনে জাগছিল। শেষে আমি আর চুপ করে থাকতে পারলাম না, তাই জিজ্ঞাসা করলাম, "আচ্ছা, দাদু তাঁর ধন শেষ করার আগেই তো সেই আত্মারা তাঁকে মেরে ফেলেছিল, তাই না? তুমি কি মনে কর?"

বড় মামা কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন, কোন উত্তর দিলেন না। আমি অধৈর্য হয়েও অপেক্ষা করছিলাম। শেষে যখন তিনি মুখ খুললেন তখন তাঁর স্বরে একটা অসহজ ভাব লক্ষ্য করলাম। তিনি বললেন, "আমি জানি না। প্রত্যেকবার দেয়ালীর সময় আমি আমার বাবার সম্পদের কথা চিন্তা করি--যা তিনি রহস্যজনকভাবে পেয়েছিলেন এবং তা লুকানো রয়েছে —তাঁর রহস্যজনক মৃত্যুর কথাও ভাবি।" এই কথা বলে তিনি উত্তেজিত হয়ে কাশলেন এবং ঘরে ঢুকবার জন্য ফিরলেন। যাবার সময় তিনি মৃদুস্বরে বললেন, "এ সব বিষয়ে আমি আর কোন কথা বলতে চাই না।"

আমি সেখানেই অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই সুন্দর দৃশ্য দেখতে থাকলাম। এতগুলো প্রদীপ দেখে আশ্চর্য হচ্ছিলাম আর ভাবছিলাম অনেক দেব-দেবতা ও আত্মাদের কথা আর সেই সংগে ভাবছিলাম একমাত্র সত্যের কথা।

একদিন একজন মুসলমান ছেলে আর আমি বসে দুপুরের খাবার খাচ্ছিলাম। আমি তাকে দেয়ালী উৎসবের কথা বলছিলাম, "লক্ষ্মী দেবীর উদ্দেশে প্রদীপ জ্বালানো হয় আর তাঁকে বিশেষ পূজা দেওয়া হয়। লক্ষ্মী হলেন ধন ও সৌভাগ্যের দেবী।" মনে হল এ বিষয়ে তার বেশ জানবার আগ্রহ আছে কিন্তু সব সময় যা হয় তা-ই হল— আমাদের চারপাশে একটা ছোটখাট ভীড় জমে গেল।

একজন লম্বা কালো ছেলে বলল, "লক্ষ্মী যদি ধন ও সৌভাগ্যের দেবীই হন তবে বেশীরভাগ হিন্দু এত গরীব কেন? তাহলে দেখা যাচ্ছে তাঁর পূজা করা মানেই সময় নষ্ট করা।"

আমি তাকে কড়াভাবে জবাব দিয়ে বললাম, "তুমি কর্ম ও পুনর্জন্ম সম্বন্ধে কিছুই বোঝ না। মানুষ এক জন্মে গরীব হতে পারে আবার তার পরের জন্মে ধনী হতে পারে।"

"তা হতে কতগুলো জন্ম লাগে? চেয়ে দেখ পূর্ব ভারতীয়েরা আখ-কাটার কাজ করে জীর্ণ-শীর্ণ ঘরে থাকে।"

"কই আমার পরিবার তো গরীব নয়!"

একজন রোগা ইংরেজ ছেলে জোর দিয়ে বলল, "ও তো সকলের কথা বলে নি, সাধারণতঃ যা হয়ে থাকে তা-ই বলেছে। দেখ, ভারতের দিকে তাকিয়ে দেখ— গোটা জগতের মধ্যে দুঃখজনক অবস্থা হল কেবল ভারতের!"

"কে এমন কথা বলে?"

"আমার বাবা বলেন। আমার জন্মের আগে তিনি ভারতেই ছিলেন। এখানে মানুষের চেয়ে ইঁদুরের সংখ্যা বেশী, আর কি ভীষণ দারিদ্র্য ও অসুস্থতা!"

"হ্যাঁ, যখন ইংরেজরা শাসন করত তখন সেইরকম ছিল, কিন্তু স্বাধীনতার পরে তা আর নেই।" আমাদের চারপাশে জড়ো হওয়া ছেলেদের মাঝে মুহূর্তের মধ্যে সম্মতিসূচক একটা গুণ গুণ শব্দ শোনা গেল। ত্রিনিদাদে তখন বৃটিশ শাসন থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা চলছিল আর প্রত্যেক স্বদেশ প্রেমিকের মনে তখন স্বাধীনতার আগুন জ্বলছিল।

তুমুল উত্তেজনার মধ্যে একজন বলে উঠল, "দেখ, ভারতে লোক অভুক্ত থাকছে আর ওদিকে ইঁদুরগুলো মোটা হচ্ছে আর পবিত্র গরুগুলো বুড়ো হয়ে মরে যাচ্ছে, ভারতের দেব-দেবী আর পুনর্জন্ম তার জন্যে এই কাজই করছে। আমি নাস্তিক। ওরকম দেব-দেবতার আমার দরকার নেই।"

"কথাটা সত্যি নয়। আমার মা বিদেশে থাকেন, কিন্তু তিনি তো ভারত সম্বন্ধে ওরকম কথা লেখেন না!"

আমি জানতাম আমার বিপক্ষীয়েরা ঠিক কথাই বলছে, কিন্তু তা

স্বীকার করে নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। মা চিঠিতে ভারতের দারিদ্র্য সম্বন্ধে কিছু লিখতে বেশ সাবধানতার সংগে এড়িয়ে যেতেন। তিনি সেখানকার বাগান, উজ্জ্বল রংয়ের পাখী, বিশেষ জীবজন্তু, দেব-মন্দির ও উৎসব সম্বন্ধে লিখতেন। তিনি তাঁর গুরুদেব সম্বন্ধে লিখতেন কিন্তু সেখানকার লোকদের অবস্থা সম্বন্ধে কিছু লিখতেন না। আমার ভারত যে কত গরীব সে সম্বন্ধে আমি যে সব বই পড়েছিলাম তাতে আমার বলার আর কিছুই ছিল না। এখন আমার মনে প্রশ্ন জাগল, যে দেশে হাজার হাজার বছর ধরে যোগাভ্যাস চলছে, কর্মের উন্নতি হচ্ছে, ব্রহ্মের সংগে মিলিত হবার জন্য পুনর্জন্মের গতি উর্দ্ধদিকে চলছে তার ফল কি করে এরকম হতে পারে? আমি দেখেছি ভারতীয় চলচিত্রগুলো সবসময় দেশের প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরা থেকে বিরত থাকে কিন্তু কেন? আর আমিই বা কেন স্কুলে ছেলেদের সংগে জিদ ধরে এমন কতগুলো বিষয় নিয়ে তর্ক করছি যেগুলো স্পষ্টই আমার ভুল দেখিয়ে দেয়? তাহলে আমি কি সত্যকে ভয় পাচ্ছি? কিন্তু আমি তা মোটেই মানতে রাজী নই— সেগুলো মেনে নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

একদিন আমি খুব সন্তর্পণে গোঁসাইকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম কেন বেশীর ভাগ হিন্দুরা গরীব আর কষ্টভোগ করে? তিনি যদিও আমাকে বলেছিলেন যে, তাঁর কর্মের জন্যেই তাঁকে গরীব থাকতে হবে তবুও দেয়ালী উৎসবের সময় তিনি লক্ষ্মীর উদ্দেশে দিন-রাত তাঁর মাটির ঘরে প্রদীপ জ্বালাতেন। তিনি আমাকে বলেছিলেন তাঁর কর্মের জন্যেই তাঁকে গরীব থাকতে হচ্ছে। তিনি আমাকে বললেন, "বেদ শাস্ত্রে বলে, অনেকগুলো জগৎ আছে। হয়তো এই জগতে কেবল গরীব হিন্দুরা আছে। তাদের কর্ম যখন ভাল হবে তখন তারা আর একটা ভাল জগতে যাবে।"

"কিন্তু এখানেও তো দাদু আর পণ্ডিতদের মত ধনী হিন্দুরাও আছে।"

গোঁসাই গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বললেন, "ভাই, এখানে হয়তো

সকলে একরকম নয় কিন্তু অন্য জগতের সবাই ধনী।"

"কিন্তু গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যখন অন্য জগতে কর্ম শেষ হয়ে যায় তখন আবার তাকে এই জগতে ফিরে আসতে হয়।"

"কতগুলো জিনিষ আছে যা সহজে বোঝা যায় না।"

এই কথা বলতে বলতে গোঁসাইয়ের চোখে-মুখে এক মুহূর্তের জন্য সন্দেহ দেখা দিল। তারপর তিনি সেই ভাবটা কাটিয়ে উঠে বললেন, "যোগীর জন্য ধনী-গরীব একই কথা। তোমার বাবার মত যোগী আর এই জগতে ফিরে আসবেন না, কখনও না। উপনিষদে আছে ব্রহ্মকে ধ্যান করতে থাকলে সব অজ্ঞানতা দূর হয়ে যায়। তাঁরা "ওঁ" কে পায়, আর যোগীরাই কেবল এই জ্ঞান পান।"

বেদান্তের কথা উল্লেখ করাতে গোঁসাই আমার প্রধান লক্ষ্যের কথা ভালভাবেই প্রকাশ করলেন। আমার একটা প্রিয় সম্পদ ছিল-সেটা হল যোগ শিক্ষার বই। আমার মা আমাকে ভারত থেকে সেটা আমাকে পাঠিয়েছিলেন। তার মধ্যে ছিল আমি মন্দিরে যে শিক্ষা লাভ করেছিলাম তার উপর ভিত্তি করে এগিয়ে যাবার কৌশল। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রিয় শিষ্যকে শিখিয়েছিলেন যে, খুব পরিশ্রমের সংগে যোগ অভ্যাস করার চেয়ে আর অন্য বড় কোন কিছুই নেই। এই যোগরূপ "ঐশ্বরিক ভেলায় চড়ে অজ্ঞানতা ও জঘন্য কাজকর্ম পার হয়ে অনন্তকালীন স্বর্গ সুখে গিয়ে পৌঁছাতে পারা যায়। দশ বছর বয়স হবার আগেই আমার প্রাত্যহিক ধ্যানের সংগে আমি যোগাভ্যাসও করতাম। এই যোগাভ্যাসের মধ্যে থাকত বসার ভংগী, দমের ব্যায়াম ও ধ্যান। আমার কামরার সামনে আমি রাত ১২টা থেকে দেড়টা পর্যন্ত এসব করতাম। এই সময় যখন সবাই বিছানায় ঘুমিয়ে থাকত তখন আমি ভ্রুমধ্য দৃষ্টি অথবা মধ্যমা দৃষ্টি অভ্যাস করতাম। এই রকম মনোসংযোগের সংগে শ্বাসের ব্যায়াম আমাকে এমন সব স্থানের চেতনা দান করত যা আমার চার পাশের জগৎ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

যোগাভ্যাসের মধ্য দিয়ে আমি আত্মাদের উপস্থিতি অনুভব করতাম। সেই আত্মারা আমাকে পরিচালনা করত এবং মানসিক শক্তি

দিত। তাতে আমি বুঝতাম দেব-দেবতা সত্যিসত্যিই আছেন। স্কুলের ছেলেদের কোন যুক্তিই তা পরিবর্তন করতে পারবে না। অনেক সময় সত্য উপলব্ধির পরে আমি এমন উত্তেজিত হয়ে উঠতাম যে, তারপর যখন আমি বিছানায় যেতাম তখন আমার ঘুম আসত না। আমি ভাবতাম, যদি বড় মামা ও অন্যান্য হিন্দুদের যোগ ও ধ্যানের অভ্যাস করাতে পারতাম তাহলে তারা তাদের ধর্মের সত্যতা বুঝতে পারত। আমি একা নির্বাণে প্রবেশ করতে চাই না। গুরু হলেন এমন একজন শিক্ষক যিনি অন্যদেরও অনন্ত সুখের পথ দেখিয়ে দেবেন।

* * * * * *

"রবি, ও রবি!"

আমি তখন ঠাকুরঘরে একা শ্রীকৃষ্ণের ছোট মূর্তির সামনে বসে গভীরভাবে ও তালে তালে নিঃশ্বাস নিচ্ছিলাম এবং শ্রীকৃষ্ণের হাসির অনুকরণ করার চেষ্টা করছিলাম। সেদিনই সকালবেলায় আমার সংগে রেবতী মাসীমার আবার খুব ঝগড়া হ'য়েছিল, কিন্তু ঝগড়াটা কিভাবে আরম্ভ হয়েছিল তা মনে করতে পারছিলাম না। আমি ধ্যানের মাধ্যমে আন্তরিক শান্তি ফিরে পাবার চেষ্টা করছিলাম, কারণ বর্তমানে সেই শান্তি আমার কাছ থেকে যেন পালিয়ে গিয়েছিল। আমি আর দিদিমা বাড়ীতে একা ছিলাম বলে তাঁর ডাকে সাড়া দেবার আর কেউ ছিল না।

আমি চেঁচিয়ে বললাম, "কি দিদিমা?"

"নীচে যেন কে ডাকছে। গিয়ে দেখ কে ডাকছে?"

পরিবারের অন্য সবাই বাৎসরিক কার্তিক মাসের স্নানের উৎসব উপলক্ষ্যে সাগরপারে গিয়েছিল। ত্রিনিদাদের বেশীর ভাগ হিন্দু এই সময় আত্মিক শুচি হবার আশায় নদী, উপসাগর ও সাগরে স্নান করতে যায়। এই দিনটা পণ্ডিতদের জন্য বিশেষ দিন— তাঁরা এই সময় খুব ব্যস্ত থাকেন ও তাঁদের খুব লাভও হয়। তাঁরা স্নানার্থীদের জন্যে একের পর এক পূজা করেন, টাকা-পয়সা, উপহার এবং সকলের

দেওয়া খাবার জড়ো করেন। সেদিন ব্রাহ্মণদের খাওয়াতে পারলে ভাগ্য, অর্থাৎ কর্মের উন্নতি হয়। এই সব প্রথার উপকারিতা সম্বন্ধে আমি তখন সন্দেহ করতে শুরু করেছি। আমার মনে হত কোন কিছুতেই কর্মের পরিবর্তন হয় না— বিশেষভাবে কার্তিক স্নানে তো নয়ই। স্নানের পর শরীর শুকিয়ে গেলে এই সব হিন্দুদের মধ্যে অনেকেই ফিরে গিয়ে মাংস খাবে, আবার অনেকে তাদের স্ত্রীদের মারধর করবে অথবা গালাগালি দেবে। এই সব উৎসব মন্দ না, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যোগীদের জন্য এ সবই অর্থহীন। আমি তাই আমার মূল্যবান সময় কাটাবার জন্য আরও ভাল পথ বেছে নিয়েছিলাম।

"আচ্ছা দিদিমা, আমি যাচ্ছি।" এই বলে তখনই শ্রীকৃষ্ণকে খুব যত্নের সংগে তাঁর পবিত্র কাপড় দিয়ে জড়িয়ে সরিয়ে রেখে দিলাম। বারান্দায় বের হয়ে এসে শুনলাম কেউ একজন সামনের সিঁড়ির কাছে দরজায় ঘা দিচ্ছে। সেখান থেকে রেলিং ধরে নীচে তাকিয়ে দেখলাম একজন বুড়ো-মত ভারতীয় ভিক্ষুক মুখ তুলে আমার দিকে তাকাচ্ছে। আমি সেখান থেকেই জিজ্ঞাসা করলাম, "কি চাই?"

সে হাত তুলে আমাকে মিনতি করে বলল, "রুটি, বাবা রুটি!" আমি ভাবলাম সে "বাবা" ডেকে কি আমাকে সম্মান দেখাল নাকি গরীব হিন্দুরা বড়লোকদের অনুগ্রহ পাবার জন্য যেমন বলে থাকে তেমনই বলল? আমার মনের প্রশ্ন সরিয়ে দিয়ে তাকে হাত ইশারা করে ডেকে বললাম, "উপরে উঠে এস, আমি দেখছি কি আছে।" কেউ কখনও একজন ভিক্ষুককে বাড়ীর ভিতরে ডাকে না, কিন্তু লোকটির দুর্দশা দেখে আমি তাকে ভিতরে ডাকলাম। ভিক্ষা করা এমন একটা সম্মানজনক কাজ যার দ্বারা হিন্দুদের কর্মের উন্নতি করতে ভিক্ষুকেরা সাহায্য করে।

সে মাথা নেড়ে তার খালি পায়ের দিকে দেখিয়ে বলল, "এই অবস্থায় আমি উপরে উঠতে পারব না।"

"বেশ, তাহলে ঘুরে গিয়ে অন্য দরজার কাছে যাও" আমি আংগুল দিয়ে কোন দিকে যেতে হবে তা দেখিয়ে দিলাম। আর আমি

বারান্দা থেকে ঘরে ফিরে গেলাম।

লোকটিকে দেখে মনে হচ্ছিল সে জাতে চামার- অচ্ছ্যুৎ, অর্থাৎ যাকে স্পর্শ করা যায় না। তার গায়ের রং ভীষণ কালো, ব্রাহ্মণ হিসাবে আমি নিজেকে অপবিত্র করে ফেলব যদি সে আমার কাছে আসে। কিন্তু আমি যখন দেখলাম সে খুব কষ্ট করে লাঠির উপর ভর দিয়ে টল্‌তে টল্‌তে হোঁচট খেতে খেতে আসছে তখন সেই বুড়ো ভিখারীর জন্য আমার খুব মমতা হল। সে-ও তো একজন মানুষ। একথা ভেবে আমার বেশ ভাল লাগল। আমি দৌড়ে পিছনে সিঁড়িতে গিয়ে দরজাটার তালা খুলে দিলাম। আমি হেসে তাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বাড়ীর পিছন দিকে রান্নাঘরের নীচে খোলা জায়গাটায় তাকে নিয়ে গেলাম।

টেবিলের কাছে একটা চেয়ার দেখিয়ে তাকে বললাম "এখানে বস"। সে পালকহীন বড় বড় চোখ করে আমার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। তারপর একটা শ্বাস ফেলে ধপাস্ করে চেয়ারে বসে পড়ল। আমি তাকে হাত ধোওয়ার জন্য জল দিলে সেদিকে সে খেয়াল করল না। হয়তো ওটা দরকার বলেই মনে করল না। আমি তাকে ভালভাবে বললাম, "আমি তোমার জন্যে খাবার আনতে যাচ্ছি।" রান্নাঘরে খুঁজে দেখে সকাল বেলার কিছু খাবার দেখতে পেলাম। বেশ কতগুলো ছোটি ছোটি পাতলা রুটি ও মশলা দিয়ে ভাজা কিছুটা শাক পেলাম। আমি তার সামনে খাবারগুলো রেখে গভীর মনোযোগ দিয়ে সেখানে বসে তার খাওয়া দেখতে লাগলাম। সে ছিল একজন ভবঘুরে সাধু। দ্বীপের আমাদের অংশে এইরকম অনেক জনকে দেখা যায়। এরা তাদের সবকিছু ত্যাগ করে এইভাবে থাকে। অবশ্য ত্যাগ করার মত এদের প্রায় কিছুই থাকে না। তার মেটে রংয়ের লম্বা চুল আঁচড়ানো হয় না বলে ময়লায় জটা বেঁধে গেছে। আর তার দাড়ির মধ্যে লেগে আছে নানা রকম খাবারের অংশ যা সে ভিক্ষা করে খেয়েছে। তার পরণের ধূতি, যেটা হয়তো একদিন সাদা ছিল, কিন্তু এখন ময়লায় মেটে রং ধরেছে আর সামনের দিকে

লেগেছে তরকারী ও অন্যান্য খাবারের অসংখ্য দাগ। আমার চেয়ারটা আমি তার কাছ থেকে সরিয়ে নিলাম কারণ তার গা দিয়ে এমন দুর্গন্ধ বের হচ্ছিল যা সহ্য করা যায় না। তবু এই জঘন্য লোকটার জন্য আমার মায়া হচ্ছিল, আর সেকথা ভেবে আমার বেশ ভাল লাগছিল। এই মনোভাব আমার কর্মে সাহায্য হবে।

তাকে কথা বলবার জন্য আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "তুমি খুব দূর থেকে আসছ না?"

সে রাক্ষসের মত খাচ্ছিল তাই যে উত্তর আমি তার কাছ থেকে পেলাম তা হল ভুরু কুঁচকে তাকানো। এক টুকরো রুটি ছিঁড়ে সে শাকভাজা দিয়ে মুখ ভরে ভরে আংগুল চেটে চেটে খাচ্ছিল। বোঝা যাচ্ছিল সে পরম পরিতৃপ্তির সংগে খাচ্ছে। আমার মনে হল তার জন্যে আমি বোধহয় বেশী খাবার দিয়েছি– কিন্তু সে সবটা চেটে পুটে খেয়ে ফেলল। তারপর অনেকটা জল খেয়ে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আমার দিকে তাকিয়ে জোরে শব্দ করে ঢেকুর তুলল। পরে তার ধূতিতে মুখ মুছে অনেক দাগের মধ্যে তাতে আরও দাগ লাগিয়ে দিল।

তারপর সে হঠাৎ চেঁচিয়ে বলল, "পায়খানা!"

তার চোখ দুটো বের করে সে চারপাশে তাকাতে লাগল, মনে হল এক্ষুনি তার পায়খানায় যাওয়া দরকার। সে আমার কাঁধ ধরে চেয়ার থেকে নিজেকে টেনে তুলল। অর্দ্ধেক আমার উপর আর অর্দ্ধেক তার লাঠির উপর ভর দিয়ে সে চলতে লাগল। বাইরের ঘরে আমাদের একটা বাড়তি পায়খানা ছিল আমি তাকে সেটা দেখিয়ে দিলাম। সে কোনরকমে সেখানে ঢুকে আমাকে সেখানে অপেক্ষা করতে বলল।

সে স্থানীয় ত্রিনিদাদের ভাষায়, "আহা, উহু" করছিল বলে মনে হচ্ছিল তার অবস্থা ভাল নয়।

আমি অনিশ্চিতভাবে বললাম, "কি হয়েছে?"

"এখানে এস।"

আমি ইতস্তত: করে দরজাটা খুললাম, দেখলাম সে উঠতে

পারছে না। তার চোখ দু'টো যেন আমাকে উপহাস করতে লাগল। আমি নিঃশ্বাস বন্ধ করে নীচু হয়ে তার বগলের তলায় হাত দিয়ে তাকে সর্বশক্তি দিয়ে টেনে তুলবার চেষ্টা করলাম। সে জোরে জোরে ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ করতে লাগল কিন্তু নিজেকে তুলবার কোন চেষ্টা করল না। শেষে তাকে দাঁড় করানো গেল। সে এদিক-ওদিক টলতে টলতে তার লাঠির খোঁজ করতে লাগল। মনে হচ্ছিল সে কথা বলতে পারছে না। সে অস্পষ্ট ভাষায় হাত দিয়ে ইশারা করে আমাকে জানিয়ে দিল যে, সে নীচু হতে পারছে না। আমি লজ্জা পেয়ে নীচু হয়ে তার ধুতি উপর দিকে উঠিয়ে দিলাম। আমি অনেকক্ষণ নিঃশ্বাস বন্ধ করে ছিলাম, তারপর আর না পেরে সেই বিশ্রী গন্ধযুক্ত বাতাসে নিঃশ্বাস নিলাম। সে মাসের পর মাস বোধহয় স্নান করে নি। তবুও সে একজন মানুষ, তার বিরক্তিপূর্ণ দৃষ্টি ও অবন্ধুসুলভ আচরণ সত্ত্বেও আমি তাকে সাহায্য করতে চাইলাম। তাকে সাহায্য করতে পেরে মনটা বেশ ভালই লাগল। এইরকম অনুভূতি আমার অনেকদিন হয় নি।

সে নিজেকে পরিষ্কার করবে ভেবে আমি তাকে জলের কাছে নিয়ে গেলাম, কিন্তু সেদিকে তার কোন খেয়ালই নেই। সে বিরক্তিসূচক ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ করল আর তার চোখে যেন ঘৃণা উপ্‌চে পড়ছিল। সে উপরে ঠিক থাকলেও ভিতরে ভিতরে ঘৃণা পোষণ করছিল। আমাকে সে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে লাঠির উপর ভর করে আঘাত পাওয়া পশুর মত করে খোঁড়াতে খোঁড়াতে ফটকের দিকে এগিয়ে গেল।

সে পৌঁছাবার আগেই আমি আগে গিয়ে ফটকটা খুলে দিলাম। সে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগিয়ে এসে ফিরে আমার পায়ের উপর থুথু ফেলল। সে এই পর্যন্ত চুপ করে ছিল। কিন্তু তারপর হিন্দী ও ইংরিজিতে আমাকে জঘন্য ভাবে গালাগালি দিয়ে ঘৃণাভরে বলল যে, সে যা ত্যাগ করেছে আমি তা-ই ভোগ করছি। আমি ভাবছিলাম সে কি সত্যিই আমার যা আছে তা চায়? সে গরীব আর আমি ধনী বলেই কি আমাকে ঘৃণা করে? আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। আমি তার জন্যে

যা করলাম তার জন্য সে একটু ধন্যবাদও আমাকে জানাল না?

আমি যন্ত্রের মত ফটকটা বন্ধ করে তালা লাগিয়ে দিলাম। তখন আমার অবস্থা এমন যে, আমি কি করছি তা নিজেও জানি না। আমি বুদ্ধিহারার মত নিজেকে সম্পূর্ণভাবে পরিষ্কার করার জন্য সিঁড়ি দিয়ে উঠে বারান্দায় গেলাম। আমি যেন অসাড় হয়ে গেছি তাই আর ঠাকুরঘরে ধ্যান করার জন্য ফিরে গেলাম না। শ্রীকৃষ্ণের আশীর্বাদপূর্ণ হাসির কথা আমি সম্পূর্ণভাবে ভুলে গেলাম। আমার কামরায় ঢুকে হতাশ হয়ে বিছানার ধারে মাথা নীচু করে বসে পড়লাম। ভাবলাম সেই ভিক্ষুকটা ঠিক কথাই বলেছে— দারিদ্র্য আরও বেশী আত্মিক, কারণ ধন সম্পদ হল মায়াময় অজ্ঞানতার অংশ। যদি ধনসম্পদ মন্দ এবং কেবল মায়া তবে ধন ও উন্নতির দেবী লক্ষ্মী কেন আছেন? কেন তিনি দাদুকে এত টাকা-পয়সা দিয়ে পুরস্কৃত করেছিলেন? এখন দাদুর পাওয়া সেই সোনা কোথায়? তাহলে দেব-দেবীরা এবং তাঁদের সম্মানার্থে যে সব মন্দির তৈরী করা হয়েছে সে সবই কি কেবল বিরাট মায়ার অংশ?

আমি তখনও বিছানায় আমার মাথায় হাত দিয়ে বসে দুঃস্বপ্ন থেকে মুক্তি পাবার চেষ্টা করছিলাম এবং যে ধ্বংসকারী প্রশ্ন আমার মনে জেগেছিল তার সংগে বোঝাপড়া করছিলাম। এমন সময় পরিবারের আর সবাই খুশী মনে সাগর-কিনারা থেকে আত্মশুদ্ধি লাভ করে হাল্কা মনে ফিরে আসল।

১০
অজানা ঈশ্বর

কুইনস্ রয়েল কলেজের দ্বিতীয় বছরের শেষের দিকে স্কুলের ছুটি হলে আমি আমার সুমিত্রা মাসীমার খামার বাড়ীতে গেলাম। ছুটী হলেই আমি সেখানে কয়েক সপ্তা কটাতাম। তাঁর বাড়ীতে যেতে আমার খুব ভাল লাগত। আমি যেন রাজপুত্র সেইভাবে পরিবারের সবাই আমার সংগে ব্যবহার করত। সুমিত্রা মাসীমা আমার জন্যে সব কিছু করতে রাজী ছিলেন। তাঁর স্বামী খুব মদ খেতেন, কিন্তু তিনি একটু গম্ভীর ও মেটামুটি পরিশ্রমী ছিলেন। তিনি তাঁদের বিরটি জমিতে লাগানো কোকো গাছের দেখাশোনা করতেন। তাঁদের ছেলে আমার চেয়ে এক বছরের বড় ছিল। সে স্কুল চলাকালে আমাদের বাড়ীতে থাকত এবং আমার প্রিয় বন্ধুদের মধ্যে একজন ছিল।

মাসীমার অটিজন ছেলেমেয়ে ছিল, কিন্তু তাদের সংগ পাওয়ার চেয়ে আমার ভালো লাগত পাহাড়ী এলাকার নীরব সৌন্দর্যের দিকে তাকিয়ে থাকতে। পের্টি অফ্ স্পেনের গান-বাজনার আওয়াজ, মেটির সাইকেল, মেটিরগাড়ীর হর্ণ ও অন্যান্য যানবাহনের আওয়াজ থেকে দূরে সরে আসতে আমার খুব ভাল লাগত। আমি ভালবাসতাম প্রকৃতিকে! জগতের সংগে আমার একত্ববোধ আমার মনে এক রহস্যময় অনুভূতি জাগাত। ফলে আমি সমস্ত জীবিত প্রাণী, ফুটে থাকা চমৎকার বুনোফুল, নানা ধরণের কিচির মিচির করা অগুণতি পাখী, ঝড়বৃষ্টির পরে জলে ধোওয়া চক্‌মক্ করা গাছের পাতার সংগে কেমন যেন একটা একত্ব বোধ করতাম। আমার সংগে ওগুলোর কোন

পার্থক্য নেই, এমন কি, জংগলের মধ্যে দিয়ে যে সরু পথ চলে গেছে তার উপর দিয়ে চলা প্রাণীগুলোও যেন আমি। আমার অনেক জন্মের মধ্যে যেন ওরাও এক একটা জন্ম আর আমি যেন তাদের উচ্চতর অনুভূতি। মাসীমার বাড়ীর চারপাশের জংগলের মধ্যে দিয়ে আমি যখন অনেক দূর চলে যেতাম তখন আমার যে অনুভূতি জাগত তা হল সেই খামার বাড়ীর চারপাশটা যেন স্বর্গ। আমি ব্রাহ্মাণ আর এটাই আমার জগৎ যা আমার চিন্তায় গড়ে উঠেছে।

গরমকালের সেই কষ্টকর যাত্রার শেষে মাসীর বাড়ীতে পৌঁছেই আমি নীরবে পায়ে হেঁটে বের হয়ে পড়তাম। চমৎকার দৃশ্য ও অসাধারণ সব ফুল ও জীবজন্তু দেখে দেখে আমি উল্লাসিত হতাম। গভীর জংগলের মধ্যে একটা পাহাড়ের বেরিয়ে আসা অংশে দাঁড়িয়ে নীচের উপত্যকার জংগলের দিকে যখন তাকাতাম তখন দেখতাম গাছগুলোর রূপালী পাতাগুলো যেন কোকো গাছগুলোর উপর রাজকীয় চাঁদোয়া খাটিয়ে রেখেছে। দূরে আবাদী জমির অন্যদিকে লম্বা লম্বা বাঁশগাছগুলো বাতাসে এদিক-ওদিক দুলছে; দূরে ক্ষেতের দোলা লাগা আখগুলো কুয়াশায় প্রায় দেখাই যায় না। সেগুলো সবুজ গালিচার মত বিছানো রয়েছে যেন দিক চক্রবালে নীল সাগরের ছোঁওয়া পাবার জন্যে। আমার পিছনে তোতা, লম্বা লেজওয়ালা টিয়া আরও কত রকম, কত রংয়ের পাখী গাছের উপরে কিচির মিচির করে এগাছ থেকে ওগাছে একে অন্যকে যেন ভর্ৎসনা করছে।

আমার মনে হচ্ছিল যেন গোটা জগতটা একই গান গাইছে, একই জীবনের ধারা সবার মধ্যে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে, একই সুগন্ধ প্রকাশ করছে। সব কিছুর প্রত্যেকটি অনু, এমন কি সবচেয়ে ছোট যে জীবানু তা থেকে শুরু করে বৃহৎ সূর্য ঐ দূরের তারাগুলো একই উৎস থেকে যেন বের হয়ে এসেছে। সব কিছুই যেন সেই একই মহৎ এবং একমাত্র সত্যের অংশ। আমিও সব কিছুর সংগে মিশে আছি— আমরা সবাই ব্রহ্মার প্রকাশ। প্রকৃতি ছিল আমার ঈশ্বর ও আমার বন্ধু। সব জিনিষ ও প্রাণীর সংগে সার্বজনীন ভ্রাতৃত্বের এই মনোভাব আমাকে আনন্দে

উদ্ভাসিত করে তুলল।

"ওঁ নমঃ শিবায়ঃ—" এই গান গাইতে গাইতে আমার মনে হল প্রলয়কারী শিবকে কারো ভুলে যাওয়া উচিত নয়। তারপর ঘুরে আমি একটা কাঁকড়া বিছার মত ফুলকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছিলাম। তার ফ্যাকাশে, নরম রংকে উপভোগ করছিলাম। ভিতরের দিকের গভীর অবিশ্বাস্য ধরণের রং দেখে আমার মনে হল সে যেন অন্য এক জগতের দরজা আমাকে খুলে দিল। এমন সময় হঠাৎ আমার পিছনের ঝোপ থেকে হিস্ হিস্ শব্দ শুনে আমি চমকে উঠে তাড়াতাড়ি ঘুরে দাঁড়ালাম। ভীষণ ভয় পেয়ে দেখলাম একটা বিরটি সাপ তার মেটা দেহ নিয়ে সোজা আমার দিকে এগিয়ে আসছে। তার পুঁতির মত ছোটি ছোটি চোখ দু'টো স্থিরভাবে আমার চোখের দিকে তাকিয়ে আছে। আমি মোহাচ্ছন্ন হয়ে যেন আসাড় হয়ে গেলাম- চাইছিলাম দৌড়ে পালাতে কিন্তু নড়তেই পারলাম না। আর পালাবার কোন উপায় ছিল না। আমার পিছনে ছিল খাড়া পাহাড়ের কিনারা আর সামনে ছিল সাপটা। যদিও সেই বিশ্রী সরীসৃপটার গোখ্‌রো সাপের মত ফণা ছিল না, তবুও আমি অবাক হয়ে গেলাম শিবের গলায় যে বিরটি সাপটা জড়ানো থাকত তার সংগে এই সাপটার মিল দেখে এবং গভীর ধ্যানে মগ্ন হলে আমার যে রকম অনুভূতি হত তখন ঠিক সেইরকম অনুভূতি হল। ধ্যানমগ্ন অবস্থায় আমার মনে হত আমি যেন একটা অন্য জগতে শিবের পায়ের কাছে বসে আছি। তাঁর সংগী সেই গোখ্‌রো সাপটা হিস্ হিস্ শব্দ করে আমাকে ভয় দেখাত আর তার জিভ্ আমার দিকে বের করত। আগের সেই দর্শনের এখন যেন পরিপূর্ণতা হল। এই বার বিনাশকারীর হাত থেকে আমার আর রক্ষা নেই।

সাপটা আমার ধরা-ছোঁওয়ার মধ্যে এসে পড়ল। সে তার চওড়া, গোঁজের মত মাথাটা ঘাসের মধ্যে থেকে উঠিয়ে আমাকে আঘাত করার জন্য পিছন দিকে হেলিয়ে দিল। সেই ভয়ংকর ভয়ের মুহূর্তে অনেক দিন আগেকার বলা মায়ের স্বর যেন আমি শুনতে পেলাম। তিনি যেন সেখানে দাঁড়িয়ে সেই কথা আবার আমাকে বললেন যা

আমি একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম- "রবি, যখন তুমি ভীষণ বিপদে পড়বে, বাঁচবার আর কোন উপায় দেখতে পাবে না তখন আর একজন দেবতার কাছে তুমি প্রার্থনা কোরো। তাঁর নাম হল যীশু।"

আমি চিৎকার করে বলতে চাইলাম, "যীশু আমাকে বাঁচাও!" কিন্তু সেই চিৎকার আমার গলায় যেন আটকে গেল, প্রায় শোনাই গেল না।

কিন্তু আমি ভীষণ আশ্চর্য হয়ে দেখলাম যে, সাপটা তার মাথা মাটিতে নামিয়ে ফেলল এবং বিশ্রীভাবে ঘুরে খুব তাড়াতাড়ি সেই ঝোপের নীচে চলে গেল। যে পা দু'টো আমার থর থর করে কাঁপছিল এবং এতক্ষণ সব সময় মনে হচ্ছিল আমার ভার আর রাখতে পারছে না সে দুটো দিয়েই এখন আমি সাপটা যেখানে অদৃশ্য হয়েছিল সেই জায়গাটা অনেক দূর দিয়ে পার হয়ে হোঁচট খেতে খেতে ঘন জংগল পেরিয়ে ঘরমুখো রাস্তাটা ধরলাম। হাঁপাতে হাঁপাতে আমি ঘরে পৌছালাম। তখনও আমি ভয়ে কাঁপছিলাম আর সেই আশ্চর্য দেবতা যীশুর প্রতি কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হয়েছিলাম, কিন্তু তাঁর নাম উল্লেখ করতে ভয় পাচ্ছিলাম। আমি যে কি ভাবে রক্ষা পেয়েছি সে কথা আমার মাসতুতো ভাই শর্মাকে বলেছিলাম।

এই যীশু সত্যিই কে? একটা রহস্যের মত প্রশ্নটা প্রায়ই ঘুরে ফিরে আমার মনে জাগতে লাগল। আমার মনে পড়ল বড়দিনের সময় রেডিয়োতে তাঁর সম্বন্ধে অনেক গান গাওয়া হয়। তাহলে তিনি খ্রীষ্টানদের একজন দেবতা। কিন্তু আমি যখন ছেলেবেলায় খ্রীষ্টানদের দ্বারা পরিচালিত একটা প্রাইমারী স্কুলে পড়তাম তখন এই যীশুর বিষয় কিছু শুনেছি বলে তো এখন আমার মনে পড়ে না। হয়তো তখন আমি মন দিয়ে শুনি নি। কিন্তু যে কোন কারণেই হোক্ আমার এইটুকু মনে ছিল যে, প্রথম খ্রীষ্টানদের নাম আদম ও হবা আর একজনের নাম ছিল কয়িন যে তার ভাই হেবলকে মেরে ফেলেছিল।

যে অভিজ্ঞতা আমার হয়েছিল তা বেশ কয়েকদিন ধরে আমি চিন্তা করছিলাম। যীশু একজন বেশ শক্তিশালী ও আশ্চর্য দেবতা। কি

তাড়াতাড়ি তিনি উত্তর দিলেন! কিন্তু তিনি কিসের দেবতা? রক্ষাকারী? কেন আমার মা অথবা মন্দিরের সেই স্বামীজী আমাকে তাঁর বিষয় আরও শিক্ষা দিলেন না? আমি গোঁসাইকে জিজ্ঞাসা করনাম, কিন্তু তিনি এ বিষয়ে কিছুই জানতেন না। তা ছাড়া আমার প্রশ্ন শুনে তিনি অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন।

১১
"আর তুমি তা-ই!"

উচ্চ বিদ্যালয়ের পড়বার তৃতীয় বছরে আমার ভিতরে একটা অন্তর্দ্বন্দ্ব অনুভব করতে লাগলাম। সৃষ্টিকর্তা হিসাবে ঈশ্বর- চেতনার যে জগৎ তিনি সৃষ্টি করেছেন তা থেকে এটা আলাদা এবং স্পষ্ট। এই চেতনা আমি ছেটি থাকতেই আমার মধ্যে ছিল; কিন্তু হিন্দুধর্ম বলে সব কিছুই ঈশ্বর। সৃষ্টিকর্তা এবং তাঁর সৃষ্টি সব কিছু এক এবং সমান। এই দু'টি সামঞ্জস্যহীন ধারণার মধ্যে পড়ে আমি ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছিলাম। ব্রহ্মা সম্বন্ধে বেদ যা শিক্ষা দেয় তা আমি ধ্যানের মধ্যে দিয়ে যা অনুভব করি তাতে মিল আছে, কিন্তু অন্য সময় জীবন সম্বন্ধে আমার যে অভিজ্ঞতা তার সংগে মোটেই মেলে না। যোগ সাধনার আবেশে আমি সারা জগতের সংগে একত্ব বোধ করি; একটা পোকা, অথবা একটা গরু কিম্বা দূরবর্তী তারা থেকে আমি আলাদা নই। আমরা একই অস্তিত্ব থেকে সব কিছু গ্রহণ করছি। সব কিছুই ব্রহ্মা আর ব্রহ্মাও সব কিছু। "আর তুমি তা-ই!" বেদ এ কথা বলে সেজন্য ব্রহ্মাই হল আমার সত্যিকারের সত্বা, অর্থাৎ আমার অন্তর্স্থিত যে দেবতাকে আমি আয়নার সামনে বসে উপাসনা করি।

বেশ কয়েক ঘন্টা আবেশে থাকবার পর প্রাত্যহিক জীবনের মুখোমুখি হওয়া বেশ কঠিন মনে হয়। এ দুয়ের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব ও বিভিন্নতা ছিল তা সমাধান করা যায় না। ধ্যানের মধ্যে আমি যে উচ্চতর চেতনার অবস্থা অনুভব করি তা মনে হয় যা সত্যি তার দিকেই এগিয়ে দেয়। তবুও প্রতিদিনের জগতে রয়েছে সুখ-দুঃখ, আনন্দ-

বেদনা, জীবন-মৃত্যু, ভয়-নৈরাশ্য, রেবতী মাসীমার সংগে আমার বিবাদ এবং কুইন্‌স্‌ রয়েল কলেজে আমার ক্লাশের সংগীদের প্রশ্নের উত্তর না দিতে পারা। সেই সাধু লোকটি, যাঁর গায়ে গন্ধ, যিনি আমাকে গালাগালি দিয়েছিলেন, আর সেই ব্রহ্মচারী, যিনি প্রেমে পড়েছিলেন- এইরকম জগতের সংগে আমাকে যুদ্ধ করে চলতে হচ্ছিল। এগুলোকে আমি কেমন করে সবই মায়া বলে উড়িয়ে দেব? সত্যিকারের আলো পাওয়াকে যদি আমি পাগলামী বলি তবেই সব কিছুকে আমি মায়া বলতে পারব। আমার ধর্ম সুন্দর সিদ্ধান্ত নিতে পারে, কিন্তু প্রাত্যহিক জীবনে তা কাজে লাগাতে গিয়ে আমাকে ভীষণ বিপত্তির মুখে পড়তে হচ্ছে।

আমি চিন্তা করতে লাগলাম যে, তাহলে বিষয়টা হল আমার পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সংগে আমার অভ্যন্তরীণ দর্শনের বিরোধ। এটা যুক্তির বিষয়ও বটে। আসল যুদ্ধটা হচ্ছে ঈশ্বরকে নিয়ে দুই বিপরীতমুখী ধারণা। তাহলে ঈশ্বর কি যেমন ছিলেন তেমনই আছেন? অথবা তিনি কি একটা পাথর অথবা মানুষের অংশ না হয়েও থাকতে পারেন। সত্য যদি একই হয় তবে ব্রহ্মা একাধারে ভাল এবং মন্দ, মৃত্যু এবং জীবন, ঘৃণা এবং ভালবাসা। এতে তো সব কিছু অর্থহীন হয়ে পড়ে, জীবনটা হয় যুক্তিহীন। এতে মাথা ঠাণ্ডা রাখা খুব সহজ নয়। ভাল-মন্দ, ভালবাসা-ঘৃণা, জীবন-মৃত্যু সবই একই সত্যের অন্তর্গত। এ ছাড়া ভাল আর মন্দ যদি একই হয় তবে সব কর্মই সমান এবং যা-ই করা হোক্‌ না কেন তাতে কিছু যায় আসে না। তাহলে ধার্মিক হয়ে লাভটা কি? সবই যুক্তিহীন, কিন্তু গোঁসাই বলেন যুক্তির উপর বিশ্বাস করা যায় না, কারণ যুক্তি হল মায়ার একটা অংশ।

তাহলে বেদের শিক্ষামত যুক্তিও যদি মায়া হত তবে এই ধারণাকে আমি কি করে বিশ্বাস করব যে, ব্রহ্মাই একমাত্র সত্য আর সবই মায়া? আমার সব ধারণা ও যুক্তির উপর যদি নির্ভর করা না যায় তবে আমি যে পরম সুখের চেষ্টা করছি সেটাও যে মায়া নয় তার নিশ্চয়তা কোথায়? আমার ধর্ম মেনে নিতে হলে যুক্তিকে অস্বীকার করতে হবে।

তাহলে অন্যান্য ধর্ম? যদি সবই এক হয় তবে সেগুলোও তো আমার ধর্মের সংগে একই। কাজেই দেখা যাচ্ছে বিশৃঙ্খলাকে চরম সত্য হিসাবে দেবতার মত পূজা করতে হবে। আমার সব চিন্তা শক্তি যেন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছিল।

যোগ-সাধনা ছিল আমার একমাত্র আশা। গীতার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন এই যোগ-সাধনার দ্বারা সব অজ্ঞানতা দূর হয়ে যাবে এবং আমি বুঝতে পারব যে, আমি নিজেই ঈশ্বর। মাঝে মাঝে এই রকম আত্মদর্শন আমাকে চমকিত ও উত্তেজিত করে তোলে। আমি আত্মোপলব্ধির এত কাছাকাছি উপস্থিত হয়েছিলাম যে, নিজেকে ব্রহ্মা, যিনি সকলের প্রভু, সেই হিসাবেই দেখতাম, তবে সম্পূর্ণ নয়, প্রায় সেরকমই আমি নিজেকে নিজেই বলতাম, এ সবই সত্যি এবং এই ভান করতাম যে, আমি ঈশ্বর। কিন্তু সবসময় একটা দ্বন্দ্ব আমার অন্তরে লেগেই থাকত, একটা বিভ্রান্তি সাড়া দিয়ে উঠত। এই রকম একটা আদিম অজ্ঞানতা চিহ্ন হিসাবে আমার মনে কাজ করত এবং মাঝে মাঝে আমি মনে করতাম আমার বাবার মতই বুঝি আমি বিভ্রান্তি দূর করার প্রান্তে এসে পৌঁছেছি, কিন্তু সৃষ্টিকর্তা ও তাঁর সৃষ্টির মাঝখানে যে ব্যবধান রয়েছে তা কোনমতেই দূর করতে পারতাম না।

এইবার আমি চিন্তা করতে লাগলাম যে, সৃষ্টিকর্তাই হলেন আসল ঈশ্বর, হিন্দু দেবতারা নন, যাঁদের আমি আমার আবেশে থাকাকালীন দেখতে পেতাম। ক্রমশঃ আমার মনে হতে লাগল সত্যিকারের ঈশ্বর প্রেমিক ও দয়ালু, দেব-দেবতাদের নিয়ে যে ভীতি জন্মাত ঈশ্বর তেমন নন। এ দু'য়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ। এমন কোন হিন্দু দেব-দেবতা নেই যাঁর উপর আমি বিশ্বাস করে নির্ভর করতে পারি, কারণ তাঁদের একজনও আমাকে ভালবাসেন না। আমার মনে এই সৃষ্টিকর্তাকে জানার জন্য প্রবল আগ্রহ জন্মাল, কিন্তু তাঁর জন্য আমি তো কোন মন্ত্র জানি না। আমি নিজে নিজে যা বুঝেছিলাম তার দরুন আমার একটা অস্বস্তি বোধ হতে লাগল যে, আমি এই সৃষ্টিকর্তার কাছাকাছি উপস্থিত হতে পারছি না বরং দূরে সরে যাচ্ছি। আমি ব্রহ্মা,

এই বোধ যা আমি ধ্যানের মাধ্যমে পেতাম এবং তাতে যে শান্তি পেতাম তা আমার প্রাত্যহিক জীবনে স্থায়ী হ'ত না- বিশেষ করে যখন আমি রেবতী মাসীমার মুখোমুখি হতাম।

"রবি মহারাজ, কোথায় ছিলে এতক্ষণ?" বকুনির সুরে রেবতী মাসীমা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন। আজকাল আমার সংগে কথা বলতে হলেই তিনি এইভাবেই আমাকে সম্বোধন করতেন। আমি তখন ঠাকুরঘরে ঘন্টা দুই ধরে ধ্যান করছিলাম। মাসীমা তখন রান্নাঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন আর আমি ঠাকুর ঘর থেকে বের হয়ে তাঁর সামনে দিয়ে যাচ্ছিলাম। তিনি বললেন, "আমি যে তোমাকে সিঁড়ি ঝাড়ু দিতে বলেছিলাম তার কি হল?" ঠাকুরঘরে একা থেকে যে পরম শান্তি আমি অল্পক্ষণের জন্য অনুভব করেছিলাম তা তাঁর গলার স্বরে খান্ খান্ হয়ে ভেংগে গেল।

একজন ব্রাহ্মণের পক্ষে ঐরকম নীচু কাজ করা অচিন্তনীয় তবুও আমি উত্তর দিলাম, "আমি ঝাড়ু দিতে যাচ্ছি, আমার সংগে এত চিৎকার করে কথা বোলো না"।

"এ ছাড়া আর কিভাবে আমি তোমার মনোযোগ আকর্ষণ করব? তুমি তো সব সময় স্বপ্ন দেখছ আর অন্য জগতে বাস করছ।"

"তোমার জগতে থাকার চেয়ে ঐ জগতে থাকা ঢের ভাল।" কথাটা আস্তে বললেও তাঁর কানে যাবার মত করেই বললাম।

"মুখ সাম্‌লে কথা বল।"

আমি নীচু স্বরে বললাম, "আর তোমার মুখ?"

সিঁড়ি ঝাড়ু দিতে দিতে আমি মনে মনে বললাম, "গোটা দুনিয়ার প্রভু, তুমিও তো ব্রাহ্মণ। আমি যখন ধ্যান করি তখন তুমি আমার কাছে এত সত্যি হও, কিন্তু এখন ঝাঁটা হাতে আমার কাছে ...?

"এই রবি, দুপুরে খাবার পর আমরা সাগর-পারে যাচ্ছি, তুমি আমাদের সংগে যাবে?" আমার মাস্‌তুতো ভাই কৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করল। এর সংগেও আমার বেশী বনিবনা হত না। সে তার মায়ের প্রতি খুব অনুরক্ত ছিল। কৃষ্ণ বারান্দার টেবিল আর চেয়ারগুলো পরিষ্কার

করছিল। এখানেই কয়েকসপ্তা আগে আমি সেই ভিখারীটাকে খেতে দিয়েছিলাম। তার কথার উত্তরে আমি ঝাঁটাটা কাঁধের উপর রেখে অলসভাবে তার দিকে হেঁটে গিয়ে বললাম, "যেতে পারি, অবশ্য যদি মহারাণী আমাকে ছাদটাও ঝাড়ু দিতে না বলেন।" আমার গলার স্বরে কোন আগ্রহ ছিল না।

রেবতী মাসীমা তখন আমার কাজ পরীক্ষা করার জন্য নীচে নেমে আসছিলেন এবং আমার পিছনেই ছিলেন। তিনি বললেন, "মুখ সামলে কথা বল, রবি। আর তাছাড়া তুমি ফিরে আবার সিঁড়িটা ঝাড়ু দাও। সিঁড়িময় কালো কালো ধূলো এখনও রয়েছে।"

আমি বিরক্ত হয়ে উত্তর দিলাম, "বাতাসে আবার ধূলো উড়ে গেলে আমি কি করতে পারি? ঝাড়ু দেওয়ার সংগে সংগে কাছের চিনি-কল থেকে কালো ছাই উড়ে এসে পড়ছে।" ওটা যে আমার দোষ নয় সেটা তিনি ভালই জানেন।

তিনি বকুনি দিয়ে বললেন, "অলস কোথাকার, একেবারে ঠিক বাপের মত!"

তীব্র যন্ত্রণায় আমি কেঁপে উঠলাম, "আমার বাবার মত?" কেউ তাঁর বিষয় এরকম কথা বলতে সাহস করত না। বহু বছরের ঘৃণা এখন আমার মধ্যে আগ্নেয়গিরির মত জ্বলে উঠল। কাছেই পড়ে ছিল দাদুর বারবেল, যা দিয়ে দাদু ব্যায়াম করতেন। ওটা ঠিক জায়গাতেই পড়ে ছিল। এক পা এগিয়ে গেলেই ওটা আমার হাতে পাই। রাগে অন্ধ হয়ে আমি যে কি করছি তা আমি নিজেই জানি না। নীচু হয়ে এক পাশ ধরে আমি সেটা উঁচু করলাম। ক্রিকেট ব্যাটের মত ওটা হাতে তুলে নিয়ে মাসীমার মাথায় ছুঁড়ে মারব বলে ঠিক করলাম। ওটা ছুঁড়বার আগেই কৃষ্ণ দৌড়ে এসে অন্য পাশটা ধরে ফেলল। তখন আমার মোহভংগ হয়েছে এবং অসম্ভব শক্তিও চলে গেছে। তখন বারবেলটা আমার হাত থেকে ধপাস্ করে মাটিতে পড়ে গেল আর সেখানকার মেটা সিমেন্ট খানিকটা ভেংগে গুঁড়িয়ে গেল।

আমার মনে হচ্ছিল যেন অনন্তকাল ধরে আমার মাসীমার

ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া মুখের দিকে আমি তাকিয়ে আছি। তাঁর মুখ কিছু বলার জন্য খোলা অবস্থায় যেন জমে গেছে।

আমি তখন বাতাসে দোলা লাগা পাতার মত কাঁপছিলাম। আমার চোখ একবার সেই ভারী বারবেল পড়ে সিমেন্ট গর্ত হওয়া জায়গার দিকে পড়ছিল আর একবার পড়ছিল কৃষ্ণের দিকে। কৃষ্ণ আমার পিছনে আশ্চর্যান্বিত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তার গভীর নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছিল। তার চোখে-মুখে ভয়ের চিহ্ন। তারপর আবার আমি আমার মাসীমার ভীত সন্ত্রস্ত মুখের দিকে তাকালাম। এর পর আমার মনে আছে আমি জোরে জোরে কাঁদতে কাঁদতে দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গেলাম।

আমার ঘরে গিয়ে দড়াম করে দরজা বন্ধ করে খিল লাগিয়ে দিলাম। বিছানার উপর আড়াআড়ি ভাবে পড়ে আস্তে আস্তে ঘন্টার পর ঘন্টা কাঁদতে লাগলাম। যা এখনই ঘটে গেল তা যেন বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। আমার জগতটা যেন হঠাৎ ফুরিয়ে গেল। আমি আর কখনও আমার মাসীমার সামনে যেতে পারব না! অন্য কোন মানুষেরও মুখোমুখি হতে পারব না, কখনও না।

আমি অহিংসায় বিশ্বাস করি এবং গান্ধীর মত করে আমার হিন্দু বন্ধুদের কাছে তা প্রচার করি। আমি কঠোর নিরামিষ ভোজী, সেজন্য কোন প্রাণী হত্যা আমি করি না এবং এমন সাবধানে চলি যাতে কোন পিঁপড়া অথবা পোকার উপর আমার পা না পড়ে। তাহলে আমি কেমন করে ঐ ভারী বারবেলটা একটা হালকা গদার মত তুলে আমার মাসীমাকে মারবার জন্য আমার মাথার উপর ঘুরালাম? কোন ভার বোধ আমার হল না?

দুপুর রাতের পর সবাই ঘুমিয়েছিল এবং তখন আমার পরম সুখের অন্বেষণে বারান্দায় যোগাভ্যাস করার কথা। কিন্তু আমি চুপি চুপি আমার কামরা থেকে বের হয়ে রান্না ঘরের মধ্যে দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নীচের বারান্দায় গেলাম। অন্ধকারে হাঁতড়ে দেয়াল ধরে ধরে গিয়ে আমি বারবেলটা খুঁজে পেলাম। ওটা আমি যেখানে ফেলেছিলাম

সেখানেই পড়ে ছিল। একটা বিষয়ে আমাকে নিশ্চিত হতে হবে। তাই নীচু হয়ে দুই হাত দিয়ে বারবেলটা ধরলাম— এবারে ধরলাম মাঝখানে— তারপর নীচু হয়ে আমার সর্বশক্তি দিয়ে ওটা টানতে চেষ্টা করলাম কিন্তু সেটা নড়াতে পারলাম না, এক ইঞ্চিও না! ফোঁপাতে ফোঁপাতে আমি ঘুরে সিঁড়ির দিকে গেলাম।

আমার কামরায় ফিরে গিয়ে আমি আবার বিছানায় পড়ে মুখটা বালিশে চেপে নিঃশব্দে কাঁদতে লাগলাম। ঐ বারবেলটা পালখের মত তুলে নিতে কোথা থেকে ঐ বিস্ময়কর শক্তি আমার আসল? কেবল রাগ, ভয়ংকর রাগ এই কাজ করতে পারে না। তাহলে আমার ধ্যানের সময় কি কোন আত্মা আমার মধ্যে ঢুকেছিল? ঐ ভারী বারবেলটা যে তুলেছে সে নিঃসন্দেহে মন্দ। কিন্তু আমি তো ব্রহ্মার সংগে একাত্ম হতে চেয়েছিলাম। তাহলে কি তিনি যেমন ভাল তেমনই মন্দ, যেমন মৃত্যু তেমনই জীবন? তিনিই তো সব। শেষে কি আমি এটাই প্রমাণ করলাম? আমার সত্যিকারের আমি এ-ই, "আর তুমিও তা-ই"! মহাশক্তিযুক্ত এই মন্দ মুহূর্তের জন্য অধর্মের ছদ্মবেশ ধারণ করেছিলে? না, আমি তা বিশ্বাস করি না! যা ঘটে গেল তার জন্য আমি ভীত হলাম। কিন্তু আমি কি করে নিশ্চিত হব যে, এই মন্দ শক্তি আবার আমাকে দখল করে বসবে না? হয়তো পরের বার এর চেয়ে আরও দুঃখজনক ফলাফল নিয়ে আসবে।

এই প্রশ্ন আমাকে কষ্ট দিতে লাগল। এই দেব-দেবতা, আত্মা ও শক্তি কারা যাদের আমি ন্যাস, যোগ ও ধ্যানের মাধ্যমে ডেকে আনছি? এরা কি মন্দ, না কি ভাল, না কি দুই-ই— না কি সবই মায়া? আমি পাগলের মত এ সব থেকে কারণ বের করবার চেষ্টা করতে লাগলাম। কয়েকদিন ধরে আমি আমার ঘর থেকে বের হলাম না। আমাকে ভুলাবার অনেক চেষ্টা করা হল যাতে আমি কিছু খাই। শেষে আমি আবার জগতের মুখোমুখি হবার চেষ্টা করতে লাগলাম— সেই মায়ার জগৎ, যা সত্যি নয়, কিন্তু সেটাই আমাকে এত কষ্ট দিল— আমি সকলের সংগে খুব কমই কথা বলতাম। রেবতী মাসীমা ও আমি

একে অন্যকে এড়িয়ে চলতাম। বাড়ীর কোন কাজ করার জন্য আমাকে আর হুকুম করা হ'ত না। খুব অল্প সময়ের জন্যই আমি দিদিমার কাছে গিয়ে বসতাম কিন্তু তা আগের মত স্বাভাবিক ছিল না।

যাহোক, আমি যেমন ভেবেছিলাম তেমনি ভাবেই আমার জীবনের সেই বিশ্রী ঘটনাটা চাপা পড়ে গেল, কিন্তু একটা দূরত্বে যেন রয়েই গেল। রেবতী মাসীমা আর আমি যতদূর সম্ভব পরস্পরকে এড়িয়ে চলতাম, কিন্তু প্রয়োজন বোধে আমি তাঁর দিকে তাকাতাম এবং নেহাৎ প্রয়োজন হলে কথা বলতাম আর তিনিও বিদ্বেষ ভাব দেখাতেন না, অন্ততঃ বাইরে তো নয়-ই।

কিন্তু একটা বিষয় যেন আমাতে লেগে রইল যে, আমি নিজেকে আর ব্রাহ্মণ ভাবতে পারছিলাম না— একটা গভীর, অপ্রমাণযোগ্য অনিশ্চয়তা আমার মধ্যে জেগে রইল, সেটা হল ব্রাহ্মণ কে আর কি, আর সে সব দেব-দেবতার পূজা আমি করি তাঁরা কি সত্যিকারের দেবতাদের প্রতিমূর্তি আর আমিই বা কে? আমার নিজেকে বুঝাবার যে একটা লক্ষ্য ছিল তা আমার উন্নতির পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল।

১২
গুরু পূজা

"সব ভণ্ড! আত্মোপলব্ধির সব কথাই ভণ্ডামি ... আর তারা আরও স্বার্থপর হয়ে ওঠে!"

আমি দিদিমার ঘরের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ইতস্ততঃ করছিলাম। কথাগুলো বলছিলেন দেবনারায়ণ মামা। কিন্তু কথাগুলো তাঁর কথা বলে আমার মনে হচ্ছে না। আমি খুব দুঃখিত হলাম। আমার সামনে তিনি কখনও এইভাবে কথা বলতেন না। তাহলে তিনি কি আমার কথা বলছেন?

"কেন অনেক ভাল ভাল পণ্ডিতই তো আছেন। বাবা পণ্ডিতজীর কথা মনে কর," দিদিমা বললেন।

"তিনিও যে ভণ্ড না তা আমি কি করে জানব? সবাই ব্যবসা করে, বুঝেছ? 'ফেল কড়ি, মাখ-তেল', তারা কিছু না দিলে কিছুই করে না, কিচ্ছু না!"

বড় মামার ক্রুদ্ধ গলার স্বর আমাকে যেন ছুরি দিয়ে কটিল। আমি কখনও জানতাম না যে, তাঁর ভেতরে এতখানি বিদ্বেষ রয়েছে। তাহলে তাঁর গাড়ীটাকে আশীর্বাদ করার কথা কেন তিনি আমাকে বলেছিলেন? কেন তিনি আমাকে টাকা নেবার জন্য জোরও করেছিলেন?

"তুমি তো স্কুলে পড়াবার জন্য টাকা পাও। তাহলে পণ্ডিতেরা বিনা পয়সায় কাজ করবে কেন?"

"কিন্তু অনেক পণ্ডিত আছে যারা খুব ধনী! তারা অনেকে এত টাকা

পায়— বিশেষ করে গরীব লোকদের কাছ থেকে। সৌভাগ্য লাভের জন্যে কত পূজা করা হয়, কিন্তু কত জন তাতে জয়লাভ করে? ঐ পণ্ডিতেরা জানে যে, সবাই জয়ী হতে পারবে না, তবুও তারা সকলের কাছ থেকে টাকা নেয়। ঐ সব ভণ্ডেরা ধর্মের নামে ঐ সব করে, তা না হলে প্রতারণা করার দায়ে তারা জেল খটিত!"

"বেচারা পণ্ডিতেরা! তাঁরা আর কি করবেন? লোকে তাঁদের পূজা করতে বলে বলেই তো তাঁরা পূজা করেন।" দিদিমা বললেন।

"নিশ্চয়ই! ওটাই তো ওদের ব্যবসা। যখন বেশীর ভাগ লোক জয়ী হতে পারে না তখন পণ্ডিতেরা বলে তাদের পূর্বজন্মের কর্মের ফলেই তারা জয়ী হতে পারে নি। তারা নিশ্চয়ই এর আগের জন্মে কোন খারাপ কাজ করেছিল। মা, তুমি যদি বাবা পণ্ডিতজীর পূজার উপর নির্ভর ও বিশ্বাস করে থাক তবে তোমার স্বর্গে যাওয়ার আশা হবে ঐ রকম সৌভাগ্য লাভের মত!"

"চুপ কর। তুমি এত জোরে কথা বলছ যে, কেউ না কেউ শুনে ফেলবে।

"মনে হয় সারা জগৎ কথাটা শুনলে ভাল!" মামা একটু নীচু স্বরে বললেন।

আমার ধর্মের আসল জায়গায় হাত দেওয়াতে আমি যেন হতভম্ব হয়ে গেলাম। আমি পা টিপে টিপে সেখানে থেকে চলে গেলাম। ভেবেছিলাম বড় মামা বুঝি আমাদের হিন্দু ধর্মের দিকে মন ফিরিয়েছেন। তিনি যে ধর্ম সম্বন্ধে এ রকম ভাবেন আমি ঘুণাক্ষরেও তা জানতে পারি নি। তিনি যুক্তির শরণাপন্ন হতে চেষ্টা করছেন আর এরই বিরুদ্ধে তিনি একদিন আমাকে সতর্ক করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ধর্মের মধ্যে দিয়ে বিজ্ঞানে পৌঁছানো যায় না। তাহলে এখন আমার কর্তব্য হচ্ছে তাঁকে প্রতিদিন ধ্যান করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা। এ ছাড়া আর কোন মতেই কিছু করা যাবে না। শ্রীকৃষ্ণ ঠিক কথাই বলেছেন। কেউ যদি যোগাভ্যাস করে তবে কোন কিছুই তাকে নাড়াতে পারবে না।

সেদিন সকালে স্কুলে যাবার পথে বড় মামা অনেক অবাস্তব কথা বলতে লাগলেন। তিনি বললেন, যদি ত্রিনিদাদে প্রগতিশীল শিক্ষা দেওয়া হয় তবে কত পরিবর্তনই না সাধিত হবে। এটা তিনি বিশ্বাস করতেন। কোনমতেই তাঁর কথাগুলো আমি যোগাভ্যাসের দিকে ফেরাতে পারলাম না। আমি পরিষ্কারভাবে দেখতে পেলাম যে, আমরা দু'জনে যেন দুই মেরুতে বাস করছি। তিনি যে সমস্যার সমাধান করছেন তাকে আমি বলছি মায়া। বেদে ঐ সব সমস্যা নেই বলেই প্রমাণ করে এবং সেগুলোকে সম্পূর্ণভাবে মায়া বলেই মেনে নেয়। তিনি খুব উৎসাহের সংগে ত্রিনিদাদে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও প্রযুক্তিবিদ্যা সম্বন্ধে বলতেন যে, যদি ত্রিনিদাদ স্বাধীনতা পায়, তবে সে উন্নতিলাভ করবে। গুরুকে অন্তরে যে রকম জ্ঞানলাভ করতে হয় এবং শিষ্যদের তা শিক্ষা দিতে হয় সেই সম্বন্ধে এই রকম মানুষকে আমি কি বলব? গভীর ধ্যানের মধ্যে যে জগতকে আমি লাভ করি আর অন্য সময় যে জগতের মুখোমুখি আমাকে হতে হয় এই দুইয়ের মধ্যে যে মানসিক চাপ আমি অনুভব করি সেদিন সকালবেলা তাতে আমার ভেংগে পড়ার উপক্রম হল। আমার মনের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব চলছিল তা আমি বড় মামাকে বলতে পারছিলাম না- অন্ততঃ তখন পারছিলাম না। কাজেই তিনি যা বলছিলেন তা আমি চুপ করে ভাবছিলাম।

স্কুলে নানা জাতি ও ধর্মের ছেলেদের সংগে মিশে সাময়িক ভাবে আমার ভিতরের দ্বন্দ্বকে আমি ভুলে গিয়েছিলাম। স্কুলে আমি বাইরে বাইরে বেশ খুশীই ছিলাম ওখানে আমার বেশ কয়েকজন বন্ধুও জুটেছিল। ছেলেরা আর আমাকে ধর্মের বিষয়ে শক্ত শক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করত না। অন্যান্য ত্রিনিদাদীয় ছেলেদের মতই আমি ক্রিকেট ও ফুটবল খেলতে ভালবাসতাম যদিও তাতে অন্যান্য বিধর্মী ছেলেদের গায়ের সংগে আমার গা ঠেকত। এই সব বিধর্মী লোকদের কথা বেদে উল্লেখ নেই। এরা ছিল অস্পৃশ্য লোকদের চেয়েও নীচু জাতের। তাদের সংগে খেলতে খেলতে অনেক সময় হাত পা কেটে যেত। একদিন বিকেলের দিকে হঠাৎ একটা ঘটনা ঘটল। ফুটবল

খেলার সময় যখন মাঠের একদিক থেকে আর একদিকে আমি দৌড়াচ্ছিলাম তখন হঠাৎ আমার তলপেটে ভীষণ ব্যথা উঠল। কর্তব্যে রত শিক্ষক এবং ক্লাশের সংগীরা আমার চারপাশে জড়ো হল। আমি তখন ঘাসের চাপড়ার উপর ব্যথায় গড়াগড়ি দিচ্ছিলাম।

"কেউ তো তাকে ধাক্কা দেয় নি, কেমন করে ও পড়ে গেল? কি ব্যাপার?" একজন যখন আমাকে জিজ্ঞেস করল তখন আমি কোন উত্তর না দিয়ে কেবল কাতরাতে লাগলাম।

শিক্ষক বললেন, "ওকে ছায়ায় নিয়ে এস।" ব্যথার মধ্যেই আমি বুঝলাম আমাকে তোলা হল। তারপরে আমি আর কিছুই জানি না।

বড় মামার গাড়ীতে করে যাবার সময় আমি যেমন ব্যথা অনুভব করছিলাম, তেমনি কোথাও যাওয়াও বুঝতে পারছিলাম। ডাক্তারের অফিসে কথার আওয়াজ আমার কাছে ক্ষীণ হয়ে আসল। শেষ কথা যা শুনেছিলাম তা হল ডাক্তার বলেছিলেন, "আর কতক্ষণ পরেই ওর বৃহদন্ত্রের সংগে যুক্ত ক্ষুদ্র সরু নলটা (Appendix) ফেটে যেত।" বেশ কয়েক ঘন্টা পরে আমার জ্ঞান ফিরে আসল। আমি তখন হাসপাতালের একটা কামরায় পরিষ্কার একটা চাদর ঢাকা দিয়ে শুয়ে ছিলাম। আমার নাড়ীর কিছুটা কেটে বাদ দেওয়া হয়েছিল। তখনও আমার ব্যথাটা ছিল।

পরের দিন বড় মামা আমাকে দেখতে এসে বললেন, "রবি, তোমার খুব সৌভাগ্য, কারণ ডাক্তার বলেছেন খুব অল্পের জন্য তুমি বেঁচে গেছ।"

তৃতীয় দিনের দিন আমার বেশ ভাল লাগছিল। আমাকে উঠে নিজে নিজে পায়খানায় যাবার অনুমতি দেওয়া হল। কাজ শেষ হলে বিছানায় যাবার জন্য যখন আমি পায়খানার দরজাটা খুললাম তখন পেটের ডান দিকে একটা তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করলাম। কামরাটা যেন আমার সামনে ঘুরতে লাগল আর অন্ধকার হয়ে গেল। যাতে আমি জ্ঞান না হারাই সেজন্য পাগলের মত দরজার হাতলটা আমি ধরবার চেষ্টা করলাম কিন্তু খুঁজে পেলাম না। তখন আমার জংগলের মধ্যে

পাহাড়ের উপরে একটা পরিষ্কার জায়গার কথা মনে পড়ল যেখানে সাপ আমাকে ছোবল মারতে আসছিল, আর মনে পড়ল বেশ কয়েক বছর আগে আমার মা আমাকে যা বলেছিলেন সেই কথা।

আমি চিৎকার করে বললাম, "যীশু, আমাকে সাহায্য কর।"

আমি অনুভব করলাম একটা হাত যেন আমাকে ধরল। কিন্তু আমি তো জানতাম যে, পায়খানায় আর কেউ ছিল না। আমার ঘোর কেটে গেল এবং কামরাটারও ঘোরা বন্ধ হয়ে গেল। চোখে আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম। আমার ব্যথা সম্পূর্ণভাবে দূর হয়ে গেল এবং তার জায়গায় আমি আশ্চর্যভাবে ভাল হয়ে গেলাম ও দেহে শক্তি পেলাম।

বিছানায় ফিরে গিয়ে আমি অনেকক্ষণ স্থির হয়ে শুয়ে রইলাম আর যা ঘটে গেল তা বুঝবার চেষ্টা করতে লাগলাম। ব্যাপারটা বিশ্বাস করা যায় না অথচ সত্যিই তা ঘটেছে। অদ্ভুত একটা শান্তভাব আমার কামরায় বিরাজ করছিল। তারপর আমি গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হলাম। জেগে উঠে দেখলাম আমার বিছানার পাশে কে যেন একটা খ্রীষ্টানদের পুস্তিকা রেখে গেছে। এর আগে ওটা আমি কখনও দেখি নি। ওটা লিখেছেন অসওয়ালড্, জে, স্মিথ্। অবশ্য ঐ নাম আমি কখনও শুনি নি। পুস্তিকাতে লেখা ছিল একজন যুবক কি করে খ্রীষ্টের অনুসরণকারী হয়েছিল। এতে আমার মনে একটা আলোড়ন সৃষ্টি হলেও হিন্দু জগতের সব কিছু এমন ভাবে ভীড় করে এল যে, আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না। যীশুকে আমি খুব তাড়াতাড়িই ভুলে গেলাম। অনেক দেব-দেবতাকে আমার ঠিকভাবে পূজা করতে হত। কাজেই আরও একটা তার সংগে যোগ দেওয়ার অর্থ হল আমার বোঝা বাড়ানো। কোন্ দেবতাকে আমার বেশী করে পূজা করা উচিত আমি সেই সমস্যায় পড়তাম। আমি তাদের সবাইকে ভয় করতাম, তাই আমি বেশী মনোযোগ দিয়ে শিব আর শ্রীকৃষ্ণের পূজা করতাম।

প্রতিদিন সন্ধ্যেবেলা স্কুল থেকে ফেরার পর আমার পবিত্র জায়গা, অর্থাৎ ঠাকুরঘরে আমি সময় কাটাতাম। ঠিক সন্ধ্যে ৬টায়, আমি যেন জীবন সৃষ্টি করছি এই রকম অনুভূতি নিয়ে, বেদীর দ্বিতীয়

ধাপের মাঝখানে ভাব গাম্ভীর্যের সংগে 'দেয়া' (প্রদীপ) জ্বালাতাম। ধ্যান ও দেবতাদের বিষয় গভীরভাবে চিন্তা করবার জন্য পদ্মাসন করে বসবার আগে আমি এই ভাবে আরতি করতাম— বাঁ হাতে একটা ছোটি ঘন্টা থাকত আর ডান হাতে থাকত পিতলের বড় থালা। সেই থালার মাঝখানে সেই জ্বালানো প্রদীপটা থাকত আর প্রদীপের চারপাশে থাকত অনেক টটিকা ফুল। সেই থালা আমি প্রত্যেক দেব-দেবীর সামনে তিনবার করে ঘড়ির কাঁটার মত করে ঘুরাতাম আর উপযুক্ত মন্ত্র বলতাম। একদিন সন্ধ্যেবেলা একটা ভীষণ ব্যাপার ঘটল। শিবের চারপাশে আরতি করবার সময় আমার হাতের কনুই হঠাৎ শ্রীকৃষ্ণের গায়ে লেগে সেটা বেদী থেকে নীচে মাটিতে পড়ে গেল!

আমি ভীষণ ভয় পেয়ে সেই ছোট্ট পিতলের মূর্তিটা মাটি থেকে তুলে তাঁর গায়ে হাত বুলাতে বুলাতে লক্ষ্য করলাম পড়ে যাওয়ার দরুণ বাঁশীশুদ্ধ তাঁর একটা হাত বেঁকে গেছে। আমি ভীষণ ভয় পেয়ে গেলাম। শ্রীকৃষ্ণের মূর্তিটাকে আমি বুকে চেপে ধরলাম। আর খুবই দুঃখের সংগে বলতে চাইলাম যে, আমি এজন্যে কত দুঃখিত! আমি জানতাম যে, কোন ক্ষমা প্রার্থনাই গ্রাহ্য করা হবে না। ক্ষমা বলতে সেখানে কিছু নেই। কর্মের অপরিবর্তনীয় নিয়মে ক্ষমা নেই। আমার পরজন্মে আমাকে তার শোধ দিতে হবে। কি জানি, হয়তো এজন্মেই তার শাস্তি হবে— কারণ এ রকম জঘন্য অপরাধ যে কত বেশী তা আমি ধারণাও করতে পারছিলাম না। এর শোধ যে ভয়ংকর হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু ঐ ছোট্ট মূর্তিটার ভিতরে যদি অতখানি শক্তি থেকে থাকে তবে ওটা অত সহজে পড়ে গেল কেন? ঐ ছোটি ছোটি মূর্তিগুলোর অক্ষমতা দেখে তাদের প্রতি যে ভয় আমার ছিল তা হাস্যকর মনে হল।

আমার প্রশ্নের উত্তর না পাওয়া এবং অন্তর্দ্বন্দ্ব থাকা সত্বেও আমি যখন জেগে থাকতাম অথবা বাড়ীতে দেওয়া স্কুলের কাজ করতাম না- যদিও তা খুব কমই করতাম— আমি অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে আমার ধর্মীয় কর্তব্য- কাজ করতাম। আমি কেবল এই আশা করতাম

যে, আমার বিশ্বস্ততা গ্রাহ্য করা হবে ও পুরস্কৃত করা হবে, যদিও আত্মোপলব্ধি এখন আমার কাছে আশা করার চেয়ে স্বপ্নের মত মনে হচ্ছে। আমি আগের মতই ধ্যান করতাম এবং সেই আবেশে থাকার সময় স্বর্গীয় গান-বাজনা শুনতে পেতাম, অসাধারণ রং দেখতাম, আধ্যাত্মিক ভ্রমণ করতাম ও নানা আত্মার সাক্ষাৎ পেতাম। কিন্তু আমি যে ব্রাহ্মণ, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের প্রভু এবং নানা আকার প্রাপ্ত আমার বিশাল মন যা আমাকে এতকাল উত্তেজিত করেছে তা এখন আমাকে বিফল করে দিল। এই জীবনে মোক্ষলাভ করা একটা অসম্ভব ব্যাপার বলে মনে হল। আমার ভয় হল যে, মোক্ষ লাভ করার জন্য আমাকে আরও অনেকবার জন্মগ্রহণ করতে হবে— কতবার তা জানি না। তাহলে ভবিষ্যৎ কেন এত অনিশ্চিত?

আমার বাবা যে কার্য সম্পাদন করেছিলেন তা ভয়ংকর বলে মনে হল। তিনি নিশ্চয়ই একজন 'অবতার' ছিলেন আর এটা খুবই স্পষ্ট যে, আমি তা নই। আমি নিজেকে একজন মস্ত বড় গুরু বলেই মনে করতাম, আর অনেকের চোখে আমি তা-ই ছিলাম। কিন্তু এটা ঠিক যে, আমি এই জীবনে নির্বাণ লাভ করতে পারব না। তা যদি এই জীবনে না-ই হয় তবে পরজন্মে আমার লক্ষ্য ছিল আমি যেন গরু হয়ে জন্মাই, কারণ গরু হল প্রাণীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু এখন আমার সে চিন্তাও ভেংগে খান্ খান্ হয়ে গেল। কোন কিছুরই নিশ্চয়তা নেই। আমার এ সব সন্দেহ কিন্তু কারও কাছে প্রকাশ করতাম না। বাইরে আমি আগের মতই আমার ধর্ম সম্বন্ধে নিশ্চিত, কারণ হিন্দুদের কাছ থেকে যে সম্মান আমি পাচ্ছিলাম তা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছিল।

উচ্চ বিদ্যালয়ে আমার তৃতীয় বছর পড়ার শেষে দিদিমা আর রেবতী মাসীমা আমাদের বাড়ীতে একটা বিশেষ পূজার জন্য প্রতিবেশী ও আত্মীয়দের একটা বিরাট দলকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। যাঁরা আসছিলেন তাঁরা সম্মানের সংগে আমাকে প্রণাম করার জন্য এবং আমার বাবার মহত্বের কথা স্মরণ করে এগিয়ে আসছিলেন। ঘর ভরতি হতে থাকলে তাঁদের মন্তব্য এখানে-সেখানে শোনা যাচ্ছিল এবং

তাঁদের চোখে আমি শ্রদ্ধা মিশ্রিত ভক্তি দেখতে পাচ্ছিলাম। তাঁরা বলাবলি করছিলেন যে, আমি একজন যোগী, আমাদের শহরের সুখ্যাতি আমিই নিয়ে আসব এবং একদিন গুরু হিসাবে আমার অনেক শিষ্য হবে। এই রকম শ্রদ্ধা-ভক্তি পেয়ে আনন্দে আমার ভিতরের দ্বন্দ্ব একেবারে চলে গেল। তখনও আমার বয়স ১৫ পার হয় নি তবুও হিন্দুদের মধ্যে এখনই আমার এত প্রতিপত্তি দেখে কয়েকজন পণ্ডিতের মনে হিংসা জেগেছিল। এই ভেবে আমার খুব ভাল লাগল যে, আমার বড় মামা যে সব ভণ্ড পণ্ডিতদের ঘৃণা করতেন আমি তাদের দলে নেই। ত্রিনিদাদের সমস্ত হিন্দু যাঁকে নেতা বলে গ্রহণ করেছিল সেই বাবা পণ্ডিত জানকী প্রসাদ শর্মা মহারাজ, যিনি ছিলেন আমার আত্মিক পরামর্শ দাতা, তিনি অত্যধিক বিস্তারিত সেই পর্বের কাজ সমাধা করছিলেন। বেশ অহংকারের সংগে আমি তাঁকে সাহায্য করছিলাম। এটা ছিল আমার জন্যে একটা বিরাট সুযোগ।

আমার গলায় ছিল সুগন্ধযুক্ত ফুলের বড় একটা মালা। বেদীর কাছে দাঁড়িয়ে মালার উপর হাত রেখে উৎসব শেষে আমি সকলকে বিদায় জানাচ্ছিলাম। একজন প্রতিবেশী কতগুলো টাকা একটার পর একটা আমার পায়ের কাছে রাখল এবং আমার আশীর্বাদ পাবার জন্য আমাকে প্রণাম করতে নীচু হল। প্রত্যেক উপাসনাকারী শক্তিপথের আকাঙ্খা করত কারণ তার ফল ছিল অলৌকিক। আমাদের এই প্রতিবেশীকে আমি চিনতাম। একজন বিধবা মহিলা,— ঘন্টার পর ঘন্টা পরিশ্রম করে তিনি অল্পই আয় করতেন। যে দান তিনি আমাকে দিলেন তা তাঁর একমাসের আয়েরও বেশী। ব্রাহ্মণকে দান করার প্রথা দেবতারাই ঠিক করে দিয়েছেন আর বেদে আছে এ জন্যে দাতার অনেক উপকার হয়, তবে আমি নিজেকে কেন অপরাধী বলে মনে করছি? এই বিষয়ে বড় মামা যে বিষ উদ্গার করেছিলেন তা স্পষ্টভাবে আমার মনে পড়ল, "এটা তাদের সকলের ব্যবসা, তারা টাকা না নিয়ে কিছুই করে না— বিশেষ ভাবে গরীবদের কাছ থেকে!" আমি অসহজভাবে তাঁর দেওয়া অল্প দানের দিকে

তাকালাম।

অবশ্য এর বদলে আমার অনেক কিছু দেবার ছিল। তাঁর কপাল ছুঁয়ে আশীর্বাদ দেবার জন্যে হাত বাড়াতেই সর্বশক্তিমানের নির্ভুল কর্তৃত্বের একটা স্বর শুনে আমি চমকে উঠলাম, "রবি, তুমি তো ঈশ্বর নও!" আমার হাত মাঝপথেই যেন অসাড় হয়ে গেল। "**তুমি— তো— ঈশ্বর—নও।**" বড় ছুরি দিয়ে লম্বা, সবুজ আখ কাটার মত করেই সেই কথাগুলো আমাকে আঘাত করল।

আমি তখনই বুঝতে পারলাম সেই সত্য ঈশ্বর, সকলের সৃষ্টি-কর্তাই ঐ কথাগুলো বলেছেন। আমি কাঁপতে লাগলাম। ঐ নীচু হয়ে থাকা স্ত্রীলোককে আশীর্বাদ করার ভান করা মানে প্রবঞ্চনা করা, ছলনা করা। আমি হাত টেনে নিলাম। আমি খুব ভাল করেই জানি অনেক চোখ আমাকে দেখছে আর ভাবছে। আমি বুঝতে পারলাম আমাকে সত্যিকারের ঈশ্বরের পবিত্র চরণে পড়ে তাঁর ক্ষমা ভিক্ষা করতে হবে— কিন্তু এই সব লোকের কাছে আমি কি করে তা ব্যাখ্যা করব। আমি হঠাৎ ঘুরে ভীড় ঠেলে সেখান থেকে চলে গেলাম।
সেই গরীব স্ত্রীলোকটি হতভম্ব হয়ে আমার যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে রইলেন। আমি সোজা আমার কামরায় গিয়ে দরজা বন্ধ করলাম, কাঁপা কাঁপা হাতে গলা থেকে মালাটা ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে বিছানায় পড়ে কাঁদতে লাগলাম।

দিদিমা আমাকে চলে যেতে দেখলেন এবং মমতার চোখে আমার দিকে চেয়ে রইলেন। এই মমতা পাবার কোন অধিকার আমার নেই। আমি তাঁর সংগে প্রায় এক মাস কথা বলি নি। আমার মাসীমার সংগে রাগ করে তর্ক করার জন্য তিনি আমাকে মিষ্টি ও নরম সুরে বকুনি দিয়েছিলেন। সেটা স্পষ্টই আমার দোষ ছিল; আমি লজ্জাজনক ভাবে গোটা পরিবারের সামনে আত্ম ধার্মিকতার গর্ব দেখিয়েছিলাম। দিদিমা আমাকে ক্ষমা চাইতে বলেছিলেন কিন্তু তা আমি চাই নি বরং তাঁর কামরা থেকে চেঁচিয়ে বলেছিলাম আমি তাঁর সংগে কখনও কথা বলব না। ফল বা অন্যান্য উপহার দিয়ে তিনি আমার মাসতুতো

ভাইবোনদের আমার কাছে পাঠালে আমি তা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করতাম। এখন সেই সব তিক্ত স্মৃতি মনে এসে আমার যেন শ্বাস বন্ধ হবার উপক্রম হল। এখন সত্য ঈশ্বরের ভর্ৎসনা শুনে, বিবেকের দংশনে আমার মনে হতে লাগল আমি এতদিন সেই সব উপাসনা গ্রহণ করেছি যা ছিল সেই সত্য ঈশ্বরের পাওনা। আমার গর্বের জগৎ যেন দুমড়ে মুচড়ে পড়ল।

এই ঈশ্বরকে এখন আমি বলতে চাইলাম এতদিন আমি আমার দিদিমা, মাসীমা ও আরও অন্যান্য অনেকের সংগে যে ব্যবহার করেছি তার জন্য আমি দুঃখিত আর সব চেয়ে বেশী দুঃখিত লোকদের যে উপাসনা কেবল তাঁরই পাওনা ছিল তা এতদিন চুরি করে আমি গ্রহণ করেছি। কিন্তু আমি তো জানি না কেমন করে তাঁকে ডাকতে হয়। তাছাড়া কোনভাবেই কোন ক্ষমা আমি পাব না। কর্মের ফল অনুসারে আমার পাওনা আমাকে পেতেই হবে। যে অন্যায় আমি এতদিন করে এসেছি তার ফল এর পরের জন্মে আমার পাওনা রয়েছে। আবার ব্রাহ্মণ হয়ে জন্ম গ্রহণ করার জন্য হয়তো আবার হাজার হাজার বার জন্ম নিতে হবে— লক্ষ লক্ষ বারও হতে পারে। এই পর্যন্ত ফিরে আসার জন্য কেমন কষ্টকর পথ আমাকে অতিক্রম করতে হবে তা কে বলতে পারে?

ভবিষ্যত কতখানি জঘন্য হবে সে কথা ভাবার চেয়ে বর্তমানটাই আমার কাছে আরও বেশী কষ্টকর মনে হল। আমি আর কোন মানুষের পূজা কখনও গ্রহণ করতে পারব না, কিন্তু লোকে তো আমার কাছ থেকে তা-ই আশা করবে। কি করে আমি এসব এড়িয়ে যাব? যারা এতদিন আমাকে উচ্চাসনে বসিয়ে রেখেছে আমি কোন সাহসে তাদের কাছে স্বীকার করব যে, আমি একজন চোর? যিনি আমাদের সকলের উপরে তাঁর গৌরব এতদিন আমি চুরি করে এসেছি? আমার কামরা ছেড়ে আর কখনও আমি হিন্দু সমাজের লোকদের সামনে যেতে পারব না। আমি যদি বলি কোন মানুষই ঈশ্বর নয় এবং কোন মানুষই পূজা পাবার উপযুক্ত নয় তবে তারা আমার কথা বিশ্বাস করবে না। যে

কষ্টকর সত্য আমি আমার সম্বন্ধে জেনেছি তা আমি কেমন করে তাদের বলব? এতে আমি খুবই লজ্জা পাব। কিন্তু এই রকম মিথ্যা জীবনও আমি আর কাটাতে পারব না। কেবলমাত্র একটা পথ খোলা আছে— তা হল আত্মহত্যা করা। বার বারই আমি সেই একই উপায় দেখতে পাচ্ছি। রেহাই পাবার একমাত্র পথই হল ওটা। এর ফল পরজন্মে কি হবে তা আমি কেবল ধারণা করতে পারি কিন্তু তার চেয়েও ভয়ের ব্যাপার হল বর্তমান।

যন্ত্রণায় দিনের পর দিন আমি আমার কামরার মধ্যে বন্ধ হয়ে রইলাম, জল বা খাবার কিছুই খেলাম না। কখনও হাঁটাহাঁটি করি, কখনও হাত মোচড়াই, কখনও ক্লান্ত হয়ে বিছানায় পড়ে অল্পক্ষণের জন্য ঘুমিয়ে যাই, আবার হাঁটাহাঁটি করি, কখনও বা বিছানার কিনারায় দু'হাতে মাথা চেপে ধরে বসে থাকি। মাঝে মাঝে আমি কেঁদে কেঁদে ভাবি আমার জন্ম না হলেই ভাল হত, আবার নিজের জন্য দুঃখ বোধ করি। আমার জীবনে এত ভুল হয়েছে! বাপ-মায়ের ভালবাসা ও যত্ন আমি পাই নি। আমার বাবা আমার সংগে কোনদিন কথা বলেন নি। আমি ছোট থাকলেই তিনি মারা গেছেন। আট বছর হল আমি মাকে দেখি নি। আমার ঠাকুরদাদা, ঠাকুরমা ও দাদামশাইকে আমি হারিয়েছি; কেবল বেঁচে আছেন আমার দিদিমা। আর এতদিন আমার কর্ম ভাল বলে আমি অহংকার করেছি। কিন্তু তা এত খারাপ কেন? আমার গত জন্মের জন্য আমার এ জন্মে এত শাস্তি কেন? গত জন্মের কথা আমার তো কিছুই মনে নেই। গত জন্মের কথা আমি খুব মনে করবার চেষ্টা করতাম এবং মাঝে মাঝে মনে পড়ার ভান করতাম।

সেই দিনগুলোতে একা একা থেকে এ জীবনে আমার যা কিছু ঘটে গেছে সে সব মনে করছিলাম, আর আমি যে কেমন অন্ধ ছিলাম তা ভেবে আশ্চর্য হচ্ছিলাম। কেমন করে একটা গরু অথবা সাপ ঈশ্বর হতে পারে? কিম্বা আমি কেমন করে ঈশ্বর হতে পারি? সৃষ্ট জিনিষ কেমন করে সৃষ্টি করতে পারে? ঐশ্বরিক অস্তিত্ব থেকে কেমন করে সব কিছু

হতে পারে? মানুষ ও জিনিষের মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে তা আমি অস্বীকার করতে পারি না। এ বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণ ও বেদ যা-ই বলুক না কেন। আমি আর আখ যদি একই বস্তু দিয়ে তৈরী হয়ে থাকি তাহলে তো আমাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই— এটা আমার কাছে উদ্ভট বলে মনে হল।

আমার ধ্যানের মধ্যে যে আমি সব জিনিষের ভিতরে ঐক্য দেখতে পেতাম তা এখন আমার কাছে অসম্ভব বলে মনে হল। বুঝলাম অহংকার আমাকে অন্ধ করে রেখেছিল। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের প্রভু হবার আকাঙ্খা আমার এত বেশী ছিল যে, স্পষ্ট মিথ্যাকেও আমি সত্যি বলে ভাবতাম। এর চেয়ে শয়তানি আর কি হতে পারে? এটা সব চেয়ে খারাপ ধরণের ভণ্ডামি।

দিনের পর দিন যে আমি আত্মোপলব্ধির কিনারায় এসে পৌঁছেছি বলে মনে করতাম সেই আমি এখন নিজেকে দোষী মনে করে নত হতে লাগলাম। আমার মনে পড়ল কত সিগারেট আমি চুরি করেছি, কত মিথ্যা কথা বলেছি, গর্বিত ও স্বার্থপর জীবন কাটিয়েছি, আমার মাসীমা ও অন্যান্যদের কত ঘৃণা করেছি। কত বার ভেবেছি মাসীমা মরে গেলে ভাল হ'ত অথচ সেই আমিই অহিংসা সম্বন্ধে প্রচার করেছি। যদি কোন ভাল দাঁড়িপাল্লা দিয়ে আমার ভাল ও মন্দ কাজ ওজন করা যেত তবে আমি জানি মন্দটাই ভারী হ'ত। পুনর্জন্মের কথা ভেবে আমি কেঁপে উঠলাম, কারণ আমি জানি, আমার কর্মই আমাকে মইয়ের নীচে ফেলে দেবে। আমি সেই সত্য ঈশ্বরকে পেতে চাইলাম যাঁর কাছে আমি বলতে পারি যে, আমি কত দুঃখিত— কিন্তু তা করে কি হবে, কারণ কর্ম তো আর বদলানো যাবে না। আবার মনে হল হয়তো তিনি আমার প্রতি দয়া করবেন। এখন আমার ভয় হতে লাগল যে, এতদিন আমি আধ্যাত্মিক ভ্রমণে এবং আত্মাদের দর্শনে নিজেকে বিজয়ী মনে করতাম কিন্তু ঈশ্বরকে জানার একমাত্র পথ যা আমার জানা আছে সেটা হল যোগ-সাধনা। আমার ধর্ম, আমার শিক্ষা, ধ্যানের অভিজ্ঞতা— এ সবই আমাকে শিক্ষা দিয়েছে যে, আত্মো-

নুসন্ধান করলে সত্য জানা যায়। কাজেই আমি সেই পথ ধরলাম। নিজেকে অনুসন্ধান করা আমার মিথ্যা হয়ে গেল। ঈশ্বরকে খুঁজে পাওয়ার পরিবর্তে আমি মন্দের বাসাকে যেন নাড়া দিলাম আর তাতে আমার অন্তরের জঘন্যতা বেরিয়ে পড়ল। আমার দুঃখ আরও বেড়ে গেল। আমার অন্যায়ের অনুভূতি ও লজ্জার বোঝা এমন হল যা আমার পক্ষে সহ্য করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল।

এই ঈশ্বরকে যদি আমি সহসা খুঁজে না পাই তবে আমার আত্ম-হত্যা করা ছাড়া আর কোন পথ নেই। এই রকম কাপুরুষতার কাজ করলে হয়তো ভবিষ্যতে তার জন্য ভয়ংকর ফলভোগ করতে হবে, কিন্তু তাতেও আমি পিছ্‌পা হব না। সেই ঈশ্বর ছাড়া আমি আর যেন বেঁচে থাকতে পারছিলাম না।

কিন্তু আত্মহত্যা করতে আমি ভয় পাচ্ছিলাম; কারণ তাতে আমার এ জন্মের চেয়ে পরের জন্মে হয়তো আরও খারাপ হবে। ভবিষ্যৎ একেবারে অনিশ্চিত ও অন্ধকার। এই জন্মে যে করেই হোক আমাকে সুস্থ মস্তিষ্কে থাকতে হবে।

পঞ্চম দিনে আমি স্নান করে কিছু খেলাম এবং তারপর নিজের কামরায় ফিরে গেলাম— কারও সংগে কথা বললাম না। কিন্তু এই প্রথমবারের মত দরজাটা বন্ধ করলাম না, খোলাই রাখলাম। এর অর্থ নিশ্চয়ই আমার পরিবারের লোকেরা বুঝতে পারবে। যদিও সেটা ছিল দুর্বল ধাপ, মিলনের দিকে এগিয়ে যাওয়া তবুও আমার মত একজন অহংকারী, আত্মধার্মিক লোক কারও সাহায্য ছাড়া এর চেয়ে বেশী আর কি করতে পারে?

১৩
কর্ম ও দয়া

শান্তি আমার কামরায় এসে বলল, "রবি, তোমার সংগে একজন দেখা করতে এসেছে।" তার আসা আমি টের পাই নি।

"কে এসেছে?"

"আমার স্কুলের একজন বন্ধু। সে তোমার সংগে কথা বলতে চায়।"

আঠারো বছর বয়সের একজন সুন্দরী যুবতী খাবার ঘরে বসে আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। আমি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে একটু ইতস্ততঃ করছিলাম এবং জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালাম। আমাকে দেখে সে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল এবং মৃদু হাসিতে তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। এই হাসির উজ্জ্বলতা মনে হল তার ভিতর থেকে আসছে। আমি চিন্তা করলাম, জীবন সম্বন্ধে সে কিছুই জানে না, জানলে সে এত খুশী হত না।

সে গাঢ় স্বরে বলল, "এই যে রবি, আমার নাম মলি। আমি তোমার কথা অনেক শুনেছি এবং বেশ কিছুদিন ধরে তোমার সংগে কথা বলতে চাইছি।

"ও, কি সম্বন্ধে?" আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম আর তারপর তাকে বসতে বললাম। আমার স্বরে অধৈর্য্যের সুর ছিল। আমি তার উল্টো দিকে বসলাম। তার জন্য আমার কোন সময় দেবার ইচ্ছা ছিল না। সে আমার কাছে কি চায়? শান্তি কেন এসে তার সংগে কথা বলে না? শান্তি বোধহয় রান্নাঘরে গেছে।

আমার এইরকম হতবুদ্ধি ভাব দেখে মলি একটু হেসে বলল, "তুমি খুব ধার্মিক বলে আমি শুনেছি, আর তাই আমি তোমার সংগে দেখা করতে এসেছি।"

সে জিজ্ঞাসা করল যে, আমি আমার ধর্মের মধ্যে পরিপূর্ণতা পেয়েছি কি না। হিন্দু ধর্ম সম্বন্ধে আমার গভীর জ্ঞানের নানা কথার মধ্যে আমার শূন্যতা ঢাকবার জন্য আমি তাকে মিথ্যা কথা বললাম যে, আমি খুব সুখী এবং আমার ধর্ম সত্য। সে স্থিরভাবে আমার গালভরা ও সময়ে সময়ে উদ্ধত উক্তি শুনল। সে বাধাও দিল না, তর্কও করল না কিন্তু খুব ভদ্র ও নম্রভাবে প্রশ্ন করে করে আমার শূন্যতা দেখিয়ে দিল।

শেষে সে আমাকে জিজ্ঞাসা করল, "ধর্মের মধ্যে তোমার কোন বিশেষ লক্ষ্য আছে?"

উত্তরে আমি বললাম, "হ্যাঁ আছে, আমি ঈশ্বরের কাছাকাছি যেতে চাই।"

"তুমি তাঁকে চেন?"

আমার অনিশ্চয়তা ঢাকবার জন্য মিথ্যা কথা বললাম, "হ্যাঁ,চিনি!" আমি জানতাম যে, তিনি আছেন কিন্তু তাঁর কোন মূর্তি আমার কাছে নেই, তাঁর কাছে কোন্ মন্ত্র বলব তা-ও জানি না এবং যোগাভ্যাসের মধ্যে দিয়েও তাঁকে আমি খুঁজে পাই নি। যাহোক, আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "তুমিও কি একজন ধার্মিক হিন্দু?" এ কথা বলে আমার নিজের শূন্যতা থেকে তার দৃষ্টি ফেরাতে চাইলাম। আমি ভাবলাম সে নিশ্চয়ই খুব দেব-দেবতার পূজা করে যার জন্যে তার মনে এত শান্তি আছে।

সে আমাকে বলল, "না, আমি হিন্দু নই। আগে আমি হিন্দু ছিলাম কিন্তু এখন আমি খ্রীষ্টে বিশ্বাসী।"

আমি আতংকিত হয়ে বললাম, "কি তুমি?"

"আমি খ্রীষ্টে বিশ্বাসী। আমি বুঝতে পেরেছি যে, যীশু খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরকে জানা যায় এবং ঈশ্বরের কাছাকাছি যাওয়া যায়।"

"আমি বিশ্বাস করি, আমার ধর্মের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের কাছাকাছি যাওয়া যায়।" কথাটা আমি খুব জোর দিয়েই বললাম, অথচ আমার অন্তরে আমি জানি যে, আমি মিথ্যা কথা বলছি। আসলে, আমি দেখতে পেয়েছি যে, হিন্দু দেবতাদের কাছে এক ধাপ এগিয়ে যাওয়া মানে যে সত্য ঈশ্বরকে আমি খুঁজছি তাঁর থেকে আরও এক ধাপ পিছিয়ে যাওয়া। কিন্তু আমি তা স্বীকার করব না— অন্ততঃ একজন খ্রীষ্টে বিশ্বাসীর কাছে! "যীশু খ্রীষ্ট" নামটা আমাকে এতটা উত্যক্ত করে নি কিন্তু "খ্রীষ্টান" আর এই মেয়েটা খ্রীষ্টান হয়েছে! এতেই আমি বিরক্ত হয়েছি। এরা আমার দেবতা গরুকে খায়। আর এমন অনেক খ্রীষ্টানকে আমি দেখেছি যারা এমন জীবন কাটায় যে, তাদের ধর্ম সম্বন্ধে জানার আমার কোন উৎসাহ নেই।

আমি চেয়ার ছেড়ে উঠলাম যাতে সে বুঝতে পারে যে, আমি তাকে চলে যেতে বলছি। তার সংগে কথাবার্তা বলার কোন প্রয়োজন আমি দেখছি না। কিন্তু সে আস্তে করে এমন একটা কথা বলল যার ফলে আমি বসতে বাধ্য হলাম। সে বলল, "পবিত্র বাইবেল এই শিক্ষা দেয় যে, ঈশ্বর প্রেমিক ঈশ্বর, তিনি ভালবাসেন! আমি কেমন করে তাঁকে জানতে পারলাম তা আমি তোমাকে বলতে চাই।"

আমি হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম। হিন্দু হিসাবে এতকাল আমি কখনও শুনি নি এই প্রেমিক ঈশ্বরের কথা।

আমি আশ্চর্য হয়ে তার কথা শুনতে লাগলাম।

"তিনি আমাদের ভালবাসেন বলে নিজের কাছে পেতে চান।" কথাটা শুনে আমার মাথা ঘুরে উঠল। হিন্দু হিসাবে আমি ঈশ্বরের কাছে যেতে চাই কিন্তু এই মেয়েটা বলছে ঈশ্বর ভালবাসেন বলে আমাকে তাঁর কাছে পেতে চান!

মলি বলতে লাগল, "পবিত্র বাইবেল শিক্ষা দেয় যে, ঈশ্বরের কাছে যাবার বাধা হল পাপ। কেবল তা-ই নয় পাপের জন্য আমরা তাঁকে জানতেও পারি না। সেইজন্য তিনি নিজেই ব্যবস্থা করলেন তিনি আমাদের পাপের শাস্তি নিয়ে মরলেন। যদি আমরা তাঁর ক্ষমা

পাই তবেই আমরা তাঁকে জানতে পারব।" আমি তাকে বাধা দিয়ে বললাম, "একটু থাম।" আমি ভাবছিলাম, সে কি আমাকে ধর্মান্তরিত করতে চাইছে? তার যুক্তি আমাকে খণ্ডন করতে হবে। আমি বললাম, "আমি কর্মে বিশ্বাস করি। তুমি যা বুনবে তা-ই কাটবে এবং কেউ তার পরিবর্তন করতে পারে না। ক্ষমা পাওয়া আমি একেবারেই বিশ্বাস করি না। ওটা অসম্ভব! যা হয়ে গেছে তা হয়ে গেছে!"

"কিন্তু ঈশ্বর সব কিছু করতে পারেন," পূর্ণ বিশ্বাসে মলি বলল। "আমাদের ক্ষমা করার জন্য তাঁর একটা পথ আছে। যীশু খ্রীষ্ট বলেছেন, 'আমিই পথ, সত্য আর জীবন। আমার মধ্য দিয়ে না গেলে কেউই পিতার কাছে যেতে পারে না।' যীশু খ্রীষ্টই সেই পথ; কারণ তিনি আমাদের পাপের জন্য মরেছিলেন বলে ঈশ্বর আমাদের ক্ষমা করতে পারেন।"

ওটাই যে একমাত্র পথ সেই সম্বন্ধে তার অন্ধ বিশ্বাসটা মেনে নিতে অস্বীকার করলাম। আমি সব সময় জোর দিয়ে বলতাম যে, হিন্দু ধর্মই হল একমাত্র পথ, কিন্তু এখন আমি তর্ক করতে লাগলাম যে, গীতায় আছে সব রাস্তাই একই জায়গায় নিয়ে যায় এবং মানুষ যা করে (ধর্মহীন হলেও) অর্থাৎ কর্ম ও পুনর্জন্মের শেষে তাকে শ্রীকৃষ্ণের কাছে নিয়ে যায়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র গন্তব্যস্থল বলা যেমন একটা অন্ধ বিশ্বাস তেমনই যীশু খ্রীষ্টই একমাত্র পথ বলা একই অন্ধ বিশ্বাস, নয় কি? আর আমি কি সত্যি সত্যি শ্রীকৃষ্ণকে খুঁজছি? না তা নয়। আমার অন্তরে আমি ভাল করেই জানি যে, আমি যাঁকে জানতে চাই তিনি সত্য ঈশ্বর, শ্রীকৃষ্ণ নন। কিন্তু আমার অহংকারের দরুন আমি তা মেনে নিচ্ছি না। তার বদলে আমি সম্মান বাঁচাবার জন্য হিন্দু ধর্মের নানা পরস্পর বিরোধী ধারণা দিয়ে তর্ক করতে লাগলাম। মলির ধৈর্য সত্ত্বেও— কিম্বা হয়তো তার ধৈর্য দেখে— আমি রেগে গেলাম এবং গলা চড়িয়ে দিলাম, কারণ এই মেয়েটির কাছে আমি হেরে যেতে রাজী নই। কিন্তু তার শান্তভাব এবং ঈশ্বরের সংগে তার সম্বন্ধের ব্যাপারে এত নিশ্চিয়তা দেখে শেষে এই ব্যাপারে তার গুপ্ত কথা

জানবার জন্য আমি হঠাৎ তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "কি জন্য তুমি এত খুশী? নিশ্চয়ই তুমি অনেক ধ্যান কর!"

মলি বলল, "এক সময় আমি করতাম, কিন্তু এখন আর করি না। যখন থেকে যীশু খ্রীষ্টকে আমার জীবনে গ্রহণ করেছি তখন থেকে তিনি আমাকে সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছেন। তিনি আমাকে এমন শান্তি ও আনন্দ দিয়েছেন যা আমি আগে জানতাম না।" তারপর সে সোজা আমার চোখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "রবি, তোমাকে মোটেই সুখী দেখাচ্ছে না। তুমি কি সুখী?"

আমি তাড়াতাড়ি করে একবার চারপাশে তাকিয়ে নিলাম। রান্নাঘরে বাসন-পত্রের শব্দ শোনা যাচ্ছিল। আমি নীচু গলায় বললাম, "না, আমি সুখী নই। তোমার মত যদি আমি সুখী হতে পারতাম!" সত্যিই কি আমি এ কথা বলছি? এই কথা তো আমি আর কারও কাছে বলতে পারতাম না, এমন কি, দিদিমাকেও না— আর এখন আমি একজন অচেনার কাছে বলছি। সে আমাকে কি করে সাহায্য করবে? আমি আনন্দের চেয়ে আরও বেশী কিছু চাইছিলাম। ঈশ্বরকে আমার জানতেই হবে!

মলি বলল, "আনন্দ এমন জিনিষ নয় যে, তুমি তা তৈরী করতে পার। আনন্দিত হবার যদি সত্যিকারের কারণ না থাকে তবে সেটা আসল আনন্দ নয় এবং তা স্থায়ীও হয় না। আমার পাপ ক্ষমা করা হয়েছে বলেই তো আমি আনন্দিত আর সেই ক্ষমা পেয়েছি বলে আমার জীবন পরিবর্তিত হয়েছে। যীশু খ্রীষ্টকে সত্যি করে জানার মধ্য দিয়ে শান্তি ও আনন্দ আসে।

আমি অধৈর্য হয়ে বললাম, "যীশুর বিষয় বলবে না। তিনি তো দেবতাদের মধ্যে একজন— লক্ষ লক্ষ দেবতা আছেন— তিনি খ্রীষ্টানদের দেবতা। আমি সত্যিকারের ঈশ্বরকে জানতে চাই, যিনি এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা।"

"কিন্তু যীশু খ্রীষ্ট তো তা-ই। সেই জন্যই তো তিনি তোমার পাপের জন্য মরতে পেরেছিলেন— পাপের দেনা কেবল মাত্র ঈশ্বরই

শোধ করতে পারেন। সে খুব শান্ত ছিল এবং খুব নিশ্চিতভাবে কথা বলছিল, আর আমার ব্যবহার ছিল ঠিক তার উল্টো। তার দেবতা যীশুর উপর তার নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল কিন্তু হিন্দু দেবতাদের উপর আমার তেমন বিশ্বাস ছিল না। সে এমনভাবে যীশু খ্রীষ্টের বিষয় কথা বলছিল যে, মনে হচ্ছিল যীশু খ্রীষ্ট তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং তিনি তার পাশেই বসে আছেন।

আমরা প্রায় অর্দ্ধেক দিন কথা বলে কাটালাম, বুঝতেই পারলাম না কেমন করে এত সময় কেটে গেল। আমি তর্ক করছিলাম এবং প্রায়ই মেজাজ দেখিয়ে মাঝে মাঝে চিৎকার করে উঠছিলাম। গত কয়েক মাস ধরে ক্রমশঃ আমি ধৈর্য হারাচ্ছিলাম। কিন্তু সে সমস্ত সময়টা শান্ত, অচঞ্চল ছিল এবং নিশ্চয়তার সংগে কথা বলছিল। আমি হিন্দু দেবতাদের নিয়ে বড়াই করছিলাম এবং প্রাচীন দর্শন সম্বন্ধে একটার পর একটা বিষয় বলে যাচ্ছিলাম, কিন্তু সে অন্যরকম ছিল বলে আমি তার সংগে তর্ক করতে পারছিলাম না। আমি তার মত শান্তি ও আনন্দ পেতে চাই, কিন্তু আমার ধর্মের কোন অংশই আমি ছেড়ে দিতে রাজী নই। সে অবশ্য এ বিষয়ে কিছু বলে নি, কিন্তু আমি স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছিলাম যে, আমি যদি যীশু খ্রীষ্টকে ঈশ্বর বলে বিশ্বাস করি তাহলে তিনি আমার পাপের জন্য মরেছিলেন ও আমার পাপ ক্ষমা করতে পারেন বলে বিশ্বাস করতে হবে আর তাহলে আমি যে এতদিন হিন্দুর মত বসবাস করে এসেছি তা একেবারে ব্যর্থ হয়ে যাবে।

শেষে মলি চলে যাবার জন্য উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "আমাকে এখন যেতেই হবে।"

আমি লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম এবং স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিতে চাইলাম যে, সে আমার মন বদলাতে পারে নি। তার আসাটা যেন একটা প্রকাশ্য অত্যাচার। যে তার ধর্ম ত্যাগ করেছে তার মত একজন দুশ্চরিত্রা মেয়ের সংগে কথা বলা আমার মত একজন ব্রাহ্মণের পক্ষে খুবই অপমানজনক— আর তার এত বড় দুঃসাহস যে, আমার মত একজন যোগীকে সে খ্রীষ্টান হবার জন্য প্ররোচিত করতে এসেছে।

রান্নাঘরে যারা আছে তারা যাতে শুনতে পায় সেজন্য আমি জোরে রাগের সংগে বললাম, "আমি খ্রীষ্টে বিশ্বাসীদের ঘৃণা করি। আমি কখনও খ্রীষ্টে বিশ্বাসী হব না, আমার মরণকালেও না। আমি হিন্দু হয়ে জন্মেছি হিন্দু অবস্থাতেই মরব!"

সে মমতাভরা দৃষ্টি নিয়ে আমার দিকে তাকাল। তারপর বলল, "রবি, আজ রাতে ঘুমাতে যাবার আগে হাঁটু পেতে ঈশ্বরকে বোলো যেন তিনি তোমাকে সত্য দেখিয়ে দেন। আমিও তোমার জন্য প্রার্থনা করব।" এই বলে সে হাত নেড়ে বিদায় নিল।

খোলা দরজা দিয়ে আমি দেখতে পেলাম উপসাগরের উপরে সূর্য ডুবে যাচ্ছে এবং অন্ধকার নেমে আসছে। নিজের হাতের দিকে চেয়ে দেখলাম হাত দু'টো রাগে মুঠো হয়ে রয়েছে এবং হাতের নখ যেন হাতের তালুতে বসে গেছে।

আবার আমার কামরায় আমি একা হ'লাম, এদিক থেকে ওদিকে হাঁটতে লাগলাম এবং বুঝলাম দুই দল সৈন্য আমার ভেতরে যুদ্ধ করছে। এই রকম ভীষণ যুদ্ধ আর কখনও আমার মধ্যে হয় নি। আমার মনে হচ্ছিল মৃত্যু বা জীবন, এর একটাকে আমাকে বেছে নিতে হবে। দু'টি শক্তি দু'দিকে আমাকে টানতে লাগল। মলির সংগে কথা বলবার সময় এই দৃঢ় বিশ্বাস যেন আমাকে আঁকড়ে ধরেছিল যে, এই সত্য ঈশ্বর পবিত্র এবং খাঁটি। তিনি কেমন করে আমার জন্য কিছু করতে পারেন? আমার অন্তরের অন্ধকার আমি খুব ভাল করেই বুঝতে পারলাম! আমার ইচ্ছা না থাকলেও শেষে আমি নিজের কাছেই স্বীকার করলাম যে, আমার এত দিনের পবিত্র স্নান, পূজা এবং যোগসাধনা আমার অন্তরকে কখনও পরিবর্তন করতে পারে নি।

আমি ভাবতে লাগলাম, মলি যে কথা বলেছে তা যদি সত্যি হয় যে, যীশু খ্রীষ্ট আমার পাপের জন্য মরেছিলেন যাতে পাপের ক্ষমা পেয়ে আমি পরিষ্কার হতে পারি তবে এই পবিত্র ঈশ্বরের সংগে আমি মিলিত হতে পারব। আমি কথাটা বিশ্বাস করতে চাইলাম— কিন্তু যীশু হলেন খ্রীষ্টান দেবতা, আর আমি তো কখনও খ্রীষ্টান হব না।

যদি বিশ্বাস করি তবে পরিবারের সামনে আমি আর মুখ দেখাতে পারব না; আবার আমি যে রকম ছিলাম সে রকমই থাকি তবে জীবন পাব না। নিজেকে বুঝবার জন্য আমার মধ্যে একটা যুদ্ধ চলতে লাগল। আমার অন্তরে আমি বুঝতে চেষ্টা করলাম যে, আমিই ঈশ্বর, কিন্তু এটাই বুঝলাম যে, আমি একেবারে হারিয়ে গেছি। বড় মামা দেবনারায়ণ যা বলেছিলেন তা আমার মনে পড়ল এবং সেই কথা ঘুরে ফিরে যেন আমাকে তাড়া করে বেড়াতে লাগল। তিনি বলেছিলেন, "পণ্ডিতেরা আত্মোপলব্ধি সম্বন্ধে অনেক কথা বলেন— কিন্তু তাঁরা আরও স্বার্থপর হন।" তিনি ভয়ংকর সত্যি কথা বলেছিলেন। সেজন্যই আমার দাদুর হিন্দুধর্মের প্রতি মোহভংগ ঘটেছিল বলে মদ খেয়ে খেয়ে নিজেকে ধ্বংস করেছিলেন। আমি এই কথা বিশ্বাস করতে চাইতাম না, কিন্তু শেষে আমি বুঝলাম। মৃত্যুর ওপারে যা আছে তার জন্য আমি আত্মহত্যা করতে ভয় পেলাম।

মলি জোর দিয়ে বলেছিল ঈশ্বর আমাকে ভালবাসেন এবং সে তাঁর ভালবাসা অনুভব করেছে। এজন্য তার প্রতি আমার হিংসা জাগল— কিন্তু সে খ্রীষ্টান বলে আবার তার প্রতি ঘৃণাও হল। মলি আমাকে যা বলেছে তার সবই অহংকারের জন্য আমি প্রত্যাখ্যান করতে চাইলাম, কিন্তু এবার আমি আর কারও মুখ রক্ষার প্রয়োজন বোধ করলাম না। বিছানার পাশে হাঁটু গাড়লাম; কিন্তু আমি সচেতন ছিলাম যে, মলির অনুরোধে আমি সাড়া দিচ্ছি। সে-ও কি এই মুহূর্তে আমার জন্য প্রার্থনা করছে?

"ঈশ্বর, সত্য ঈশ্বর ও সৃষ্টিকর্তা, আমাকে সত্য দেখিয়ে দিন, ঈশ্বর, দয়া করুন!" এ কথা বলা আমার পক্ষে সহজ ছিল না কিন্তু সেটাই ছিল আমার শেষ আশা।

আমার ভেতরে কি যেন একটা হল; একটা লম্বা বাঁশ ঝড়ে ভেংগে গেলে যেমন হয় ঠিক তেমনি হল। আমার জীবনে প্রথমবার আমি বুঝতে পারলাম যে, আমি সত্যই প্রার্থনা করেছি এবং করতে পেরেছি— কোন অশরীরী শক্তির কাছে নয়; কিন্তু প্রার্থনা করেছি সেই

সত্যময় ঈশ্বরের কাছে যিনি আমাকে ভালবাসেন ও আমার যত্ন নেন।

ক্লান্তিতে আমি আর ভাবতে পারলাম না, বিছানায় উঠে আমি সংগে সংগে ঘুমিয়ে পড়লাম। আমার শেষ চেতনায় ছিল একটা দৃঢ় বিশ্বাস যে, ঈশ্বর আমার প্রার্থনা শুনেছেন এবং তিনি তার উত্তর দেবেন।

১৪
আলোদান

আমার একজন মাসীমার সংগে রান্নাঘরে আমি কথা বলছিলাম আর তিনি রান্না করছিলেন। এমন সময় কৃষ্ণ সেখানে এসে বলল, "এই রবি, তুমি কি জান স্বর্গে যেতে হলে তোমাকে আবার জন্মগ্রহণ করতে হবে?" তাঁর ব্যবহার ও চাহনি একেবারে অন্যরকম ছিল। এর আগে আমি তাকে এরকম কখনও দেখি নি। তার চোখে মুখে ছিল এমন একটা ভাব যেন সে আমাকে খুঁজে পেয়ে খুব খুশী হয়েছে।

উত্তরে আমি তাকে বলতে চেয়েছিলাম, "হ্যাঁ, জানি। আমি পরের জন্মে একটা গরু হয়ে জন্মাব, ওটাই আমার স্বর্গ।" কিন্তু কৃষ্ণের আগ্রহ দেখে তাকে উপহাস করা আর আমার হল না। আমি তার কথাটা এড়িয়ে গিয়ে বললাম, "কেন তুমি এ কথা বলছ?" আমি লক্ষ্য করলাম একটা কালো বই তার হাতে রয়েছে এবং এমনভাবে সে বইটার পাতা উল্টাছিল যা দেখে মনে হচ্ছিল সে কিছু খুঁজছে।

সে আস্তে আস্তে বইয়ের পাতা উল্টাতে উল্টাতে বলল, "পবিত্র বাইবেলে এ কথা লেখা আছে।" মনে হচ্ছিল সে যেন কোন অজানা দেশ আবিষ্কার করতে যাচ্ছে। সে বলল, "দাঁড়াও, আমি তোমাকে দেখাচ্ছি। মার্ক—লূক—যোহন— এই যে যোহন ৩ অধ্যায়ে লেখা আছে, শোন! উত্তরে যীশু নীকদীমকে বললেন, 'আমি আপনাকে সত্যিই বলছি, নতুন করে জন্ম না হলে কেউ ঈশ্বরের রাজ্য দেখতে পায় না।' এ বিষয়ে তুমি কি মনে কর?"

আমি কিছুই চিন্তা করতে পারছিলাম না। এ কি সেই একই যীশু

যাঁর কথা আমার মা অনেকদিন আগে বলেছিলেন। আবার মলি তাঁকেই সত্য ঈশ্বর বলে দাবী করছে, যিনি আমার পাপের জন্য মরেছিলেন? তাহলে তিনিই সেই!

"আমাকে দেখতে দাও!" আমি উত্তেজিত হয়ে বললাম। কৃষ্ণ সেই ছোট বইটা আমার দিকে বাড়িয়ে ধরল যাতে আমি নিজেই তা পড়তে পারি। আমি পড়তে পড়তে শেষে বুঝতে পারলাম মলি আমার সংগে কথা বলার পর তিন সপ্তা ধরে আমি যা বুঝবার জন্য কষ্ট করছিলাম এ সে-ই। এতদিন আমার জগৎ যেন ভেংগে পড়বার উপক্রম হয়েছিল কিন্তু এখন সব কিছু ঠিক হয়ে গেল। "আবার জন্ম হতে হবে!" হ্যাঁ, এটাই আমার দরকার। যীশু কি বলতে চাইছেন আমি তা ঠিকই বুঝতে পারলাম। তিনি পুনর্জন্মের কথা বলছেন না, বলছেন আত্মিক জন্মের কথা যার ফলে নীকদীম আর একটা নতুন দেহ পাবে না, তার অন্তর নতুন হয়ে উঠবে।

এখন আমি সত্যিই উত্তেজিত হয়ে উঠলাম। এ কথা আমি কেন আগে বুঝতে পারি নি? হাজার বার জন্ম নিলেই বা কি উপকার হবে? পুনর্জন্ম আমাকে একটা নতুন দেহ দিতে পারে, কিন্তু তা তো আমি চাই নি। এই নতুন জন্মের কথা জানতে পেরে আর কোন দৈহিক জন্মের কথা আমি ভাবতেই পারলাম না। আমি সবচেয়ে উঁচু বংশের ধনী পরিবারে জন্মেছি, আমি একজন যোগীর ছেলে, জাগতিক ও ধর্মীয় শিক্ষা পাবার সুযোগ আমি পেয়েছি, তবুও সব কিছুতে আমি বিফল হয়েছি। আমার কাছে এখন এটা বোকামী বলে মনে হল যে, উৎকৃষ্ট হবার জন্য একজনকে ভিন্ন ভিন্ন দেহ নিয়ে বার বার এ জগতে ফিরে আসতে হবে!

প্রত্যেক নতুন বছরের আগের দিন সন্ধ্যাবেলা অন্যেরা যেমন করে তেমনি ভাবে আমিও নতুন বছরের প্রতিজ্ঞা করব। তালিকার প্রথমেই থাকত আমি সিগারেট খাওয়া বন্ধ করব। আমার কাশি আরও বেড়ে গিয়েছিল তবুও আমি সিগারেট খাওয়া বাদ দিতে পারি নি। প্রত্যেক বছর জানুয়ারী মাসে নতুনভাবে স্থির করতাম যে, আগের

বছরের চেয়ে আরও ভাল কিছু করব। জানুয়ারী মাসের ২ তারিখে আবার আমি পুরানো স্বভাবেই ফিরে যেতাম। কয়েকদিনের মধ্যেই আমার অশাসিত মেজাজ নতুনভাবে ফেটে পড়ত— এটা ঘটত যখন আমি শান্তি পাবার জন্য ২/১ ঘন্টা ধ্যান করে কটাতাম ঠিক তার পরেই। আমার পরিবর্তিত যে দেহে আমি জীবন কটাতাম তাতে নিশ্চয়ই কোন ভুল আছে যা কোনদিন আমি সমাধান করতে পারি নি।

যদি ঈশ্বর আমাকে সত্যিই ক্ষমা করেন তবে তা কত ভালই না হবে! কিন্তু আমি ক্ষমার চেয়েও আরও বেশী কিছু আকাংখা করছিলাম। যখন থেকে আমি ঈশ্বরকে বলতে লাগলাম আমাকে সত্য দেখিয়ে দিতে তখন থেকে আমি ক্রমশঃ নিজেকে নতুনভাবে দেখতে লাগলাম। এতদিন জগৎ সর্বদা আমাকে ঘিরেই ঘুরত। আমি চাইতাম সকলে তাদের জীবন যেন আমার ইচ্ছামত কটায় এবং আমার সংগে দেবতার মত ব্যবহার করে। আমি ছিলাম আদুরে অত্যাচারী। কিন্তু আমি জানতাম যে, আমি ঈশ্বর নই, কখনও হতেও পারব না। এখন তা মেনে নিতে পেরে শান্তি পেলাম। আমি আর ঈশ্বর হতে চাই না। কিন্তু আমি নিজেকে যে অবস্থায় দেখলাম সেই অবস্থায় আর থাকতে চাই না। আমি একেবারে নতুন মানুষ হতে চাই। যদি খ্রীষ্ট আমাকে সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত না করেন তবে তাঁর ক্ষমাও আমি চাই না।

আগে আমি অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে প্রাত্যহিক জীবন থেকে পালাতে চাইতাম। একে হিন্দু দর্শনে বলা হয় মায়াবিভ্রম। এখন আমি এমন শক্তি চাই যাতে জীবন যুদ্ধের মুখোমুখি হতে পারি, ঈশ্বর আমার জীবন যেভাবে চালাতে চান সেই ভাবেই চলতে পারি। আমি যা ছিলাম তার সম্পূর্ণ পরিবর্তনের অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারি। আমি ধ্যানের মধ্য দিয়ে উপর-উপর যে শান্তি পেতাম তেমন শান্তি আমি আর পেতে চাই না, কারণ কিছুক্ষণ পরেই আমার মেজাজ গরম হলেই আমি আর সেই শান্তি রক্ষা করতে পারতাম না। আমাকে আবার জন্মগ্রহণ করতে হবে— আত্মিকভাবে, শারীরিকভাবে নয়।

কানাডার মন্ট্রিল থেকে লারী মামার একটা চিঠি এসেছিল। সেদিন

সন্ধ্যাবেলা সেই চিঠি নিয়ে টেবিলে অনেক আলোচনা চলছিল। মামা ম্যাক্‌গীল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একটা বৃত্তি পেয়ে সেখানে দর্শন শাস্ত্র সম্বন্ধে পড়াশোনা করতে গিয়েছিলেন। সেই দ্বীপের উচ্চ বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় সকলের চেয়ে তিনি বেশী নম্বর পেয়েছিলেন। এতে আমরা সবাই গর্বিত হয়েছিলাম এবং তাঁর উন্নতির কথা জনার জন্য সবাই উদ্‌গ্রীব ছিলাম। লারী মামার কথা হতে হতে শেষে কৃষ্ণের ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা হচ্ছিল। দেবনারায়ণ মামা চাইছিলেন যেন কৃষ্ণ লারী মামার মত পড়াশোনা করে। হয়তো কৃষ্ণ লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কোন বৃত্তি পেতে পারে। পরিবারের কথাবার্তার মধ্যে আমি এই বিষয় নিয়েই চিন্তা করছিলাম। আমার এমন একটা কথা ছিল যা সবাইকে বলতে হবে আর সেজন্য আমি চিন্তা করছিলাম কিভাবে কথাটা বলব। সামনের সপ্তায় আমার পনের বছর পূর্ণ হবে। নতুন ভাবে জন্ম গ্রহণ করবার জন্য ঐ দিনটাই উপযুক্ত।

টেবিল ছেড়ে চলে যাবার জন্য সবাই উঠে দাঁড়াল আর আমি কথাটা কি করে বলব তা নিয়ে চিন্তা করছিলাম। বড় মামা আর কৃষ্ণ দিদিমাকে তার কামরায় বয়ে নিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। এখনই তাদের কথাটা বলতে হবে, কিন্তু আমার ভয় লাগছিল তবে তাদের তো সব কথা জানার দরকার নেই অন্ততঃ এখন না।

"দিদিমা!"

"কি রবি? তিনি শুনবার জন্য আগ্রহী বলেন। তিনি যে সকলের সংগে মিল করতে বলেছিলেন, তিনি কি সেই কথাই ভাবছেন? আমার মন কি নরম হয়েছে? তিনি তো জানেন না যে, আমি সকলের সংগে মিল করতে কত আগ্রহী।

"আমার জন্মদিন পালন না করলেই আমি খুশী হব।"

শান্তি বাধা দিয়ে বলল, "রবি, তুমি কি ঠিক কথা বলছ?"

দিদিমা নরম স্বরে বললেন, "কেন, রবি? তুমি তো জানই প্রতি বছর তোমার জন্মদিন পালন করার জন্য আমরা সবাই কত আগ্রহী থাকি? তাঁর চোখ থেকে যেন ভালবাসা ও সহানুভূতি উপ্‌চে পড়ছিল।

তিনি ভাবছিলেন, তাঁর ও আমার মধ্যে যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল তার জন্যই বুঝি আমি এমন কথা বলছি।"

"না, দিদিমা, তুমি যা ভাবছ তেমন কিছুই নয়। আমি দিনটা অন্যভাবে পালন করতে চাই।" ব্যাপারটা ওখানেই শেষ হয়ে গেল। সমস্ত ধর্মীয় ও উৎসবের ব্যাপারেই আমার কথাই যেন ছিল আইন।

দিনগুলো আস্তে আস্তে কেটে গেল আর শেষে আমার জন্মদিন উপস্থিত হল। আমি সেদিন ঠাকুরঘরে গেলাম না। আগে সেখানেই আমার দিনের বেশীর ভাগ সময় কাটাতাম। পরিবারের সবাই একটু আশ্চর্য হল, কিন্তু আমি ভয়ে কারণটা তাদের কাছে বলতে পারলাম না। ঐ দিনেই আমি যীশুকে আমার জীবনে আসতে বলব এবং নতুন ভাবে জন্ম গ্রহণ করব। আমার জন্মদিনে কি সুন্দর কাজটাই না আমি করব!!

এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া সত্ত্বেও তা কাজে পরিণত করতে আমার সাহস হল না। আমি খ্রীষ্টান হলে আমার মা কি ভাববেন? আর সেই পণ্ডিতেরাই বা কি ভাববেন যাঁরা আমাকে এতদিন উৎসাহ যুগিয়েছেন এবং শিক্ষা দিয়েছেন? আর যে সব হিন্দুরা আমাকে পূজা করেছে ও উপহার দিয়েছে এবং আমার উপর বিশ্বাস রেখেছে যে, আমি তাদের পরজন্মে আরও উঁচু ধাপে নিয়ে যেতে সাহায্য করতে পারব তারাই বা কি ভাববে? আমি তাদের সকলের সংগে কি করে বিশ্বাসঘাতকতা করব? গোঁসাই কি বলবেন— আর পাড়া-প্রতিবেশীরা, যাঁরা তাঁদের ছেলেমেয়েদের আমাকে অনুসরণ করতে বলেন তাঁরা?

যে মুহূর্তে আমি খ্রীষ্টকে আমার প্রভু ও পাপের উদ্ধারকর্তা বলে স্বীকার করব তখন থেকেই আমি সব কিছু হারাব— আমার ব্রাহ্মণত্ব, অল্পবয়েসী যোগী হিসাবে আমার পদমর্যাদা, হিন্দু দেব-দেবতাদের আশীর্বাদ, আমার পরিবারের আন্তরিকতা— সব, সবই হারাব। আমাকে হিন্দু সমাজ থেকে বের করে দেওয়া হবে, আমি নীচু থেকে আরও— আরও নীচু হব। আবার এদিকে যীশু যদি সত্যি করে আমার পাপ ক্ষমা করতে এবং আমার জীবন পরিবর্তিত করতে না পারেন তবে আমার

কি হবে? যদি আমি খ্রীষ্টের মধ্যে দিয়ে সত্যি সত্যিই ঈশ্বরকে জানতে না পারি? যে বিষয়ে আমি নিশ্চিত নই তার জন্য আমি এত বড় ঝুঁকি কেমন করে নিতে পারি?

এইভাবে আমার জন্মদিন আসল আর গেল— এই দিনেই আমি নতুন ভাবে জন্মগ্রহণ করার পরিকল্পনা করেছিলাম। তখনও আমার অন্তরে যীশুকে গ্রহণ করতে ভয় পাচ্ছিলাম। সেই রাতে আমি যখন ঘুমাতে গেলাম তখন আমার অবস্থা আগের চেয়ে আরও খারাপ হল।

১৫

একজন গুরুর মৃত্যু

"নমস্তে, নমস্তে, যোগী রবীন্দ্র মহারাজ!"

আমি বার্ট্রাণ্ড রাসেলের লেখা একটা বই পড়ছিলাম। বইটার নাম ছিল কেন আমি খ্রীষ্টান নই— ভাজু রাধে গোবিন্দ আমাকে নমস্কার জানিয়ে পিছনের সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছিলেন। আমি বারন্দার যে অংশে বসে বইটা পড়ছিলাম সেখানে আসতে হলে ঘরের মধ্যে দিয়ে আসতে হবে আর ঘরে ঢুকলেই দিদিমা অথবা রেবতী মাসীমার সংগে তাঁর দেখা হবেই আর আমার কাছ পর্যন্ত আসা হবে না। গোবিন্দ আমাদের পরিবারের একজন বন্ধু, কালী উপসাগরের কাছে থাকেন। তিনি প্রায় সময়ই আমাদের বাড়ীতে আসেন এবং আমার সংগে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করেন। কিন্তু আমার তখন তাঁর সংগে আলোচনা করার মত মনোভাব ছিল না। তাঁর চুল ও দাড়ি লম্বা সাদা ছিল। তিনি গাঢ় হলুদ রংয়ের ধূতি পরতেন এবং এই বুড়ো ভদ্রলোক উঁচু দরের হিন্দু সাধুদের একজন ছিলেন। তলোয়ারের বাঁট ধরে তিনি প্রয়োজনে অভিনয় করলেও একজন খাঁটি হিন্দু ছিলেন। আমি হাত জোড় করে তাঁকে নমস্কার করলাম। আমি হাসিমুখে তাঁকে লক্ষ্য করছিলাম যখন তিনি লাঠিটা সিড়ির প্রত্যেকটি ধাপে ঠক্ ঠক্ করতে করতে উপরে উঠে আসছিলেন। হাঁটার জন্য তাঁর লাঠির প্রয়োজন না থাকলেও তিনি লোককে আকৃষ্ট করবার জন্য সেটা ব্যবহার করতেন। তিনি ঘরের মধ্যে ঢুকবার সময় উঁচু গলায় হিন্দী গান গাইছিলেন। তিনি সবসময় এরকমই করতেন।

কেন আমি খ্রীষ্টান নই নামে বইটা আমাকে হতাশ করল। আমি স্কুলের লাইব্রেরী থেকে বইটা এনেছিলাম। ভেবেছিলাম বইটা আমাকে হিন্দু থাকতে সাহায্য করবে। কিন্তু রাসেলের যুক্তি দুর্বল এবং উপযুক্ত নয় এবং যতই বইটা আমি পড়তে লাগলাম, ততই আমি নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারলাম যে, আমাকে খ্রীষ্টান হতে হবে, কারণ যে প্রমাণ তিনি দেখিয়েছেন তাতেই তা বোঝা যায়। আমি বইটা রেখে আকাশের দিকে তাকালাম। সারা আকাশ জুড়ে মেঘ ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। সেদিকে তাকিয়ে আমি গভীর চিন্তায় ডুবে গেলাম। আমি আর কতদিন যীশুকে গ্রহণ না করে চলব যখন আমি বুঝতে পেরেছি তিনিই সত্য ঈশ্বর, এবং তিনিই আমার পাপের জন্য মরে আমাকে পাপ থেকে উদ্ধার করেছেন? আমার অবস্থা খুব শোচনীয় হল। একদিকে হিন্দু সমাজ থেকে আমার পদমর্যাদা ও পরিবারের মংগল ইচ্ছা আমি হারাব, অন্যদিকে যিনি সত্য তাঁকে এবং ঈশ্বরের সংগে আমার সম্বন্ধ আমি হারাব। কিন্তু খ্রীষ্ট কি আমার জীবনে আরও প্রয়োজনীয় নন? নিশ্চয়ই প্রয়োজনীয়, কিন্তু তবুও আমি ভয় পেতে লাগলাম।

আমার মাসতুতো ভাই কৃষ্ণ বারান্দায় বের হয়ে এসে বলল, "রবি, তুমি এখানে? আমি তোমাকে খুঁজছিলাম। আজ রাতে শহরে একটা সভা হবে। তোমার সেখানে যাওয়া দরকার।" তাকে খুব উত্তেজিত মনে হল।

"ওখানে কি হবে?"

"খ্রীষ্টানদের একটা ছোটি সভা হবে। তারা বাইবেল থেকে ব্যাখ্যা করবে।

আজকাল কৃষ্ণকে একেবারে অন্যরকম লাগে— আনন্দে ভরা এবং সহজভাবে তার সংগে মেলামেশা করা যায়। আর এখন সে আমাকে খ্রীষ্টানদের একটা সভায় যাবার কথা বলছে। আমার ভিতরে যা চলছে তা কি ও টের পেয়েছে? সেখানে যাবার আমার খুবই ইচ্ছা। কিন্তু আবার ভাবলাম যদি কোন চেনা লোক আমাকে দেখে ফেলে গুজব

ছড়ায় তবে?

"কি রবি, যাবে? তুমি যেতে পারলে খুব ভাল হবে। আমি সাড়ে ছয়টায় যাব।"

"কেন যাব না? আমি বল্লাম, আর বলতে পেরে আমি আশ্চর্য হলাম। "হ্যাঁ, কেন যাব না?"

আমি আর কৃষ্ণ যখন শহরে যাচ্ছিলাম তখন রামকৈর নামে কৃষ্ণের একজন পরিচিত ছেলে আমাদের সংগে এসে যোগ দিল। আমি তাকে শহরে বেশ কয়েকবার দেখেছি এবং সম্ভবতঃ সে আমার বিষয় ভাল করেই জানে। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "এই সভায় কি হবে তা কি তুমি জান? আমি তার কাছ থেকে আগে খবর নেবার জন্য বেশ উদ্‌গ্রীব হলাম।

সে বলল, "অল্পই জানি। খুব অল্পদিন আগে আমি খ্রীষ্টান হয়েছি।"

"খ্রীষ্টান?" কথাটা আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না; তাই খুব আগ্রহী হয়ে বললাম, "যীশু কি তোমার জীবন সত্যিই পরিবর্তিত করেছেন?"

রামকৈর হেসে বলল, "নিশ্চয়ই করেছেন। এখন সবই অন্য রকম হয়ে গেছে।"

আমি বললাম, "তুমি কি ঈশ্বরকে জান?"

"হ্যাঁ জানি। যখন আমি যীশুকে আমার অন্তরে আসতে বলেছি তখন থেকেই জানি।"

কৃষ্ণ আগ্রহের সংগে বলল, "হ্যাঁ, রবি, সত্যিই এটা ঠিক। আমিও কয়েকদিন আগে খ্রীষ্টান হয়েছি।" এই প্রথমবার সে আমাকে "রবি" বলে প্রিয় বন্ধুর মত ডাকল।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম, "আমি সে কথাই ভেবেছিলাম।" কৃষ্ণ খ্রীষ্টান হয়েছে বলে আমি বেশ খুশী হয়ে উঠলাম। তারপর ভয় পেয়ে ভাবলাম, হিন্দুদের আজকাল হল কি? মলি, রামকৈর, আর এখন কৃষ্ণও! আমার জীবনে এমন কথা আমি কখনও শুনি নি! তাহলে এর

পরে আমি কি?

ঘন্টা খানেক হাঁটিবার পর আমরা শহরের কাছাকাছি গিয়ে উপস্থিত হলাম; তারপর পাশের দিকে ছোটি, সরু রাস্তায় গেলাম। এলাকাটা ছিল গরীবদের। ত্রিনিদাদের আল্‌কাতরার হ্রদ থেকে আলকাতরা নিয়ে পৃথিবীর বড় বড় দেশের প্রত্যেকটি রাস্তা পাকা করার জন্য ব্যবহার করা হয়, কিন্তু এই রাস্তাটায় বহু বছর আলকাতরা দেওয়া হয় নি। রাস্তার উপরের যতটুকু অংশ কালো রয়েছে ততটুকু অনেক জায়গায় ফেটে গেছে, গর্ত হয়েছে এবং সেই গর্তের মধ্যে অনেক ঘাস গজিয়েছে। রাস্তাটার ধারে মাত্র তিনটা বাড়ী ছিল। সেগুলোর মধ্যে যেটা সবচেয়ে খারাপ সেটার উপর আমার চোখ পড়ল। একটা বড় ঘরের অবস্থা জরাজীর্ণ, মেরামতের খুবই প্রয়োজন আর তার চারপাশে বড় বড় আগাছা জন্মেছে। ঘরটার উপরে একটা পাতলা টিনের ছাউনি আছে। তার অসমান দেয়ালে কখনও রং পড়েছে কিনা সন্দেহ এবং তার কাঠ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে আর অনেক বছরের বলে তাতে ছাতা ধরেছে। দেয়ালের গায়ে যা লেখা আছে তা প্রায় দেখা যায় না; লেখা আছে, "হর্টি এণ্ড হ্যাণ্ড হল"। লেখাটা তার গৌরবের দিনের প্রতিধ্বনি। ওখানে যে একটা সভা হবে তার কোন চিহ্নই নেই, তার দরকারও ছিল না। ভিতরে খুব জোরে জোরে একটু বেসুরো গান চলছিল, কিন্তু তাতে প্রাণের জোয়ার ছিল প্রচুর। সেই ঘরের জানলা দিয়ে বেরিয়ে আসা গান শুনে আমাদের মনে কোন সন্দেহ রইল না যে, এটাই সেই জায়গা।

ভাংগা-চোরা কয়েকটা পাকা সিঁড়ি দিয়ে আমরা উঠে গেলাম। আমি উত্তেজনায় ভরপুর ছিলাম। ভেতরে ঢুকলে পর আমার চোখকে যেন আমি বিশ্বাস করাতে পারছিলাম না। সেখানে উপস্থিত ছিল মাত্র ডজন খানেক লোক আর যে বাজনা বাইরে থেকে শোনা যাচ্ছিল সেটা ছিল একটা তম্বুরার আওয়াজ। একটা বছর ছয়েকের মেয়ে সেটা বাজাচ্ছিল (পরে জেনেছিলাম মেয়েটি পালক, অর্থাৎ পুরোহিতের) সে সামনে দাঁড়িয়ে একটা সস্তা দামের তম্বুরা বাজাচ্ছিল। এত কম লোক,

কিন্তু কি উৎসাহ! ঐ রকম গান আমি কখনও শুনি নি। আমার চোখ পড়ল ধূলো ভরা মেঝের উপর; দেখলাম উপরের বরগা থেকে মাকড়সার বড় বড় জাল ঝুলছে এবং খোলা ছাদের এখানে ওখানে দলে দলে ঝুলে আছে ঘুমন্ত বাদুড়। রং না দেওয়া দেয়ালে অনেকদিন আগেকার কিছু বিজ্ঞাপন, যা এখন আর পড়া যায় না। সেই ছোটি খ্রীষ্টান দলটি আর কিছু না হলেও হৃদয়গ্রাহী ছিল। সেখানে ছিল কয়েকজন বয়স্ক পূর্ব ভারতীয় লোক, কয়েকজন কালো লোক আর কয়েকজন কিশোর-কিশোরী ও ছোটি ছেলেমেয়ে।

যদিও সেখানকার কউকেই আমি চিনি না, তবুও আমি নিশ্চিত ছিলাম যে, তারা সবাই আমাকে চেনে। আমার ভয় হল এই ভেবে যে, এরা গিয়ে তাদের হিন্দু প্রতিবেশীদের যখন বলবে যে, আমি একটা খ্রীষ্টান সভায় গিয়েছিলাম তখন কি হবে! এত অল্প লোকের চোখে আমি অজানা থাকতে পারব না। স্থির করলাম আমি সাহস করব। তাই কৃষ্ণ ও রামকৈরের পিছনে পিছনে দু'পাশের ধূলোভরা খালি কাঠের বেঞ্চের মাঝখান দিয়ে হেঁটে গেলাম। চোখের এক কোণা দিয়ে দেখলাম অনেকে মাথা ঘুরিয়ে আমাকে দেখল। তাদের চোখ-মুখে ছিল আশ্চর্য হওয়ার চিহ্ন। ওরা একজন অন্যজনকে একটু ঠেলা দিল; কিন্তু আমি হেঁটে সামনের বেঞ্চে গেলাম। খুব উৎসাহের সংগে একটা ছোটি কোরাস (ধূয়া) বার বার গাওয়া হচ্ছিল। গানটা ছিল—

কালভেরীর পথে তিনি আমার জন্য গেলেন,
আমার জন্য গেলেন, আমার জন্য গেলেন।
কালভেরীর পথে তিনি আমার জন্য গেলেন,
আমাকে মুক্ত করার জন্য তিনি মরলেন।
যদিও আমার অনেক, অনেক পাপ ছিল
যীশু তা সবই দূর করলেন ও আমাকে ক্ষমা করলেন।
কালভেরীর পথে তিনি আমার জন্য গেলেন
আমাকে মুক্ত করার জন্য তিনি মরলেন।

এটা ছিল প্রথম খ্রীষ্টান গান যা আমি মন দিয়ে শুনলাম। আমার

মনে হল "কালভেরী" হল সেই জায়গা যেখানে যীশু গোটা জগতের ও আমারও পাপের জন্য মরেছিলেন। আমি ভাবলাম, তাহলে কালভেরী সত্যিই একটা জায়গা! আর এত দরদ দিয়ে এরা গান গাইছে— যীশু এদের জন্যে মরেছিলেন বলেই এরা যীশুকে খুব ভালবাসে!

সেই ছোটি মেয়েটা তম্বুরা বাজাতে বাজাতেই আমাদের দেখে একটু লজ্জিতভাবে হাসল আর সেই অল্প সংখ্যক লোক বার বার গানটা গাইতে লাগল। তাদের উৎসাহে উৎসাহিত হয়ে আমরাও তিনজন যে তাদের সংগে সেই গানটা গেয়ে চলেছি তা যখন বুঝতে পারলাম তখন আমি আশ্চর্য হলাম। হিন্দুদের উৎসবে একসংগে গান গাওয়া অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু এই খ্রীষ্টানেরা যে আনন্দ ও উৎসাহ নিয়ে গান গাইছিল তা তেমন নয়।

গানের সেই ছোটি নেতা তার তম্বুরা তুলে ধরল তখন সবাই এক মুহূর্তের জন্য চুপ করল। তারপর সে তার হাত দিয়ে যেই তম্বুরায় আঘাত করল তখনই আবার একটা নতুন কোরাস-গান গাওয়া শুরু হয়ে গেল। বারবার সেই গানের কথাগুলো গাওয়া হচ্ছিল, তাতে আমিও একসময় তাদের সংগে যোগ দিলাম। সেই গানের কথাগুলো যদি সত্যি হয়ে থাকে তবে তাদের সংগে সংগে উৎসাহী না হয়ে পারা যায় না। গানের কথাগুলো ছিল—

কি আশ্চর্য! কি আশ্চর্য!
যীশু আমারি!
মন্ত্রী, মহান ঈশ্বর, শান্তিরাজ
তিনি উদ্ধার করেন, রক্ষা করেন
পাপ ও কলংকে,
অত্যাশ্চর্য্য আমার ত্রাতা,
গৌরব দিই তাঁকে।

সেখানে কেউ কিছু প্রচার করে নি, কিন্তু আমি গানগুলোর মধ্যে দিয়ে অনেক কিছু শিখলাম। যীশুর সংগে এই খ্রীষ্টানদের যে সম্পর্ক

তার সংগে হিন্দুদের উৎসবের রীতি অনুযায়ী দেব-দেবতাদের সন্তুষ্ট করার মধ্যে কি পার্থক্য! আমি কখনও শুনি নি যে, কোন হিন্দু দেবতা "আশ্চর্য" অথবা "পরামর্শদাতা"। কেউ তো কখনও শিব সম্বন্ধে কিম্বা তাঁর স্ত্রী কালী সম্বন্ধে কিম্বা তাঁদের প্রিয় ছেলে গনেশ সম্বন্ধে এই রকম গান গায় না। আর এরা যীশুকে বলছে শান্তির রাজা! তাই তো মলি বলেছিল শান্তি পাবার জন্য তার আর যোগ সাধনা করার দরকার হয় না। গানের সেই সহজ-সরল কথাগুলো আমার অন্তরে যেন জ্বলতে লাগল। যীশু কেবল পাপ থেকে উদ্ধারই করেন না; কিন্তু তিনি সমস্ত পাপ ও লজ্জা থেকে আমাকে দূরে রাখেন। কি সুন্দর সংবাদ! এই লোকেরা নিশ্চয়ই তা পেয়েছে তা না হলে এত উৎসাহ ও আনন্দ নিয়ে তারা এই গান গাইত না।

আমরা যখন আরও অন্যান্য গান গাইছিলাম, তখন আরও কয়েকজন লোক এসে যোগ দিল। তাতে লোকসংখ্যা পনেরতে গিয়ে দাঁড়াল। শেষে সেই মেয়েটি বসে পড়ল এবং একজন যুবক যাঁকে আমি এখানে ঢুকবার সময় লক্ষ্য করি নি, সামনে আসলেন।

তিনি একটু হেসে বললেন, "আজ এই সন্ধ্যাবেলা আমাদের এই সুখবরের সভায় আপনাদের সবাইকে স্বাগতঃ জানাচ্ছি। আপনাদের হাতে গানের যে কাগজ আছে তার ১০ নম্বরটা দেখুন।" সেটাই ছিল কাগজের শেষ গান।

আমার চোখকে আমি যেন বিশ্বাস করাতে পারছিলাম না। প্রাইমারী স্কুলে পড়ার সময় এ-ই ছিল ভয়ংকর দুষ্ট ছেলেদের মধ্যে প্রধান। সে ছিল একজন মুসলমান ছেলে। এই ছেলেটিকে আমি ভীষণ অপছন্দ করতাম! তাকে এখন একেবারে অন্যরকম লাগছে। এখন যে গানটা সে সবাইকে গাইতে অনুরোধ করল সেটা আমাকে বিস্ময়ে স্তম্ভিত করে দিল, বিশেষ ভাবে তার ধূয়াটা—

আলো, সূর্যের আলো আছে আজ আমার অন্তরে,
আলো, সূর্যের আলো আছে আমার সারা পথ ধরে।
যখন উদ্ধারকর্তা আমায় খুঁজে পেলেন

আর আমার পাপ দূর করলেন,
তখন থেকে তাঁর ভালবাসার আলো
আছে আমার অন্তরে।

ঐ সাধারণ কথাগুলো কি গভীর প্রভাবই না বিস্তার করল আমার উপর! প্রতিদিনই আমি সূর্যের উপাসনা করতাম কিন্তু আমার ভিতরটা রয়ে যেত অন্ধকার ও ঠাণ্ডা। আর এই লোকেরা সূর্যের আলো তাদের অন্তরে আছে বলে গান গাইছে। এই সূর্যের আলো হল ভালবাসার আলো! আমার অন্তরে এই উত্তেজনা ও আশ্চর্যের মনোভাব যেন আর ধরে রাখতে পারছিলাম না। তাঁর ভালবাসার আলো অন্তরের ভিতরে! আমার ভিতরে আগে কোন ভালবাসা ছিল না যার বিষয়ে আমি গাইতে পারতাম! আমি কত পরিশ্রম করে ধর্ম পালন করতাম অথচ আমার অন্তরে ছিল অনেকের প্রতি ঘৃণা। আমি এমন হিন্দু সাধুদের বিষয় জানি যাঁদের অন্তরে আছে প্রচুর বিদ্বেষ ও ঘৃণা। পণ্ডিতদের মধ্যে আছে ঈর্ষার মনোভাব। তাঁরা একে অন্যকে প্রচণ্ডভাবে ঘৃণা করেন। কিন্তু এই খ্রীষ্টানেরা গান করছে যে, খ্রীষ্টের ভালবাসা তাদের মধ্যে আছে। সেই ভালবাসা কত খাঁটি, উজ্জ্বল এবং সত্যি— কেবল ভালবাসার ধারণা নয় সেজন্যই তারা সেই ভালবাসাকে সূর্যের আলোর সংগে তুলনা করছে আর সেই ভালবাসা তাদের অন্তরে আছে। সেই ভালবাসা আমিও আমার অন্তরে পেতে চাই। আর কয়েকটা গান গাইবার পরে প্রচারক আবদুল হামিদ সামনে আসলেন এবং চাঁদা দেবার জন্য একটা থালা সকলের সামনে ধরা হল। আমি সেখানে এক পয়সা দিলাম আর দেখলাম সেই অল্প সংখ্যক লোক কিছু না কিছু দিল। আমি ভাবলাম কি করুণ অবস্থা! পূজার সময় আমি যে প্রচুর পরিমাণে টাকা পেতাম তার সংগে এর তুলনাই হয় না। নিশ্চয়ই পালক খুব বিরক্ত হবেন!

কিন্তু কি ভুল ধারণাই না আমি করলাম! ঐ কয়েকটা পয়সা যখন সামনে আনা হল তখন আবদুল হামিদ তার চোখ বন্ধ করে এই প্রার্থনা করলেন, "স্বর্গের পিতা, আমাদের সমস্ত অন্তর দিয়ে তোমার দেওয়া

এই আশীবাদ আমরা গ্রহণ করলাম। তোমার কাজের জন্য তা প্রার্থনা করে সাবধানে ব্যবহার করতে আমাদের সাহায্য কর। আমরা যীশুর নামে এই প্রার্থনা করি। আমেন।"

আমি ঐ কয়েকটা পয়সা "প্রার্থনা করে সাবধানে" ব্যবহার করার কথা মনে করে হাসলাম। পণ্ডিতেরা পূজার দান বা তাঁদের পাওনা টাকা হনুমান অথবা অন্য কোন দেবতার গৌরবের জন্য কি কখনও ব্যবহার করেন? সেই টাকা তাঁদের খুশীমত তাঁরা ব্যবহার করেন। আমার পায়ের কাছে যে সব টাকা পয়সা রাখা হত তার জন্য আমার কত লোভ ও স্বার্থপরতা ছিল! রামকৈর ফিস্‌ফিস্‌ করে আমাকে আর কৃষ্ণকে বলল, "ঐ প্রচারকের স্ত্রী ও তিনটি ছেলেমেয়ে আছে। তিনি শিক্ষকতা করতেন এবং ভাল বেতন পেতেন আর এখন তিনি সব কিছু ছেড়ে দিয়ে বিনা বেতনে পালকের কাজ করছেন।" কেউ যে এরকম করতে পারে তা আমার ধারণার বাইরে ছিল।

গীতসংহিতা নামে পবিত্র বাইবেলের একটা বইয়ের ২৩ অধ্যায় নিয়ে তিনি খুব সহজভাবে আলোচনা করলেও তার মধ্যে খুব গভীরতা ছিল। দৃঢ় বিশ্বাস ও আত্মিক শক্তিযুক্ত সেই প্রচার শুনে আমার মনে যা হল তা এর আগে কোনদিন হয় নি। মনে হচ্ছিল প্রত্যেকটি কথা বিশেষ ভাবে আমার জন্য খাটে। আমি আশ্চর্য হয়ে ভাবলাম, আমার ভিতরে যে যুদ্ধ চলছে তা এই লোকটি কেমন করে জানল? যে সব প্রশ্ন আমাকে বিরক্ত করত, আমি যা চিন্তা করতাম, যে প্রচণ্ড মতবিরোধ আমার মধ্যে জাগত তা এ কেমন করে জানল? সে তো জানত না যে, আমি আসব!

"সদাপ্রভু আমার রাখাল, আমার অভাব নেই।" এই কথাগুলো শুনে কি যেন আমার মধ্যে লাফিয়ে উঠল। আমার ভিতরে আমি নিশ্চয়তা পেলাম যে, সেই সত্য ঈশ্বর, যিনি রাখাল, তিনিই আমাকে ডাকছেন, তিনি চাইছেন যেন আমি তাঁর একজন মেষ হই। কিন্তু আর একটা স্বর প্রচারকের কথার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও তর্ক করতে লাগল। সেই স্বর আমাকে সতর্ক করে বলল, আমি সব কিছু হারাব, আর জানকী

প্রসাদ শর্মা মহারাজের মত পণ্ডিত হওয়ার যে গৌরব ও সম্মান আমি পেতাম তা-ও হারাব। আমার মা একেবারে ভেংগে পড়বেন! আমার বাবার সুনামের উপর আমি কেমন করে অপমান টেনে আনব? আমার ভেতরে দু'টা স্বর যেন যুদ্ধ করতে লাগল, কিন্তু যে স্বর আমাকে ভাল রাখালের দিকে টানছে তা ভালবাসায় পূর্ণ আর অন্য স্বরটি কর্কশ ভাবে, ধূর্তামির সংগে এবং ভয় দেখিয়ে কথা বলতে লাগল। এটা সত্যি কথা, যে রাখালের বিষয় গীতসংহিতার লেখক বলছেন তিনিই সত্য ঈশ্বর যাঁকে আমি খুঁজে বেড়িয়েছি! যদি আমি তাঁর জন্য সব কিছু হারাই তবে কি আসে-যায়? সৃষ্টিকর্তা যদি আমার রাখাল হন তবে তো আমি আর কিছুই চাই না! এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করার ক্ষমতা যদি তাঁর থেকে থাকে তবে তো তিনি নিশ্চয়ই আমার তত্ত্বাবধান করবেন।

"তাঁর সুনাম রক্ষার জন্যই তিনি আমাকে ন্যায়পথে চালান।" নিজেকে আমি অপরাধী বোধ করলাম, আমার নৈতিক চরিত্র বিশুদ্ধ রাখার জন্য আমার সমস্ত চেষ্টা যে কত অকার্যকর তা বুঝতে পারলাম! হাজার হাজার বার পবিত্র স্নান করার পরেও আমার অন্তরটা পাপে ভরা থেকে যাচ্ছে। কিন্তু এই ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করছেন তিনি আমাকে ন্যায়পথে চালাবেন। তিনি তা এইজন্য করবেন না যাতে আমি গর্ব করতে পারি অথবা আমার কর্ম ভাল হলে আমার পরজন্মে ভাল জন্মলাভ করতে পারি। কিন্তু আমি ক্ষমা পাবার উপযুক্ত না হলেও তিনি আমাকে ক্ষমা করবেন যাতে আমি একমাত্র তাঁরই হতে পারি আর তারপর তিনি আমার জন্য যে জীবন ঠিক করে রেখেছেন সেই জীবন তাঁর ইচ্ছামত কাটাতে আমাকে সাহায্য করবেন। তাঁর ন্যায় পরায়ণতা তিনি আমাকে উপহার হিসাবে দেবেন, অবশ্য যদি আমি তা পেতে চাই। ঈশ্বরের আশ্চর্য দয়া যার বিষয় আমি কখনও শুনি নি তা এখন আস্তে আস্তে বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হল।

"ঘন অন্ধকারে ঢাকা উপত্যকা পার হতে হলেও আমি বিপদের ভয় করব না, কারণ তুমিই আমার সংগে আছ।"
এর ভাষা আমার বুঝতে অসুবিধা হল না। আমি যে ভয় নিয়ে সারাটা

জীবন কাটিয়েছি তা থেকে তিনি আমাকে মুক্ত করবেন— যে সব মন্দ আত্মারা আমাদের পরিবারের লোকদের ভয় দেখাত, যে সব মন্দ শক্তি আমার জীবনে প্রভাব খাটাত, শিব এবং অন্যান্য দেব-দেবতাদের যদি আমি সবসময় সন্তুষ্ট না রাখি— এই সব ভয় আমার মধ্যে লেগেই ছিল। যদি এই ঈশ্বর আমার রাখাল হন তবে আমার আর ভয় হবে না, কারণ তিনি আমার সংগে থাকবেন, আমাকে রক্ষা করবেন এবং তাঁর শান্তি আমাকে দান করবেন।

"আমি জানি সারাজীবন ধরে তোমার মংগল ও অটল ভালবাসা আমার পিছনে পিছনে ছুটে আসবে; আর আমি চিরকাল সদাপ্রভুর ঘরে বাস করব।" প্রচারক বললেন, এর মানে হল— স্বর্গে ঈশ্বরের উপস্থিতির সামনে থাকা। আত্মোপলব্ধির চেয়ে এটা আরও অনেক ভাল।

"প্রভু যীশু খ্রীষ্ট আপনাদের রাখাল হতে চান। আপনাদের অন্তরে কি আপনারা তাঁর স্বর শুনতে পাচ্ছেন? তিনি মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত হবার পরে বলেছিলেন, 'দেখ, আমি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ঘা দিচ্ছি'— এই দরজা হল আপনাদের অন্তরের দরজা— 'কেউ যদি আমার গলার আওয়াজ শুনে দরজা খুলে দেয়, তবে আমি ভিতরে তার কাছে যাব এবং তার সংগে খাওয়া-দাওয়া করব।' তাঁর কাছে এখনই আপনাদের অন্তর খুলে দেন না কেন? কালকের জন্যে অপেক্ষা করবেন না— হয়তো খুব দেরী হয়ে যাবে!" মনে হল প্রচারক বুঝি সোজাসুজি আমাকেই কথাগুলো বলছেন। আমি আর দেরী করতে পারছিলাম না!

আমার ভিতরে যে যুদ্ধ আবার জেগে উঠছিল তাকে ওঠার সুযোগ না দিয়ে আমার আসন থেকে উঠে আমি তাড়াতাড়ি সামনে গিয়ে হাঁটু পাতলাম। পালক আমাকে দেখে হেসে বললেন আর কেউ যীশুকে গ্রহণ করতে চান? আর কেউ নড়ল না। তখন তিনি বিশ্বাসীদের সামনে এসে আমার সংগে প্রার্থনা করতে বললেন। কয়েকজন এসে আমার পাশে হাঁটু পাতল। বছরের পর বছর হিন্দুরা আমার সামনে হাঁটু

পেতেছে আর এখন আমি খ্রীষ্টের সামনে হাঁটু পেতেছি।

পালক বললেন, "আপনি আমার কাছে আসেন নি, এসেছেন যীশুর কাছে। একমাত্র তিনিই আপনাকে ক্ষমা করতে পারেন, শুচি করতে পারেন, আপনার জীবন বদলে দিতে পারেন এবং আপনাকে জীবন্ত ঈশ্বরের সংগে জীবন্ত সম্বন্ধের ব্যবস্থা করতে পারেন।" কোন ব্যাখ্যা ছাড়াই আমি তা বুঝতে পেরেছিলাম। আমি সেখানে হাঁটু পেতে ছিলাম যাতে যে যীশুর বিষয় তিনি বলছিলেন তাঁকে কেমন করে গ্রহণ করতে হয় তা তিনি আমাকে দেখিয়ে দিতে পারেন।

যীশুকে আমার অন্তরে গ্রহণ করবার জন্য আমি পালকের পরে পরে জোরে প্রার্থনা করলাম এবং শেষের কথাগুলো বললাম না। শেষের কথা ছিল, "আমাকে একজন খ্রীষ্টান কর।" আমি যীশুকে চেয়েছিলাম কিন্তু খ্রীষ্টান হতে চাই নি। আমি তখনও বুঝতে পারি নি যে, আমার অন্তরে যীশুকে গ্রহণ করলেই আমি খ্রীষ্টান হব। এ ছাড়া আর কোন উপায়ে প্রকৃত খ্রীষ্টান হওয়া যায় না।

মিঃ হামিদ "আমেন" বলবার পরে আমাকে আমার নিজের ইচ্ছামত প্রার্থনা করতে বললেন। নীচু স্বরে আবেগে অভিভূত হয়ে আমার গলা বন্ধ হয়ে আসছিল। কোন মতে আমি বললাম, "প্রভু যীশু, আমি কখনও বাইবেল পড়ি নি এবং তার মধ্যে যে কি আছে তা-ও আমি জানি না, কিন্তু আমি শুনেছি, আপনি আমার পাপের জন্য কালভেরীতে মরেছিলেন যাতে আমি ক্ষমা পেয়ে ঈশ্বরের সংগে মিলিত হতে পারি। আমার পাপের দরুন মৃত্যুবরণ করার জন্য এবং আমার অন্তরে এসে আমাকে ক্ষমা করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাই। আমি হতে চাই একজন নতুন এবং পরিবর্তিত মানুষ!"

আমি যে ভাবে জীবন কাটিয়েছি তার জন্য অনুতপ্ত হয়ে কাঁদতে লাগলাম। অনুতপ্ত হলাম আমার রাগ, ঘৃণা, স্বার্থপরতা, এবং গর্বের জন্য, যে সব প্রতিমা আমি পূজা করতাম তার জন্য, একমাত্র ঈশ্বরের পাওনা পূজা নিজে গ্রহণ করার জন্য এবং ঈশ্বরকে গরু কিম্বা নক্ষত্র কিম্বা মানুষ ভাবার জন্য। বেশ কয়েক মিনিট ধরে আমি প্রার্থনা

করলাম এবং প্রার্থনা শেষ করার আগেই আমি বুঝতে পারলাম যে, লক্ষ লক্ষ দেব-দেবতাদের মধ্যে যীশুও একজন দেবতা নন। তিনিই আসলে ঈশ্বর যাঁকে জানার জন্য আমার এত আকাংখা ছিল। বিশ্বাসের মাধ্যমে যীশুর সংগে আমার পরিচয় হল এবং আমি জানতে পারলাম যে, তিনিই সৃষ্টিকর্তা তবুও তিনি আমাকে ভালবেসে আমার জন্য মানুষ হয়ে এসে আমার পাপের জন্য মরেছিলেন। এ কথা বুঝবার পরে আমার উপর যে গাঢ় অন্ধকার চেপে বসেছিল তা দূর হয়ে গেল এবং উজ্জ্বল আলোতে আমার অন্তর ভরে গেল। "তাঁর ভালবাসার সূর্যের আলো আমার অন্তরেও আলো দিতে লাগল!"

আকাশপথে অন্যান্য গ্রহে যাত্রা, অপার্থিব সংগীত ও অসাধারণ রং, যোগ সাধনাকালে বিভিন্ন দর্শন, গভীর ধ্যানের মধ্যে উচ্চতর অবস্থার অনুভূতি— এই সব জিনিষ যা একসময় আমার কাছে কত প্রিয় ছিল এবং আমাকে উন্নত করত, তা সবই এখন ধূলা ও ছাই হয়ে গেল। আমি এখন যা অনুভব করছি তা কোন আধ্যাত্মিক যাত্রা নয়। এই বিষয়ে আমি নিশ্চিত হলাম। মলি বলেছিল যীশু নিজেই নিজের প্রমাণ। এখন আমি তার সেই কথা বুঝতে পারলাম। যীশু আমার মধ্যে বাস করার জন্য এসেছেন। তিনি আমার পাপ দূর করে দিয়েছেন। তিনি আমার ভিতরটা বদ্‌লে অন্য রকম করে দিয়েছেন। এর আগে আমি কখনও এইভাবে সুখী হই নি। অনুতাপের অশ্রুজল আনন্দাশ্রুতে পরিণত হল। আমার জীবনে এই প্রথমবার আমি বুঝতে পারলাম সত্যিকারের শান্তি কি জিনিষ। আগের সেই জঘন্য, অসুখী, দুঃখবোধ আর আমার নেই। ঈশ্বরের সংগে এখন যে আমি কথা বলতে পারি তা আমি বুঝতে পারলাম। আমি এখন ঈশ্বরের একজন সন্তান হয়েছি। আমি আবার যেন জন্মগ্রহণ করেছি।

এবার সেই ছোট দলটি গাইতে লাগল, "নিঃসম্বল আমি কিছুই নাই, তোমারই রক্তে আশা পাই; তাই সাহস করি তোমার ঠাঁই ঈশ্বরের মেষ-শিশু আমি আসি হে।" আমি আমার হাঁটুর উপর থেকেই গানের প্রত্যেকটি কথা শুনতে লাগলাম। ঈশ্বরের ক্ষমা পেয়ে অন্তর

মন কৃতজ্ঞতায় ভরে গেল। গানটা আমি যেমন অনুভব করছিলাম ঠিক তাই বলছে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলাম। মনে মনে ভাবলাম গানটার লেখক ঠিক যেমন লিখেছেন সেইভাবেই তিনি নিজে অপরাধ মুক্ত হয়েছিলেন। "মেষ-শিশু" কথাটা শুনেই বুঝতে পারলাম যীশু নম্র, দয়ালু এবং প্রেমিক। মলি য়ীশুর ভালবাসার বিষয় যা বলেছিল তা আমার মনে পড়ল। সেই ভালবাসায় এখন আমার অন্তর ভেসে যাচ্ছে।

ব্রাহ্মণ হিসাবে আমার যে অহংকার ছিল তা অদৃশ্য হয়ে গেল। একজন উচ্চ বংশের হিন্দু হয়ে সেই ধূলোভরা মেঝেতে খ্রীষ্টানদের সামনে হাঁটু পাততে যথেষ্ট নম্রতার প্রয়োজন হয়েছিল। কিন্তু সেটা ছিল মাত্র নতুন অভিজ্ঞতার সূচনা মাত্র। আমার ঈশ্বর যে কত মহান আর আমি কত ক্ষুদ্র তা এবার আমি বুঝতে পারলাম। আমি দেখতে পেলাম নম্রতার অর্থ নিজেকে হেয় করা নয় এবং নিজেকে ঘৃণা করা অথবা নীচু ভাবে দেখা নয়। এটা এই সত্য স্বীকার করে যে, সব কিছুর জন্য আমার সৃষ্টিকর্তার উপর আমি সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। এই সত্য মেনে নেওয়াতে আমার সামনে একটা সম্পূর্ণ নতুন জীবনের দরজা যেন খুলে গেল।

সেই ছোট দলের প্রত্যেকে চোখে আনন্দাশ্রু ও মুখে হাসি নিয়ে আমার চারপাশে ভীড় করে এসে গভীরভাবে আমার সংগে হাত মিলিয়ে ঈশ্বরের পরিবারে আমাকে স্বাগত জানাল। আমি কখনও এইরকম আনন্দ অনুভব করি নি, কখনও অন্য লোকদের ভালবাসা অথবা কারও সংগে একত্ব অনুভব করি নি, এমন কি, নিজের আত্মীয়-স্বজনের সংগেও না। কল্পনা করা যায় না যখন শান্তি এসে আমাকে শুভেচ্ছা জানাল। সে আনন্দে যেন ফেটে পড়ছিল। আমরা এখানে ঢুকবার কিছুক্ষণ পরেই শান্তি এসেছিল আর আমি জানতামই না যে, শান্তি ওখানে আছে। শান্তি গাঢ়স্বরে বলল, "রাব্, তুমি যীশুকে তোমার জীবনে গ্রহণ করেছ তাতে আমি খুব খুশী হয়েছি! তুমি এতদিন যা করেছ তার মধ্যে এটাই সব চেয়ে ভাল কাজ।" আমরা এতদিন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলাম কিন্তু এখন আমাদের মধ্যে একটা নতুন

সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছে। শান্তিও ঈশ্বরের পরিবারের একজন হয়েছে!

বাড়ী ফেরার পথে রাস্তার দুধারের লম্বা লম্বা আখগুলো আমাকে চেপে চেপে ধরছিল আর চাঁদের ম্লান আলোতে পাতাগুলো চক্‌চক্‌ করছিল আর সমুদ্রের বাতাসে সেগুলো নেচে নেচে উঠছিল। আর তারাগুলো! ওগুলো যে এত উজ্জ্বল আমি তা কখনও লক্ষ্য করেছি বলে মনে পড়ে না। প্রকৃতিকে আমি সবসময় ভালবাসতাম, কিন্তু এখন তা আমার কাছে আগের চেয়ে দশগুণ বেশী সুন্দর বলে মনে হল। আগে আমি গ্রহ-নক্ষত্রগুলোকে পূজো করতাম কিন্তু এখন আমি ওগুলোকে ভিন্ন চোখে দেখছি। যে ঈশ্বরকে আমি জেনেছি তিনিই ওগুলো সৃষ্টি করেছেন। সেই সৃষ্টিকর্তার শক্তি, শিল্পদক্ষতা ও জ্ঞানের প্রশংসায় আমি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলাম। আমি চিরকাল তাঁরই উপাসনা করব, তাঁকে বলব আমার জীবনের জন্য আমি তাঁর কাছে কত কৃতজ্ঞ! আমি আর আগের মত আমার জন্মের জন্য দুঃখবোধ করছি না। আমি জীবিত— চিরকালের জন্য জীবিত থাকব বলে খুব খুশী হলাম। আমরা তিনজন খুব খুশী মনে হেঁটে চললাম এবং সেই রাতে শেখা গানগুলো গাইতে গাইতে, খ্রীষ্টান শব্দের অর্থ আলোচনা ও নতুন-জানা পদগুলো বলতে বলতে চললাম।

শেষে বাড়ীতে ফিরে কৃষ্ণ আর আমি বাড়ীর সবাইকে এক জায়গায় দেখতে পেলাম। অবশ্য বড়মামা ও মামীমা সেখানে ছিলেন না। সবাই বসবার ঘরে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। শান্তি আমাদের আগেই গাড়ী করে ঘরে পৌঁছেছিল। মনে হয় কি হয়েছে তা তারা শান্তির কাছ থেকে শুনেছে। খ্রীষ্টানদের সেই সভাতে পরিচিত কেউ যেন আমাকে দেখে না ফেলে সেজন্য আমার ভয় ছিল আর এখন? যীশু আমার অন্তরে আসলে পর সমস্ত ভয় দূর হয়ে গিয়েছিল। আমি যীশুর সুখবর কেবল নিজের মধ্যেই চেপে রাখতে চাইলাম না, চাইলাম যেন সবাই আমার প্রভুকে জানতে পারে।

আমি খুব খুশী হয়ে বললাম, "আজ রাতে আমি যীশুকে আমার জীবনে গ্রহণ করেছি!" এ কথা বলতে বলতে আমি সকলের অবাক

হয়ে যাওয়া মুখের দিলে তাকালাম। "এটা খুবই চমৎকার! তিনি যে এখন আমার কাছে কতখানি তা আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। তবে এইটুকু বুঝতে পেরেছি যে, তিনি আমাকে একটা নতুন মানুষে পরিণত করেছেন।"

রেবতী মাসীমা ধরা গলায় বললেন, "আমি আগে বিশ্বাস করি নি রবি, কিন্তু এখন আমি তোমার মুখ থেকেই শুনলাম। তোমার মা এই বিষয়ে কি বলবেন? তিনি খুব আঘাত পাবেন।" এ কথা বলে তিনি হঠাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন কিন্তু তিনি যে রকম রাগ করবেন ভেবেছিলাম তা করলেন না। মনে হল তিনি এতে খুব আঘাত পেয়েছেন ও হতবুদ্ধি হয়েছেন।

কথাটা রেবতী মাসীমা আমাকে বুঝিয়ে বলতে দিলেন না বলে আমি খুব দুঃখিত হলাম। তাঁর প্রতি এখন আমার নতুন ভাবে ভালবাসা জেগেছে আর চেয়েছিলাম তিনি যেন জানতে পারেন আমি কি শান্তি পেয়েছি। আর দিদিমা? তাঁর প্রতিক্রিয়া যে কি তা আমি বুঝতে পারছিলাম না। আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে আশ্চর্য হয়ে গলাম যে, তাঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

তিনি খুব খুশী হয়ে বললেন, "রবি, তুমি খুব ভাল কাজই করেছ! আমিও যীশুকে অনুসরণ করতে চাই!"

আমি দৌড়ে গিয়ে দিদিমার গলা জড়িয়ে ধরলাম, "দিদিমা, আমি তোমার সংগে যেরকম ব্যবহার করেছি তার জন্য আমি দুঃখিত; তুমি আমাকে ক্ষমা কর! তিনি এত অভিভূত হয়েছিলেন যে, কোন কথা বলতে পারলেন না, তিনি কেবল মাথা নাড়লেন।

শান্তি তার গোপনীয়তা আর রক্ষা করতে পারল না। সে আনন্দে চোখের জল মুছতে মুছতে বলল, "কয়েকদিন আগে আমিও আমার অন্তর যীশুকে দান করেছি।"

তারপর আমরা বসে অনেকক্ষণ ধরে আবেগের সংগে কথা বলতে থাকলাম, খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে আমরা যে একে অন্যকে নতুনভাবে ভালবাসতে শিখেছি তা বললাম। দিদিমা বলতে লাগলেন

কেমন করে শান্তি গত কয়েক রাত পালিয়ে শহরে সভায় গিয়েছিল এবং বাড়ী ফিরে জানলা দিয়ে ঘরে ঢুকবার সময় রেবতী মাসীমার কাছে ধরা পড়েছিল। বড় মামা তাকে খুব মেরেছিলেন। আমি দিদিমাকে আজকের উপদেশের কথা বললাম। তিনি বললেন গীতসংহিতা ২৩ অধ্যায়টি তাঁর খুবই প্রিয়। দাদামশাই তাঁর বাইবেল গুলো নষ্ট করার আগে তিনি গীতসংহিতার অনেক অধ্যায় পড়েছিলেন। শেষে আমরা অনিচ্ছাসত্ত্বেও ঘুমাতে চলে গেলাম।

শু'তে যাবার আগে আমার লুকিয়ে রাখা সিগারেটের বাক্সটা আমি নষ্ট করে ফেললাম। সিগারেট খাবার ইচ্ছা আর আমার ছিল না। পরের দিন সুযোগ পেয়ে রেবতী মাসীমার কাছে এই বলে ক্ষমা চাইলাম যে, এতদিন আমি তাঁর সংগে কি রকম খারাপ ব্যবহার করেছি। এর পরিবর্তে কি করা উচিত তা তিনি বুঝতে পারলেন না। এত বছর যে রবিকে তিনি জানতেন এ রবি সেই রবি নয়। তাঁর চোখে-মুখে একটা অনিশ্চয়তার ভাব দেখে আমি তাঁর জন্য দুঃখিত হলাম। তাকে খুব দুঃখিত দেখাচ্ছিল। তাঁর ভেতরে যে একটা যুদ্ধ চলছে তা আমি বেশ ভাল করেই বুঝতে পারলাম।

বড় মামা তাঁর গাড়ীটা পরিষ্কার করছিলেন। এই গাড়ীটাই আমি একদিন আশীর্বাদ করেছিলাম। আমি তাঁকে সেখানে দেখতে পেলাম। তাঁর মুখোমুখি হওয়া সোজা ব্যাপার ছিল না। আমি যে খ্রীষ্টান হয়েছি তা সোজাসুজি বলতে আমি একটু ইতস্ততঃ করলাম। তারপর তাঁর কাছে গিয়ে বললাম, "বড় মামা, আমি আমার অন্তরে পবিত্র আত্মাকে পেয়েছি।"

তিনি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আশ্চর্য ও বকুনিভরা দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে কড়া সুরে বললেন, "তোমার বাবা ছিলেন একজন কত বড় হিন্দু এবং তোমার মা-ও কত বড় হিন্দু। তোমার মা ভীষণ অসন্তুষ্ট হবেন এই ভেবে যে, তুমি খ্রীষ্টান হয়েছ। তুমি যা করছ তা আর একবার ভেবে দেখ! হয়তো তুমি একটা ভয়ংকর ভুল করছ!"

উত্তরে আমি বললাম, "আপনি যা বলতে চাইছেন তা আমি জানি,

কিন্তু আমি আগেই সমস্ত ক্ষতির বিষয় ভাল করে ভেবে দেখেছি।"

কৃষ্ণ যেভাবে তার মা রেবতী মাসীমাকে সব কথা বলতে পেরেছিল আমরা সেইভাবে কেউই তাঁকে বলতে পারি নি। সে বুঝতে পারল তার মা বেশ কয়েক বছর ধরে তাঁর ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের ব্যাপারে মোহমুক্ত হয়েছেন কিন্তু তা বাইরে দেখাতে সাহস করেন নি। কৃষ্ণ তাঁকে একটা বড় শহরের গীর্জার ঠিকানা দিল। সেটা ছিল বেশ দূরে এবং তিনি সেখানে গেলে কেউ তাঁকে চিনবে না। তার পরের রবিবারে রেবতী মাসীমা একটু ইতস্ততঃ করে একাই সেখানে গেলেন। সেদিন রাতের বেলা তিনি বেশ দেরী করেই ফিরলেন। আমরা, যারা খ্রীষ্টান হয়েছিলাম, তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছিলাম এই বিশ্বাসে যে, আমাদের প্রার্থনার উত্তর আমরা পাব। কি হয়েছে কারও তা জিজ্ঞাসা করার দরকার ছিল না— তাঁর চেহারায় সব কিছু ফুটে উঠল।

তিনি এবং দিদিমা পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন। তারপর রেবতী মাসীমা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে তাঁর চোখ মুছলেন, তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন "রবি!" আমরা একে অন্যকে জড়িয়ে ধরলাম। চোখের জলে আমাদের গাল ভেসে যাচ্ছিল। আমাদের মধ্যেকার ঘৃণা ও তিক্ততা চিরকালের জন্য চলে গেল।

কি আশ্চর্য পাথর্ক্য! পুনর্জন্ম থেকে পুনরুত্থান! শ্লেটখানা ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে গেছে আর আমি এখন আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছি সেই নতুন জীবনের দিকে যা আমি আমার প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে আরম্ভ করেছি।

১৬

নতুনভাবে শুরু

আমাদের পরিবারের কি পরিবর্তন! ঝগড়া-বিবাদ ও তিক্ততার পরিবর্তে এখন আমাদের মধ্যে কি মিল ও আনন্দ! খ্রীষ্ট আমাদের মধ্যে যে পরিবর্তন সাধন করেছেন তা এত মহান যে, আমরা প্রত্যেকে প্রতিদিনই আশ্চর্য হয়ে যেতাম। আমার ও আমার মাসীমার মধ্যে যে ঘৃণার ভাব ছিল তা যেন রাতের দুঃস্বপ্ন, যা থেকে আমরা উভয়েই জেগে উঠেছি। মনে যে ঈর্ষা নিয়ে আমরা ধর্ম পালন করতাম তা আমাদের দু'জনের মধ্যে একটা শত্রুতার ভাব সৃষ্টি করেছিল। একবার এক পারিবারিক পূজার সময়ে রেবতী মাসীমা পিতলের ঘটি ভর্তি পবিত্র জল রাগ করে আমার দিকে ছুঁড়ে মেরেছিলেন। কিন্তু খ্রীষ্ট আমাদের দু'জনকেই পরিবর্তিত করেছেন। এখন আমরা দু'জন দু'জনকে খুব ভালবাসি। তিনি আবার আমার কাছে নতুনভাবে আমার মায়ের মত হলেন আর তাঁর ছেলে কৃষ্ণ, যাকে আমি ঘৃণা করতাম সে এখন আমার ভাইয়ের মত। সত্যিই আমরা দু'জনে খ্রীষ্টের মধ্যে দিয়ে ভাই হয়েছি, অতীত বিদায় নিয়েছে।

ঈশ্বরের দয়ায় এই পরিবর্তন এসেছে। হিন্দু হিসাবে ক্ষমার কোন ধারণা আমাদের ছিল না, কারণ কর্মের মধ্যে ক্ষমার কোন স্থান নেই আর সেইজন্যই আমরা একে অন্যকে ক্ষমা করতে পারতাম না। যীশু খ্রীষ্টের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বর আমাদের ক্ষমা করেছেন বলে আমরা এখন একে অন্যকে ক্ষমা করতে পারি। আমরা জানতে পারলাম খ্রীষ্ট শিক্ষা দিয়েছেন কেউ যদি অন্তর দিয়ে কউকে ক্ষমা না করে তবে পিতা-

ঈশ্বরও তাকে ক্ষমা করবেন না। তিনি আমাদের অন্তরে ক্ষমা করার এমন আত্মা দান করেছেন যে, কারও বিরুদ্ধে আমি কখনও আর রাগ পুষে রাখতে পারব না। "আমি দুঃখিত" বা "আমাকে ক্ষমা কর" এই কথাগুলো আমরা অন্তর থেকে আগে বলতে পারতাম না, কিন্তু এখন আমাদের ঘরে প্রয়োজনে এ সব কথা শোনা যায় আর তাইতে আমাদের অন্তরে আনন্দ বেড়ে যেতে লাগল।

সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা এই যে, আমি এখন বাড়ীর যে কোন কাজে খুশী হয়ে সাহায্য করতে লাগলাম! আমাদের বয়স যাদের ১৩ থেকে ১৯ বছরের মধ্যে আমরা এক সংগে হয়ে আগাছা তুলতাম, প্রতিবেশীরা অবাক হয়ে চেয়ে দেখত যে, আমাদের উঠান এখন কত সুন্দর হয়েছে। এই পরিবর্তন কারও চোখ এড়িয়ে যেত না।

আর একটা পরিবর্তন অবশ্য বাইরে থেকে দেখা যেত না কিন্তু সেটার মূল্য আমাদের কাছে অনেক বেশী ছিল। ভুতুড়ে পায়ের শব্দ যা আমরা ভাবতাম দাদুর আত্মা তা আমরা আর চিলে কোঠায় কিম্বা আমাদের শোবার ঘরের বাইরে রাতের বেলা শুনতে পেতাম না। যে বিশ্রী গন্ধ আমরা সেই পায়ের শব্দের সংগে পেতাম এবং যার কোন কারণ আমরা কখনও খুঁজে বের করতে পারি নি, তা আর পেতাম না। আগে যে সব শব্দ শুনতাম— কে যেন কল বা টেবিলের কাছ থেকে অথবা আলমারীর মধ্যে থেকে কোন জিনিষ নিয়ে মাটিতে আছড়ে ফেলল, তা আর শুনতে পেতাম না। আমরা বুঝতে পারলাম এ সব দাদুর আত্মার কাজ নয়, আমরা যা ভাবতাম তা নয়। এসব মন্দ আত্মার কথা বাইবেলে লেখা আছে। এরা হল সেই স্বর্গদূত, যারা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে শয়তানের সংগে যোগ দিয়েছিল। এরা মানুষকে তাদের দলে টেনে নেবার জন্য ছলনা করে, বিশৃংখলার সৃষ্টি করে। এই সত্যিকারের শক্তিগুলোর পিছনে এবং যে দর্শন সত্য ঈশ্বরকে সৃষ্টিকর্তা ও প্রভু হিসাবে অমান্য করে তাদের পিছনে থেকে কাজ করে। এখন আমি বুঝতে পারলাম যে, এই মন্দ আত্মাগুলোকেই আমি যোগসাধনা ও ধ্যানের মধ্যে দিয়ে দেখতে পেতাম।

আগে যা আমি বুঝতে পারতাম না, আমার কাছে রহস্যের মত লাগত এখন পবিত্র বাইবেলের নূতন নিয়মখানা পড়ে সব কিছু পরিষ্কার হয়ে গেল। আগে প্রশ্ন জাগত— আমি কে, কেন আমি বেঁচে আছি, ঈশ্বর আমার ভাগ্যে কি রেখেছেন ইত্যাদি, ইত্যাদি। আমার সব প্রশ্নের উত্তর যেন পর পর পেয়ে গেলাম। আমি চিন্তা করলাম হাঁটু পেতে বসে আমি ঈশ্বরকে বলব যেন তিনি শাস্ত্রের অর্থ আমার কাছে প্রকাশ করেন; তারপর আমি খুব ধীরে ধীরে একটা একটা করে পদ পড়ব এবং বিশ্বাস করব যে, পবিত্র আত্মা আমাকে বুঝবার শক্তি দেবেন। আমি ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে ঈশ্বরের বাক্য পড়তাম ও প্রার্থনা করতাম— আগে আমি ঘন্টার পর ঘন্টা সূর্য, গরু এবং বেদীর উপরে থাকা দেব-দেবতাদের পূজা করে সময় কাটাতাম। এ ছাড়া অনেকক্ষণ ধরে যোগ-সাধনা ও ধ্যান করতাম। সেই রকম খুব যত্নের সংগে আমি পবিত্র নূতন নিয়মখানা বার বার পড়তাম। আমি এইভাবে পুরাতন নিয়মখানাও পড়ে দেখেছি যে, পবিত্র বাইবেলখানা দুর্বোধ্য, অস্পষ্ট বা পরস্পর বিরোধী নয়, কোন "পুরাকালীন জ্ঞান কিম্বা পৌরাণিক কাহিনী নয়। অপর দিকে শত শত টন ওজনের মিথ্যা প্রমাণ করা যায় না এমন সব জিনিষ জগতের বড় যাদুঘরে রক্ষিত আছে যা প্রমাণ দেয় যে, পবিত্র বাইবেলখানা ঐতিহাসিক এবং অব্রাহাম, দানিয়েল, পিতর, পৌল ইত্যাদি সবাই সত্যি সত্যিই ছিলেন এবং তাঁরা ঈশ্বরকে জানতে পেরেছিলেন। ইস্রায়েল, মিসর, গ্রীস, রোম ইত্যাদি দেশে সত্যিসত্যিই লোকে বসবাস করেছে। আমি দেখেছি প্রত্যেক মানুষের জন্য সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের একটা না একটা উদ্দেশ্য আছে। তিনি ঐতিহাসিক ঈশ্বর এবং তিনি মানুষের জীবনে এবং বিভিন্ন জাতির ব্যাপারে এখনও কাজ করে চলেছেন। পবিত্র বাইবেলে এ কথাও প্রকাশিত হয়েছে যে, ইতিহাসের পরিণতিতে ঈশ্বর কি করবেন— এখন যে সব ঘটনা ঘটছে, বিশেষ করে মধ্য প্রাচ্যে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীর পরিপূর্ণতা দেখে আমি নতুন মন নিয়ে তা পড়তে লাগলাম। আমাদের পরিবারে খুব সুন্দর সময় কটিত যখন আমরা একে একে বলতে শুরু

করতাম ঈশ্বরের বাক্য থেকে আমরা কি শিখেছি বা কি খুঁজে পেয়েছি।

দিদিমা ছোট শিশুর মত বিশ্বাস নিয়ে পবিত্র বাইবেল পড়তেন। এই বইখানা যদি ঈশ্বরের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় তাহলে তিনি দিদিমার কাছে একটা প্রতিজ্ঞা করেছেন। দিদিমা সেটা বিশ্বাস করে সেইমত চলতেন। কথাটা খুব সরল ও সহজ। যীশু অসুস্থকে সুস্থ করেছিলেন তাহলে তিনি তাঁকেও সুস্থ করবেন না কেন? দিদিমা বলতেন, "প্রভু, তুমি আমার কাছে একেবারে বাস্তব। অনেক অনেক বছর আগে তুমি কত আশ্চর্য, আশ্চর্য কাজ করেছিলে, এবং তুমি আজও জীবিত আছ। আমি আবার হেঁটে বেড়াতে চাই। প্রভু, তোমাকে ধন্যবাদ।" তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে, যীশু তাঁকে সুস্থ করবেন।

সত্যিই সেই আশ্চর্য কাজ ধীর ধীরে সাধিত হল। প্রতিদিনই আমরা দেখতাম তাঁর অবস্থার উন্নতি হচ্ছে। তিনি শক্তি পেয়ে একটু একটু করে দাঁড়াতেন, তারপর কোন কিছু ধরে ধরে একটু একটু করে হাঁটতেন। কয়েক সপ্তা পরে তিনি রান্নাঘরে গিয়ে কাজে সাহায্য করতেন, তারপর তিনি সিঁড়ি দিয়ে ওঠা নামা করতেন এবং সিঁড়ি দিয়ে নেমে বাইরে উঠানে গিয়ে ফুল ও পাখী দেখতেন, এতকাল যা তিনি তাঁর জানলা দিয়ে দেখেছেন। তিনি বার বারই বলতেন, "ঈশ্বরের গৌরব হোক্। চিকিৎসা-বিশারদেরা যা করতে পারে নি তা যীশু, যিনি আজও বেঁচে আছেন, তিনি করলেন।

দিদিমা সুস্থ হবার আগে একেবারে হাঁটু পাততে পারতেন না। তাঁর হাঁটুর হাড় যা এত বছর ধরে অব্যবহারের দরুন মনে হত গলে গেছে তা আশ্চর্যভাবে সুস্থ হয়ে গেল এবং তিনি দিনে অন্ততঃ পাঁচ ঘন্টা হাঁটু পেতে প্রার্থনা করতে লাগলেন। মনে হত তাঁর বিশেষ কাজ ছিল মধ্যস্থতা করা। তিনি বাড়ীর বাকী লোকদের, প্রতিবেশীদের ও আত্মীয়দের জন্য প্রার্থনা করতেন যেন তারা খ্রীষ্টকে জানতে পারে ও জীবন্ত ঈশ্বরের সংগে যোগাযোগ-সম্বন্ধ স্থাপন করতে পারে। তাঁর বয়স সত্তর বছর পেরিয়ে গেছিল কিন্তু তিনি ঠিক সকাল ছয়টায় ঘুম

থেকে উঠতেন এবং এগারটা পর্যন্ত হাঁটু পেতে প্রার্থনা করতেন। সকালবেলার খাওয়ার জন্য তিনি সময় নষ্ট করতেন না। তারপর যখন তিনি তাঁর কামরা থেকে বের হয়ে আসতেন তখন তাঁর মুখ থেকে একটা জ্যোতি বের হতে দেখা যেত এবং সবাই বুঝতে পারত যে, তিনি খ্রীষ্টের উপস্থিতিতে এতক্ষণ সময় কাটিয়েছেন।

আমাদের খ্রীষ্টান হবার খবর খুব শীঘ্রই শহরে এবং তার বাইরেও ছড়িয়ে গেল। প্রথমে এ কথা কেউ বিশ্বাস করতে চায় নি। আমরা পাগল হয়ে গেছি এ কথা ভাবা বরং সহজ ছিল। খবরটার সত্যতা যাচাই করার জন্য লোকের পর লোক আমাদের বাড়ীতে আসতে লাগল। অনেকে আমাদের সংগে উত্তেজিত হয়ে তর্ক করত, আবার অনেকে আমাদের মুখে সব কথা শুনে আশ্চর্য হয়ে যেত এবং হতবাক্ হয়ে ফিরে যেত। কিন্তু আশ্চর্য ও হতবাক্ হওয়ার শেষে তা সক্রিয় ঘৃণা ও বিরুদ্ধতায় পরিণত হল। যারা একদিন আমাকে প্রণাম করত এবং ভক্তিভরে আমাকে ডাকত তারা এখন আমাকে দেখলে নাক সিট্‌কে গালাগালি দিত। আমরা তাদের বলতাম সেই সত্য ঈশ্বরের কথা, যিনি মানুষ হয়ে এসে আমাদের পাপের জন্য মরেছিলেন। আমাদের প্রতিবেশীরা ও আত্মীয়-স্বজনেরা খ্রীষ্টের মাধ্যমে দেওয়া ঈশ্বরের ক্ষমা মেনে নিতে প্রথম প্রথম দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করত। সব কথা শুনে যে তাদের কেমন লাগত আমি তা ভাল করেই বুঝতে পারতাম। যতদিন না তারা প্রথার চেয়ে সত্য আরও বেশী প্রয়োজনীয় এ কথা মেনে নিতে চাইল ততদিন কিছুতেই তাদের বুঝানো গেল না।

মলির অনুসন্ধানের ফলে আমরা জানতে পারলাম যে, আমাদের নিজেদের গ্রামেই খ্রীষ্টানদের একটা ছোট দল একসংগে মিলিত হচ্ছে। পরের রবিবারে আমি খুব খুশী মনে অল্প কিছুদূর হাঁটার পর সেই ছোট দলের কাছে গেলাম। ঘরটা খুঁটির উপরে স্থাপিত, রোদ ও হঠাৎ-আসা ঝড়বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচবার জন্য ছাদটা বেশ নীচু। আমি যখন যাচ্ছিলাম তখন একজন স্ত্রীলোক চিৎকার করে বলল, "এই, তোমরা সবাই এসে দেখ যীশু খ্রীষ্টকে; তিনি হেঁটে চলে

যাচ্ছেন।"

আমি হেসে বললাম, "আমি যীশু খ্রীষ্ট নই, তবে আমি খুব খুশী যে, আমি তাঁর একজন শিষ্য।"

ঐ ছোট গীর্জাঘরটি মাত্র কয়েকজন খ্রীষ্টান মিলে তৈরী করেছে—পূর্ব ভারতীয় কয়েকজন নীচু জাতির লোক আর কয়েকজন কালো লোক। হিন্দু থাকা কালে আমি তাদের কারও সংগে মিশতে পারতাম না। কিন্তু তারা আমাদের সাদরে আমন্ত্রণ জানাল। আমার নিজের কাছেই কত আশ্চর্য লাগল, যাদের আমি একদিন তুচ্ছ ও ঘৃণা করতাম এখন তাদের জড়িয়ে ধরে ভালবাসা জানাতে পারছি। আমি এখন আমার প্রভু খ্রীষ্টের ভালবাসায় তাদের ভালবাসি এবং ভাই-বোন হিসাবে আলিংগন করতে পারি। যে ধর্মকে এতদিন আগ্রহের সংগে পালন করে এসেছি তাতে জাতিগত ও বর্ণগত যে বৈষম্য ছিল, যা একজন হিন্দুর মন থেকে কখনও দূর করা যায় না, সেই বৈষম্য এখন আমার মধ্যে থেকে দূর হয়ে গেছে। এই বৈষম্যের যুক্তি হল কর্ম ও পুনর্জন্ম, যার ফলে নীচু জন্ম থেকে ক্রমশঃ উপরে উঠতে উঠতে একদিন মানুষকে ব্রহ্মার সংগে মিলিত হতে হবে। ধ্যানের মাধ্যমে যে উচ্চতর চেতনা লাভ হয় তার অতি সূক্ষ্ম বিস্তৃতি হল জাতিভেদ প্রথা। একদিন এই প্রথা আমার কাছে খুব পবিত্র ছিল, কিন্তু আমি এখন দেখতে পাচ্ছি এই প্রথা কত মন্দ, যার দ্বারা মানুষে মানুষে ভেদাভেদ সৃষ্টি করেছে এবং এতে কিছু লোককে পৌরাণিকী মহত্ব দান করেছে, অপর দিকে অন্য লোকদের দোষী সাব্যস্ত ও পৃথক করে ঘৃণার উপযুক্ত করেছে।

* * * * * *

বড়দিনের ছুটীতে আমার জ্যাঠামশাই রামচাঁদ আমাকে তাঁর বাড়ীতে যাবার জন্য নিমন্ত্রণ জানালেন। এর আগে আমি অনেকবার সেখানে গিয়ে খুব আনন্দে দিন কাটিয়েছি। আমি সেখানে যাবার

সংগে সংগেই জ্যাঠামশাই সময় নষ্ট না করে আমাকে আগ্রহের সংগে বুঝাতে লাগলেন।

"রবি, তোমার সম্বন্ধে আমি কতগুলো অদ্ভুত কথা শুনেছি। তোমার বাবা কেমনভাবে জীবন কাটিয়েছিলেন তা তো তুমি ভাল করেই জান। তিনি হিন্দুদের সব চেয়ে মহান আদর্শ দেখিয়ে গেছেন। তোমার মা-ও খুব পবিত্র মহিলা এবং আমাদের মহান ধর্মের প্রতি তাঁর কত আনুরাগ।" জ্যাঠামশাই মনের ভাব ছিল যে, আমি তখনও হিন্দুই আছি।

আমার জন্য তাঁর এই উদ্বেগ দেখে আমি গম্ভীরভাবে মাথা নাড়লাম। তিনি মাংস খেতেন বলে আমার মেজাজ একবার কেমন বিগড়ে গিয়েছিল তা মনে পড়ে গেল। খ্রীষ্টান হবার পরে আমার স্বাস্থ্যের জন্য আমি ডিম ও সামান্য মাংস খেতাম। আমি আগে খুব অসুস্থ থাকতাম, কারণ আমিষ জাতীয় খাদ্য আমার খাবারের মধ্যে একেবারেই থাকত না। আমার জ্যাঠামশাই নিজে মাংস খেলেও মনে করতেন মাংস খাওয়া ধর্ম বিরুদ্ধ কাজ— সব কিছুর যে একতা আছে তাতে দেখা যায় যে, সর্ব নিম্ন জাতীয় প্রাণীর মধ্যেও পবিত্রতা আছে। একটা প্রাণীকে খাওয়া একটা মানুষ খাওয়ার সমান। যে ধর্ম তিনি নিজে পালন করেন না তা থেকে সরে আসার জন্য তিনি আমাকে বকাবকি করলেন।

তিনি বললেন, "মাইলের পর মাইল জুড়ে লোকে আমাদের পরিবারের দিকে তাকিয়ে আছে। সবাই জানে তুমি খাবার নিয়মকানুন কেমনভাবে পালন কর। তুমি এতদিন যত পরিশ্রম করেছ তা থেকে সরে গিয়ে ভুল করছ এবং সব কিছু হারাচ্ছ!"

"কিন্তু আমি বিশ্বাস করি যীশুই একমাত্র সত্য ঈশ্বর এবং পাপের উদ্ধারকর্তা। তিনি আমাদের পাপের জন্য মৃত্যু বরণ করেছিলেন।" কথাগুলো আমি তাঁকে খুব নম্রভাবে সম্মানের সংগে বললাম যাতে তিনি দুঃখ না পান। আমি তাঁকে খুব ভালবাসতাম।

জ্যাঠামশাই উঁচু তাকের উপর থেকে ভগবদ্গীতাটা নামালেন

এবং আস্তে আস্তে তাতে জড়ানো গাঢ় কমলা রংয়ের কাপড়টা খুললেন। তারপর বললেন, "দেখ, গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ কি বলছেন, 'যখন ধার্মিকতার ক্ষয় হবে তখন আমি উত্তমকে রক্ষা করতে ও পাপীদের ধ্বংস করতে আবার আসব; আমি যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করি।" তিনি খুব ধীরে ধীরে কথাগুলো পড়লেন এবং আমার কি পরিবর্তন হয় তা লক্ষ্য করতে লাগলেন।

তিনি বললেন, "তাহলে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, শ্রীকৃষ্ণ যীশু হয়ে ফিরে এসেছিলেন। যে সব হিন্দুরা যীশুকে জানে তারা সবাই জানে যে, যীশু দেবতাদের মধ্যে একজন। তোমার তো খ্রীষ্টান হবার দরকার নেই, কারণ তুমি তো জানই যে, যীশু একজন দেবতা। সেইজন্যই যারা খ্রীষ্টানদের ঘরে জন্মায় তারা খ্রীষ্টান— কিন্তু তুমি তো হিন্দুর ঘরে জন্মেছ। তুমি যা-ই বিশ্বাস কর না কেন তোমার ধর্ম পরিবর্তন কোরো না। তুমি সব সময় হিন্দুই থাকবে।"

আমি ভদ্র অথচ দৃঢ়ভাবে বললাম, "কিন্তু আমি তোমার সংগে একমত নই, "যীশু বলেছেন যে, তিনিই পথ, তিনি অনেক পথের মধ্যে একটা পথ নন। তাহলে অন্য সকলেই বাদ পড়ে যাচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ নিজের সম্বন্ধে বলেছেন যীশু তেমন বলেন নি, তিনি বলেছেন, তিনি পাপীদের ধ্বংস করতে নয় বরং উদ্ধার করতে এসেছেন। এই কাজ আর কেউ করতে পারেন না। যীশু অনেক দেবতার মধ্যে একজন নন। তিনিই একমাত্র সত্য ঈশ্বর। তিনি মানুষ হয়ে এই পৃথিবীতে এসেছিলেন— কেবল কেমনভাবে জীবন কাটাতে হবে তা দেখাতে নয় বরং আমাদের পাপের জন্য মৃত্যু বরণ করতে এসেছিলেন। যীশু মৃত্যু থেকে পুনর্জীবিত হয়েছিলেন। আমি এখন পুনর্জন্মে বিশ্বাস করি না, কারণ পবিত্র বাইবেল বলে, মানুষ একবার মাত্র মরবে আর তারপরে তার বিচার হবে।"

আমার জ্যেঠিমা দুঃখিত মনে সব শুনছিলেন; খুব কষ্ট করে তিনি কান্না চেপে রেখেছিলেন। জ্যোঠামশাইকে খুব হতাশ দেখাচ্ছিল। তিনি খুব খাঁটি ও দয়ালু লোক ছিলেন। আমি তাঁকে খুব সম্মান

সম্মান করতাম। কিন্তু কিছুতেই তিনি প্রমাণের বিষয় চিন্তা করে দেখছিলেন না এবং হিন্দুধর্মকে যুক্তি দিয়ে বুঝতে চাইছিলেন না এবং তার অসামঞ্জস্যের দিকেও দেখছিলেন না। তাঁর বিশেষ চিন্তা ছিল, যে ধর্মের মধ্যে আমি জন্মেছি তার প্রথা যেন আমি লংঘন না করি। সব দেবতাদের মধ্যে আমি যদি যীশুকে যুক্ত করি তাতে তাঁর কোন আপত্তি নেই, কিম্বা আমি যদি কোন দেব-দেবতাকে বিশ্বাস না-ও করি তাতেও তাঁর আপত্তি নেই, তবে আমি যেন নিজেকে হিন্দু বলি। কিন্তু আমার কাছে ধর্ম কোন প্রথার বিষয় নয়— তা সত্যের বিষয়। প্রায় একঘন্টা আলোচনার পর দেখা গেল যে, আর আলোচনায় কোন লাভ হবে না। আমি সেই দিনই বাড়ী ফিরে গেলাম।

গোঁসাই কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলেন না যে, আমি খ্রীষ্টান হয়ে গেছি। জ্যেঠামশাইয়ের মত তিনিও বিশ্বাস করতেন যে, লক্ষ লক্ষ দেবতার মধ্যে যীশুও একজন দেবতা এবং খ্রীষ্টধর্ম ব্রহ্মার কাছে পৌঁছাবার আর একটা পথ। তিনি আমাকে অনেকবার বলেছেন, "ভাই, আমি তোমাকে একটা কথা বলি— সমস্ত পথ গিয়ে এক জায়গায় পৌঁছায়।" আমি তাঁকে যুক্তি দিয়ে বুঝাবার চেষ্টা করলাম যে, তিনি যেখানে গিয়ে পৌঁছাবেন আমি সেখানে গিয়ে পৌঁছাব না। যীশু ইহুদীদের তাঁর উপর বিশ্বাস করতে বলেছেন, না হলে, "তোমরা তোমাদের পাপে মরবে; আমি যেখানে যাচ্ছি তোমরা সেখানে যেতে পারবে না।" কিন্তু কোন লাভই হল না। গোঁসাই তাঁর বিশ্বাস ত্যাগ করতে রাজী নন— আমি যত প্রমাণই দিই না কেন তাতে কিছুই হল না। আমরা আর কথা চালাতে পারলাম না। এতে আমি খুবই দুঃখিত হলাম।

আমি নিশ্চিত ছিলাম যে, আমাদের প্রিয় বন্ধু পণ্ডিত জানকী প্রসাদ শর্মা মহারাজ নিশ্চয় একবার এসে দেখতে চাইবেন, যে গুজব রটেছে তা সত্যি কি না এবং তিনি চেষ্টা করবেন যাতে আমরা খ্রীষ্টান ধর্মের এই পাগলামী ছেড়ে দিই। ঠিক তাই হল: একদিন হঠাৎ তিনি ঢুকেই একবার চারদিকে তাকিয়ে নিলেন এবং দুঃখিত হয়ে লক্ষ্য করলেন,

হিন্দু দেবতাদের যে ছবিগুলো আমাদের দেয়ালে দেয়ালে টাংগানো ছিল তা আর নেই। আমরা তাঁকে বসবার জন্য একটা চেয়ার দিলে তিনি তাতে ধপাস্ করে বসে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন।

তিনি দুঃখিত হয়ে বললেন, "আমি বুঝতেই পারছি না যে, লোকে কেন তোমাদের সম্বন্ধে এত মিথ্যা কথা বলে? লোকে বলে তোমরা নাকি এখন সবাই খ্রীষ্টান।" বাবার চোখ ভরে জল এল। তিনি জোরের সংগে বললেন, "আমি বিশ্বাস করি না। তোমরা আমাকে বল লোকে কেন এমন কথা বলছে?" আমরা সবাই তাঁকে খুব ভালবাসতাম। সেই বুড়ো দয়ালু লোকটির চোখে-মুখে গভীর উদ্বেগের ছায়া পড়েছিল।

রেবতী মাসীমা হিন্দিতে বললেন, "কিন্তু বাবা, কথাটা তো সত্যি।"

তিনি আমার দিকে ফিরলেন, তাঁর চোখ খুব দুঃখে ভরা। তিনি বললেন, "আজ যদি তোমার বাবা বেঁচে থাকতেন তিনি কি মনে করতেন? আর তুমি রবীন্দ্রনাথ জী — না, আমি বিশ্বাস করি না। কে তোমাকে দুঃখ দিয়েছে? আমি জানি অনেক পণ্ডিত সৎ নয়? আমাকে বল কি হয়েছে?

আমি তাড়াতাড়ি উত্তর দিয়ে বললাম, "বাবা, কেউ আমাদের দুঃখ দেয় নি।" আমরা খুঁজে দেখেছি যে, যীশুই সত্য এবং তিনি আমাদের ক্ষমা করেছেন এবং প্রকৃত শান্তি দিয়েছেন। তিনি আপনাকেও ভালবাসেন এবং আপনার পাপের জন্যও মরেছিলেন। আপনিও তাঁর মধ্যে দিয়ে পাপ থেকে উদ্ধার পেতে পারেন।"

তিনি হতবুদ্ধি হয়ে তাকিয়ে রইলেন, মনে হল ক্ষমা পাওয়ার ধারণাটা তিনি বুঝতে পারছেন না। আগে আমার অবস্থাটাও তা-ই হয়েছিল। মনে হল তিনি বিব্রত হয়েছেন, কি বলবেন বুঝতে পারছেন না। কুমার মামার দিকে তাকিয়ে তিনি পাগলের মত জিজ্ঞাসা করলেন, "আর তুমিও?"

কুমার মামা হঠাৎ ইংল্যাণ্ড থেকে বাড়ী ফিরে এসে যখন বললেন

তিনি খ্রীষ্টান হয়েছেন তখন আমরা সবাই আশ্চর্য হয়েছিলাম।

কুমার মামা সম্মানের সংগে বললেন, "তিন বছর আগে যখন আমি ত্রিনিদাদ ছেড়ে যাই তখন আমি কেমন মদখোর ছিলাম তা তো আপনি জানেন। কর্ম আমাকে পরের জন্মে আরও নীচু স্তরে নামিয়ে দিত। আপনি তো জানেন অনেক পণ্ডিতের অবস্থা সেই রকম এবং ধর্ম পালন করে কিছুই পরিবর্তন হয় নি। আমার আশা ছিল যে, লণ্ডনে আমি নতুন করে সব কিছু শুরু করব। একবার কল্পনা করে দেখুন আমার অবস্থা! যখন ত্রিনিদাদের আমার একজন মদখোর সংগী লণ্ডনে আমার কাছে আসল। আমি তাকে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলাম যে, সে একেবারে বদলে গেছে। সে বলল সে খ্রীষ্টান হয়েছে এবং খ্রীষ্ট তাকে মদ খাওয়ার নেশা থেকে মুক্ত করেছেন। এ কথা শুনে আমার খুব ভাল লাগল তবে আমি তার ধর্মের সংগে একমত ছিলাম না তাই বললাম, "তুমি তো সবসময় খ্রীষ্টানই ছিলে।" তখন সে আমাকে বুঝিয়ে বলল যে, এমন অনেকে আছে যাঁরা নিজেদের খ্রীষ্টান বলে, কারণ তারা সেই সমাজের সংগে যুক্ত; কিন্তু তারা কখনও খ্রীষ্টকে চেনে নি ও তাঁর শিষ্যও হয় নি।

তারপর কুমার মামা বলতে লাগলেন "আমি তার মদ খাওয়ার চেয়ে তার খ্রীষ্ট ধর্ম সম্বন্ধে আরো বেশী ভয় পেলাম। আমি ভদ্র ব্যবহার করলাম এবং লণ্ডন শহরটা তাকে ঘুরিয়ে দেখাতে চাইলাম। সে ত্রিনিদাদের একজন ভাল বক্তা ছিল বলে তাকে আমি প্রথমেই হাইড পার্কের বক্তাদের জায়গা দেখাতে নিয়ে গেলাম। আমরা ঘুরতে ঘুরতে ও বক্তৃতা শুনতে শুনতে একজন যুবকের কাছে আসলাম। সে খ্রীষ্টের কথা বলছিল। আমি সবই জানতাম কিন্তু শুনতে চাইলাম না। আমি আমার ঘরে ফিরে গেলাম কিন্তু আমার বন্ধু ও সেই যুবক যা বলেছিল তা ভুলতে পারলাম না। আমার শোবার ঘরে হাঁটু পেতে আমি যীশুকে আমার পাপ ক্ষমা করতে বললাম এবং বললাম তিনি যেন আমার প্রভু ও উদ্ধারকর্তা হয়ে আমার অন্তরে বাস করেন। বাবা, আমি আপনাকে খুশী হয়েই বলছি যীশু আমাকে পরিপূর্ণ শান্তি

দিয়েছেন এবং আমাকে একজন নতুন মানুষে পরিণত করেছেন। আপনার কি মনে আছে আমার মা আমার মদ খাওয়া সম্বন্ধে এবং মদের পিছনে অনেক টাকা খরচ করা সম্বন্ধে কেমন আপত্তি করতেন? এখন আমার মদ খেতে আর ইচ্ছাই করে না।

কুমার মামার এইরকম পরিবর্তন দেখে অবিশ্বাসে বাবার চোখ বড় হয়ে গেল। তাঁর মুখে কোন কথা নেই দেখে রেবতী মাসীমা সামনের দিকে ঝুঁকে সেই বৃদ্ধ লোকটির মুখের দিকে তাকিয়ে খুব আগ্রহের সংগে বললেন, "বাবা, আমার কথা এবার বলি— একদিন আমি ঠাকুর ঘরে পূজা করছিলাম এমন সময় কে যেন আমাকে বললেন, "আমিই পথ, সত্য ও জীবন— আমার মধ্যে দিয়ে না গেলে কেউ পিতার কাছে যেতে পারে না।" আমি বুঝলাম যিনি আমার সংগে কথা বলছিলেন তিনি যীশু। এর কিছুদিন পরে আমি তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করলাম এবং তিনি আমাকে একজন নতুন মানুষে পরিণত করেছেন। গত সব কিছু অতীত হয়ে গেছে, আমার পাপ ক্ষমা হয়ে গেছে আর আমি চিরকাল স্বর্গে থাকতে পারব। শুনুন, যীশু কি বলছেন, 'ঈশ্বর মানুষকে এত ভালবাসলেন যে, একমাত্র পুত্রকে তিনি দান করলেন, যেন যে কেউ সেই পুত্রের উপরে বিশ্বাস করে সে বিনষ্ট না হয়, কিন্তু অনন্ত জীবন পায়।' পাপ থেকে এই উদ্ধার সব দেশের, সব জাতির ও বর্ণের লোকদের জন্য। এটা আপনার জন্যও বটে! ঈশ্বর আপনাকে ক্ষমা করে অনন্ত জীবন দেবেন। অবশ্য যদি আপনি আপনার অন্তরে কেবল যীশুকে গ্রহণ করেন এবং তাঁর উপর বিশ্বাস করেন।"

বাবা তখনও হতবুদ্ধি হয়ে কথা বলতে পারছিলেন না। তিনি একে একে আমাদের সকলের মুখের দিকে তাকাতে লাগলেন এবং বুঝতে পারলেন তিনি তাঁর সবচেয়ে ভাল ভাল শিষ্যদের হারালেন। তিনি আস্তে আস্তে দাঁড়ালেন; তিক্ত হতাশার চিহ্ন তাঁর মুখে ফুটে উঠল। তিনি খুব ভদ্র ও দয়ালু ছিলেন। তিনি আমাদের বন্ধু থাকতে চাইছিলেন, কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম যে, তিনি একটা প্রচণ্ড আবেগ থামাতে চাইছেন। তাঁকে বিদায় জানাবার সময় আমাদের

অন্তর দুঃখে ভরে উঠল। বাবার সংগে আর আমার দেখা হয় নি।

যে সব লোকেরা আগে বলত হিন্দুদের মন খুব উদার এবং হিন্দুধর্ম সব ধর্মকেই মেনে নেয়, তারাই এখন আমরা যীশু খ্রীষ্টের শিষ্য হয়েছি বলে আমাদের পরিত্যাগ করল। আমরা যেন আবার আমাদের পূর্বপুরুষদের ধর্মে ফিরে আসি সেজন্য তারা আমাদের যতই জোরাজুরি করতে লাগল ততই আমরা পরিষ্কার দেখতে পেলাম যে, ধর্মের প্রতি বিশ্বস্ততা তাদের সত্যের উপর ভিত্তি না হয়ে বরং কৃষ্টিগত প্রথার উপর একটা আবেগভরা যোগাযোগ হয়ে রয়েছে। এমন অনেক হিন্দু আছেন যাঁরা সংস্কৃত মন্ত্রের একবর্ণও বুঝতে না পেরেও সারা জীবন ধরে মন্ত্র আউড়ে যাচ্ছেন। যাঁরা আমাদের সংগে তর্ক করতে আসতেন তাঁরা জানতেন না কেন তাঁরা হিন্দু। জন্ম দ্বারাই তাঁরা হিন্দু। তাঁরা তাঁদের ধর্মের মূল বিষয়ের অনেকগুলো জানেনই না। আমাদের দোষ হল আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের ধর্ম ত্যাগ করেছি— আর সেইজন্য আমাদের সত্যের সব আলোচনাই তাদের কাছে অর্থহীন।

আর সবচেয়ে মজার কথা হল অনেক মুসলমানও আমাদের বিপক্ষতা করছিলেন যদিও তা তাঁদের ধর্ম নয়। একজন মুসলমান বন্ধু আমাকে চেঁচিয়ে বলল, "আমি শুনলাম তুমি নাকি ঐ ঠগ যীশুর শিষ্য হয়েছ?" অথচ তাদের ধর্মগ্রন্থ কোরান শরীফে লেখা আছে যীশু খাঁটি ও নিষ্পাপ জীবন কাটিয়েছিলেন।

প্রথম প্রথম আমরা বুঝতে পারতাম না যারা আগে আমাদের প্রিয় বন্ধু ছিল তাদের অন্তরে যীশুর নামে আমাদের প্রতি এত রাগ ও ঘৃণা কেন? পরে আমরা সুখবরগুলোতে পড়লাম, লেখা আছে যীশু বলেছেন, তাঁর জন্য সমস্ত লোকে তাঁর শিষ্যদের ঘৃণা করবে। কিন্তু আমরা বুঝতে পারছিলাম না কেন লোকে যীশুকে ঘৃণা করবে আর কেন যে তাঁকে ক্রুশে দিয়েছিল তা-ও বুঝতে পারছিলাম না। শেষে বড় মামা দেবনারায়ণ ও তাঁর স্ত্রীর পক্ষে সব কিছু সহ্য করা কঠিন হয়ে দাঁড়াল। আমাদের এই বিরাট পরিবর্তনের আগে মামীমা

পরিবারের কিছু লোকের সংগে কখনও মানিয়ে চলতে পারেন নি। আর এখন আমরা সবাই খ্রীষ্টান হওয়াতে বড় মামা ও মামীমার পক্ষে একই বাড়ীতে বাস করা কঠিন হয়ে দাঁড়াল, তাই তাঁরা বাড়ী থেকে অন্য জায়গায় চলে গেলেন।

* * * * * *

বড় মামা চলে যাওয়াতে আমার পক্ষে প্রতিদিন বাসে করে স্কুলে যাওয়া আসা করা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। কুমার মামার সাহায্যে 'কুইনস্ রয়েল কলেজের' কাছে একটা পরিবারে আমি থাকার জায়গা পেলাম। সেই পরিবারটা ছিল হিন্দু। কলেজ কাছে বলে আমার সুবিধা হত কিন্তু বাড়ীতে মানুষ-জন বেশী ছিল। শোবার ঘর ছিল মাত্র দু'টি আর আমরা মানুষ ছিলাম দশজন। তাঁদের বড় ছেলে হাইস্কুলে পড়ত। সে আমার সংগে বসবার ঘরের মেঝেতে শু'তো। এঁরা আমাদের বন্ধু ছিলেন, কিন্তু এঁরা শোনেন নি যে, আমি খ্রীষ্টান হয়ে গেছি। তাই দিনের পর দিন আমি পারিবারিক পূজায় অনুপস্থিত থাকতে লাগলাম আর একদিন রাতে আমি তাঁদের বললাম, "আমি খ্রীষ্টান হয়েছি।"

পরিবারের লোকেরা অবিশ্বাসের চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। তাদের বাবা হাসতে লাগলেন, ভাবলেন আমি বোধহয় ঠট্টা করছি; কিন্তু যখন তিনি বুঝতে পারলেন এটা ঠট্টার কথা নয় তখন তিনি একটু ঠট্টার সুরে বললেন, "তাহলে তুমি কি বলতে চাইছ যে, তুমি জগতের শ্রেষ্ঠ ধর্ম ছেড়ে আর সব কিছু বাদ দিয়ে খ্রীষ্টান হয়েছ? কেন তুমি তা করলে?"

"যীশু তো ভাল ছাড়া মন্দ করেন নি। তিনি বলেছেন ঈশ্বরের কাছে যাবার জন্য তিনিই একমাত্র পথ।"

তারপর কিছুদিনের মধ্যেই আমরা বুঝতে পারলাম, লোকে বিরক্ত হয় এই কারণে যে, তাদের যত ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান আছে সব

বাদ দিয়ে তাদের পাপের জন্য একমাত্র যীশুর মৃত্যুকে তাদের মেনে নিতে হবে। তাই যীশুর প্রতি যে ঘৃণা তা তাঁর শিষ্য যে আমরা, আমাদের উপর পড়ছে।

* * * * * *

কেউ চিৎকার করে বলছিল, "তোমরা হিন্দু সমাজের লজ্জা ও অপমানের বস্তু! ভণ্ড! বিশ্বাসঘাতক!" চিৎকার শুনে চমকে উঠে আমি দৌড়ে সামনের বারান্দায় বের হয়ে দেখতে গেলাম। কৃষ্ণ আর শান্তি আগেই সেখানে গিয়েছিল। আমাদের বাড়ীর সামনে একটা বড় আমেরিকান মোটর গাড়ী থামানো ছিল। গাড়ীর উপরে একটা 'লাউডস্পীকার' লাগানো ছিল এবং একজন লোক গাড়ীর চালকের পিছনের আসনে বসে 'মাইক্রোফোনে' কথা বলছিলেন। আমরা তাঁকে চিনতে পারলাম— তিনি হলেন ত্রিনিদাদের একজন খুব বড়লোক, ব্রাহ্মণ ও হিন্দুদের নেতা।

"তোমরা ধর্মের দিকে ও তোমাদের পিতৃপুরুষদের দেব-দেবতাদের দিকে পিছন ঘুরিয়েছ। কোন হিন্দু যে এত খারাপ কাজ করতে পারে তা ভাবা যায় না। জগতের সবচেয়ে বড় ধর্ম— সনাতন ধর্ম তোমরা ত্যাগ করেছ! এর উচিত শাস্তি তোমরা পাবে!" মনে হয় তিনি কথাগুলো বলবার জন্য আগেই ঠিক করে এনেছিলেন। এখন তিনি কয়েক মিনিট ধরে রাগের স্বরে সেই কথাগুলো পড়তে লাগলেন আর আমাদের প্রতিবেশীরা যখন রাস্তায় ভীড় করতে লাগল তখন তিনি আরও উৎসাহ পেলেন। পরে গাড়ীটা গর্জন করতে করতে উত্তর দিকে চলে গেল।

"আমি সত্য খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম আর আমি দেখলাম যীশুই সত্য, একমাত্র সত্য ঈশ্বর; তিনি আমাদের জন্য মরেছিলেন।"

সেই বাড়ীর সবাই আমাকে ঐ পথ থেকে ফিরাবার জন্য খুব চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু যখন তারা বুঝতে পারল যে, আমি এ

বিষয়ে একেবারে নিশ্চিত তখন আমার প্রতি তাদের মনোভাব বদলে গেল। আমার পূর্বপুরুষদের ধর্মের প্রতি আমি অবিশ্বাসী হয়েছি বলে তারা আমাকে এড়িয়ে চলতে লাগল। কিন্তু তারা গরুর রান্না করা মাংস তাদের ঘরের সামনে তাদের দোকানের সামনে বিক্রী করতে দিত— এটা তো হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধে। যাহোক্ আমি কিন্তু এ বিষয়ে কোন কথা তাদের বলি নি। প্রায় প্রত্যেকদিন সন্ধ্যাবেলা তাদের বাবা কাজ থেকে মদ খেয়ে ঘরে ফিরতেন। তখন তিনি যীশু খ্রীষ্টের নাম ধরে যে গালি গালাজ করতেন তা আমার উদ্দেশেই করতেন আর আমি কোন উত্তরই দিতাম না। যখন তিনি শান্ত ভাবে থাকতেন তখন মেটামুটি ভদ্রভাবেই চলতেন। খ্রীষ্টানদের উপর পরিবারের সকলের একটা ঘৃণার ভাব থাকলেও তারা অতিথিপরায়ণ হতে চেষ্টা করতেন এবং অনেক ব্যাপারে তাঁরা দয়ালু ছিলেন।

মানুষের বিরুদ্ধতার চেয়েও আমার প্রতি মন্দ আত্মাদের অত্যাচার বেড়ে চলেছিল বলে আমি বুঝতে পারলাম। এই মন্দ আত্মারা কোনভাবেই দয়া প্রকাশ করত না। সেই বাড়ীতে আমার থাকবার জায়গার চারপাশে কতগুলো ভয়ংকর মূর্তি ছিল। আমি সেই মূর্তিগুলোর মুখোসের পেছনে যে আসল মন্দ শক্তি রয়েছে তা জানতাম। আমি ভাবছিলাম এই রকম বাড়ীতে আমার থাকা উচিত হবে কি না! সেই সময় আমার আর কোন উপায়ও ছিল না।

স্কুলেও আমার জীবন কষ্টকর হয়ে উঠল। হিন্দু নেতা হিসাবে আমার সংগীদের কাছ থেকে শেষে আমি যে সম্মান পেতাম তার বদলে এখন যীশুকে নিয়ে তারা আমাকে ঠট্টা করতে লাগল। এমন কি, যে সব ছেলেদের আমি খ্রীষ্টান বলে ভাবতাম তারাও আমাকে কষ্ট দিতে লাগল। এই সব ব্যাপারে একদিন রাতের বেলা আমি যখন বসবার ঘরের মেঝেতে শুয়ে মন্দ আত্মাদের অত্যাচার অনুভব করছিলাম তখন আমার ঘুম আসছিল না। আমি চোখের জলের সংগে আস্তে আস্তে বললাম, "প্রভু, তোমার একজন শিষ্য হতে গিয়ে এত কষ্ট কেন? আমি তোমাকে ভালবাসি, তোমার শান্তি আমার অন্তরে

আছে কিন্তু স্কুলে ও এই বাড়ীতে যা হচ্ছে তা আমি সহ্য করতে পারছি না। আমার ভাগ্য কি সবসময় এরকমই হবে?" দুঃখিত অন্তরে শেষে একসময় আমি ঘুমিয়ে গেলাম।

তখন প্রায় রাত দু'টো বাজে, আমি বুঝতে পারলাম কে যেন আমাকে নাড়া দিচ্ছে। অবাক হয়ে চোখ খুলে দেখি অতি উজ্জল সাদা কাপড় পরা একজন আমার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি তখনই বুঝতে পারলাম উনি যীশু, যদিও তিনি আমার দেখা তাঁর ছবিগুলোর মত দেখতে ছিলেন না। তিনি আমার দিকে তাঁর হাত বাড়িয়ে দিয়ে মৃদুস্বরে বললেন, "শান্তি! আমার শান্তি আমি তোমাকে দিচ্ছি!" এই কথা বলে তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন, আর ঘরটা আবার অন্ধকার হয়ে গেল। আমি অনেকক্ষণ সেখানেই বসে ভাবতে লাগলাম, আমি কি সত্যিই জেগে ছিলাম? আমি যে জেগে ছিলাম তাতে কোন সন্দেহ নেই। আমার তখন মনে হচ্ছিল আমি চিৎকার করে বলি "ধন্য প্রভু" এর পরে অনেকক্ষণ আমি মাথার নীচে দু'হাত রেখে, বিশ্বাসে স্বর্গের দিকে তাকিয়ে প্রভুতে আনন্দ করতে করতে শুয়ে রইলাম।

এই অভিজ্ঞতা আমাকে নতুন সাহস জুগিয়ে দিল। আমি নতুনভাবে আশ্বাস পেলাম যে, যীশু খ্রীষ্ট আমার মধ্যে আছেন, তিনি আমাকে পথ দেখাচ্ছেন, পরিচালনা করছেন ও আমার যত্ন নিচ্ছেন। অবশ্য এ সব আমি আগেই বিশ্বাস করে তাঁর উপরে নির্ভর করেছিলাম, কিন্তু এখন আমার বিশ্বাস এত গভীর হল যে, খুব বেশী কষ্টকর অবস্থাতে পড়লেও আমাকে তা নাড়াতে পারত না। সেই নিশ্চয়তা আমাকে কখনও ছেড়ে যায় নি আর যাবেও না।

একদিন আমাদের স্কুলের নোটিশ বোর্ডে দেখলাম, "খ্রীষ্টের জন্য যুবকদের" একটা সভা স্কুলের সভাকক্ষে হবে। এই খবরে আমার উত্তেজনা কল্পনাতীত ভাবে বেড়ে গেল। স্কুলের সবচেয়ে বড় ক্লাব ছিল সেটা। কিন্তু আমি এই ক্লাবের বিষয় কখনও শুনি নি তাই ভাবতাম এই কুইনস্ রয়াল কলেজে বুঝি আমিই একা সত্যিকারের খ্রীষ্টান ছেলে। এই প্রথম আমাকে সবাই সাদরে অভ্যর্থনা জানান;

আর আমি অল্প সময়ের মধ্যে অনেক খ্রীষ্টান বন্ধু পেয়ে গেলাম। ব্রেণ্ডন বেইন নামে একটা ছেলের সংগে আমার গভীর বন্ধুত্ব হল। ব্রেণ্ডনের বাবা ছিলেন ক্রিকেট খেলার একজন বিখ্যাত আমপায়ার। ব্রেণ্ডনও কিছুদিন আগে খ্রীষ্টান হয়েছে। আমরা দু'জনে একসংগে পবিত্র বাইবেল পড়তাম ও প্রার্থনা করতাম। খ্রীষ্টের জন্য জীবন কাটাতে আমরা একে অন্যকে উৎসাহিত করতাম এবং অন্যদের কাছে খ্রীষ্টের কথা বলতাম। আমি এখন দেখতে পাচ্ছি অনেক বন্ধু-বান্ধবকে আমরা খ্রীষ্টের জন্য জয় করতে পারছি। এরা আমার সাক্ষ্য শুনে এবং যুবকদের সাপ্তাহিক সভার মাধ্যমে তারা খ্রীষ্টের কাছে আসছিল। আমি এখন সেই ক্লাবের কর্মীদের একজন হলাম। যাদের খ্রীষ্টান ঘরে জন্ম হয়েছে তাদের কাছে নতুন জন্ম সম্বন্ধে বুঝানো কঠিন হত।

হিন্দু পরিবারে বাস করার দরুন আমাকে যে অসুবিধায় পড়তে হচ্ছিল তা জানতে পেরে কলেজের প্রিন্সিপাল অনেক রাত পর্যন্ত পড়াশোনা করার জন্য একটা কামরা ব্যবহার করতে আমাকে অনুমতি দিলেন। বেশীর ভাগ সময় আমি বাইবেল পড়ে ও প্রার্থনা করে সময় কাটাতাম। তারপর আমি যখন ঘরে ফিরতাম তখন প্রায় সবাই শুতে যেত। সেই হিন্দু বাড়ীটা ভেংগে ফেলা হল এবং নতুন বাড়ী করার জন্য একবছর সময় দরকার। কাজেই আমাকে বাধ্য হয়ে সেখান থেকে চলে আসতে হল। যে বাড়ীতে আমি তারপর থাকতে লাগলাম সেটা ভাল ছিল, কিন্তু সেটা ছিল কলেজ থেকে বেশ দূরে। ব্রেণ্ডন তার বাইসাইকেলটা আমাকে ব্যবহার করতে দিল। এই বাড়ীর কর্ত্রী খুব ভাল খ্রীষ্টান ছিলেন। তিনি সর্বদা আমাকে বিশ্বাসের পথে উৎসাহিত করতেন।

এর আগের কথা— তখন আমি বেশ ছোটি, কিন্তু কৌতুহল বশতঃ আমার ঘড়িটা খুলে ফেলে আবার তা মেরামত করতাম। অনেকবার আমি ঐ রকম করতাম। এখন বন্ধুদের ঘড়ি আমি মেরামত করে দিতে লাগলাম। ঘড়ি মেরামতের জন্য আমার যন্ত্রপাতির মধ্যে ছিল একটা ব্লেড, একটা ছোটি ছুরি ও একটা পিন। আমি ব্রেণ্ডনের সাইকেলে

করে প্রত্যেক শুক্রবারের বিকেলে পোর্ট অফ্ স্পেনের দোকানে গিয়ে ঘড়ির বিভিন্ন অংশ কিনে আনতাম। খুব শীঘ্রই আমার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। ছাত্র ও শিক্ষকেরা আমাকে তাদের ঘড়ি মেরামত করবার জন্য দিতেন। এই কাজ করে আমি যে পয়সা পেতাম তা দিয়ে আমার ঘরভাড়া ও খাবারের জন্য কিছু টাকা দিতে পারতাম।

সপ্তাশেষের ছুটিতে আমি বাড়ীতে যেতাম। সেখানে আমি আমাদের বাড়ীর নীচের ছোট গীর্জার সাণ্ডেস্কুলে ক্লাশ নিতাম। কৃষ্ণ এখন একটা প্রাইমারী স্কুলে শিক্ষকতা করে। সে আর শান্তি সপ্তা শেষের ছুটিতে বাড়ীতে আসতে পারত। ঈশ্বরের বাক্য পড়ে এবং আমাদের জীবনে প্রভু কি করছেন তা আলোচনা করে আমাদের সময়টা খুব ভালই কটিত। দিদিমা আমাদের অনুপ্রেরণা দানকারিণী ছিলেন; বিশেষ করে তাঁর প্রার্থনার জীবন দিয়ে। আমরা একে অন্যকে খুব ভালবাসতাম।। প্রতি সপ্তাশেষে দিদিমা আমার সংগে প্রার্থনা করতেন। তিনি প্রভুকে বলতেন যেন তিনি আমাকে দেখিয়ে দেন আমার কলেজের পড়া শেষ হলে আমি কি করব।

১৭

পুনর্মিলন ও বিদায়

"রবি, তোমার মা বাড়ী আসছেন!"

রেবতী মাসীমা বারান্দার দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সেদিনকার চিঠি পত্র দেখছিলেন। দিদিমা হঠাৎ খবরটা পেয়ে খুব উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন। মনে হচ্ছিল তিনি যেন বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। কথাটা কি সত্যি — ১১ বছর পরে?

মাসীমা চিঠিটা পড়ে বললেন, "সে লণ্ডন থেকে লিখেছে। ত্রিনিদাদে আসার জন্য একটা জাহাজ সে পেয়েছে। আরে, আজকে, আজকেই তো পৌঁছাবে!"

সেই সময় লারী মামা অল্প দিনের জন্য বাড়ীতে এসেছিলেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চতর পড়াশোনা (ডক্টরেট) করবার জন্য গিয়েছিলেন। আমাদের উত্তেজিত কন্ঠস্বর শুনে তিনি তাড়াতাড়ি ঘরে এসে জিজ্ঞেস করলেন, "ক'টার সময় জাহাজ ভিড়বে?"

মাসীমা বললেন, "বোধহয় এতক্ষণে এসেও গেছে। চল সবাই তাড়াতাড়ি যাই।"

যে জোরে গাড়ী চালানো হল! আমরা সেখানে পৌঁছে দেখি জাহাজ ঘাটে দাঁড়িয়ে আছে আর সব আরোহী নেমে গেছে। আমার মাকে কোথাও দেখতে পাওয়া গেল না। শেষে লারী মামা বললেন, "উনি এতক্ষণে বোধহয় একটা ট্যাক্সী নিয়েছেন। চল, আমরা তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে যাই।" আমরা তাই ফিরে চললাম। এবার

আরও জোরে গাড়ী চলল।

আমরা সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে উঠে সবাই বসবার ঘরে ঢুকলাম। আমার মা যখন যান তখন আমার বয়স ছিল সাত। এতদিন পরে তিনি এসেছেন আর এখন খাবার টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে দিদিমার সংগে কথা বলছেন। তাঁকে একটু অবাক দেখাচ্ছিল। তিনি দিদিমাকে এত সুস্থ এবং হাঁটতে দেখে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন। আমরা চিঠিতে অবশ্য তাঁকে আগেই লিখেছিলাম; প্রভু যীশু কেমন করে তাঁকে সুস্থ করেছেন।

মা নারী মামাকে দেখে চিনতে পারলেন। তাঁরা একে অন্যকে জড়িয়ে ধরলেন। এবার রেবতী মাসীমার পালা। আমি দরজায় গোড়ায় দাঁড়িয়ে আবেগময় দৃশ্য দেখছিলাম। মায়ের জন্য আমার দুঃখ লাগছিল। ভাবছিলাম মা হয়তো সব ঘরগুলোই ঘুরে দেখেছেন। ঠাকুরঘরটা এখন খালি। দেয়ালে যে সব দেব-দেবতার ছবি ছিল সেগুলো আর নেই। তাঁর জন্য এটা ছিল বড় কঠিন অভিজ্ঞতা। হয়তো তিনি আমাদের মুখোমুখি হতে ভয় পাচ্ছিলেন— ঘর ভরা সবাই খ্রীষ্টান আর তিনি তখনও ধর্ম-নিষ্ঠ হিন্দু। এটা তো তাঁরও বাড়ী, তাঁরই পরিবারের লোক, কিন্তু এখন আমরা তাঁর কাছে সবাই অচেনার মত।

তিনি আমার দিকে তাকিয়ে দেখছিলেন। তাঁর চোখে আমাকে চেনার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। শেষে তিনি বললেন, "রবি কোথায়?"

কেউ কোন কথা বলল না, আর আমিও চুপ করে রইলাম। মা আমার দিকে আংগুল দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "ওটা কে?" তবুও কেউ কিছু বলল না। সবাই দেখতে চাইছে তিনি আমাকে চিনতে পারেন কি না।

শেষে উদ্বেগ অসহ্য হওয়াতে রেবতী মাসীমা বললেন, "ওই তো রবি!"

সবাই আমার দিকে তাকাল। আমি আর নিজেকে ধরে রাখতে

পারলাম না। আমি দৌড়ে গিয়ে তাঁকে চুমু দিলাম। তিনি আমাকে একহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলেন, কিন্তু যে আগ্রহ ও আবেগ আমি ১১ বছর পরে আমি আশা করেছিলাম তা দেখলাম না। মনে হল আমরা যেন এই প্রথমবার একে অন্যকে দেখলাম।

"রবি, তুমি কত বড় হয়ে গেছ! আমি তোমাকে চিন্‌তেই পারি নি।" তাঁর জন্য আমার এত ভালবাসা থাকা সত্বেও তাঁর ও আমার মধ্যে একটা ফাঁক আমি অনুভব করছিলাম।

রেবতী মাসীমা বললেন, "একটুখানির জন্য তোমার সংগে আমাদের দেখা হল না। তুমি কতক্ষণ এসেছ?"

"মিনিট ১৫ হবে। তাতে কিছু হবে না।"

মাসীমা বললেন, "আমার খুব দুঃখ লাগছে। এতদিন পরে এত দূর থেকে তুমি আসলে আর জাহাজ-ঘাটে কেউ তোমাকে আনতে গেল না!"

আমার মা হতাশাকে ঢাকতে চেষ্টা করে বললেন, "আমি জানি, চিঠির উপর নির্ভর করা যায় না।" আমরা সবাই তাঁর চোখে জাহাজঘটায় না যাওয়ার দুঃখবোধের চেয়ে অন্য কোন দুঃখবোধ দেখতে পেলাম।

শেষে ১১ বছর পরে পুনর্মিলন হল যা আমি ভেবেছিলাম হয়তো আর কখনও হবে না। আমাদের কত কথা বলবার ছিল। কিন্তু তাঁর ও আমাদের মধ্যে যে বাধার দেয়াল উঠে গেছে তা কেউ অস্বীকার করতে পারল না। তিনি বাবা মুক্তানন্দের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেন। এই গুরুর মন্দিরেই তিনি অনেকদিন ছিলেন। তিনি এখন যোগ-সাধনার একজন শিক্ষিত শিক্ষিকা হয়েছেন। তিনি এই সাধনার মাধ্যমে দেহকে দমনে রাখা ও পূর্বদেশীয় ধ্যানের উপকারিতার কথা বলতে চাইছিলেন— যার বিষয় আমরা জানি যে, মন্দ আত্মা এ সবের দ্বারা একজনের জীবনে রাজত্ব করে, কিন্তু কি করে আমরা সে কথা তাঁকে বলব? তিনি হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে অনেক কিছু আমার সংগে আলোচনা করতে চাইছিলেন— কিন্তু তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁর কথায় আমি

সায় দেব না। তাছাড়া আমরা তর্কাতর্কি এড়িয়ে যেতে চাইছিলাম।

হিন্দু দর্শনমতে অনেকে এ কথা ঠিক বলে মনে করেন যে, হিন্দুধর্ম অন্যান্য সব ধর্মকেই মেনে নেয় এবং বিভিন্ন রাস্তা দিয়ে গেলেও সবাই এক জায়গায় পৌঁছায়। যাঁরা উভয় পক্ষের সহন-শীলতা ও সর্বধর্মের একত্বের পক্ষ নেন তাঁরা বুঝতে পারেন না যে, এমন অনেক গভীর পার্থক্য আছে যা একজনের জীবনকে প্রভাবিত করে। সেই সব প্রধান প্রধান সত্যকে সবধর্ম সমন্বয় করে এড়িয়ে যাওয়া যায় না। আমার মা হিন্দু দর্শনের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন, যা বলে, একমাত্র সত্য হল ব্রহ্মা এবং কর্মফলের নিয়ম হল গত জীবনের পাপের ফল ভবিষ্যত জীবনে ভোগ করা। আর আমরা, বাকীরা নিশ্চিতভাবে বুঝেছিলাম যে, ভাল এবং মন্দ আলাদা ব্যাপার আর সৃষ্টিকর্তা তাঁর সৃষ্ট বস্তুর সংগে এক নন। আমরা জেনেছিলাম যীশুর মাধ্যমে পাপের ক্ষমা পাওয়া যায় আর তাই আমরা পুনর্জন্মে বিশ্বাস করতাম না। এই দু'টি বিপরীত বিশ্বাসের মধ্যে কোন সমতা সম্ভব নয়, কোন আপোষও সম্ভব নয়। তা করতে হলে ভাষা ও ধারণার অর্থকে অস্বীকার করতে হবে।

আমার মায়ের পক্ষে এই সত্যের মুখোমুখি হওয়া শক্ত হয়েছিল যে, আমরা আর হিন্দু নই। আমাদের উপস্থিতিতে তিনি নিজেকে শূন্য ও অনিশ্চিত মনে করছিলেন। একমাত্র তিনি নিজে ছাড়া আর সব কিছু বদলে গেছে। তিনি তবুও সেই পৌরাণিক কাহিনীর পুরানো প্রথার উপর বিশ্বাসী রইলেন যা আমরা বাতিল করেছিলাম। তিন দিন পরে তিনি পোর্ট অফ্ স্পেনে গেলেন ত্রিনিদাদের সবচেয়ে বড় মন্দিরের সব চেয়ে বড় পদ গ্রহণ করবার জন্য। তিনি ভারতবর্ষ ছেড়ে যাবার সময় এই পদ গ্রহণ করবার জন্য তাঁকে বলা হয়েছিল। আমরা তাঁকে এত অল্পদিন পরেই চলে যেতে দেখে দুঃখিত হয়েছিলাম, কিন্তু আমাদের মধ্যে সত্যি সত্যিই বাধা উপস্থিত হয়েছিল।

যাবার সময় তিনি জোর দিয়ে বলে গেলেন, "তুমি মন্দিরে এসে আমার সংগে থাকবে। তুমি স্কুলে ফিরে গিয়েই আমার কাছে এসো।

ওখানে আমাদের থাকার জন্য সুন্দর ঘর আছে আর কুইন্‌স রয়েল কলেজ ওখান থেকে বেশী দূরে নয়।"

এই রকম জায়গায় বাস করার জন্য আমাকে জোর দিয়ে বলার আর অন্য কোন উপায় ছিল না, আমার মায়ের কাছে থাকার জন্যও না; কিন্তু আমি তাঁকে বলার মত কোন কথা খুঁজে পেলাম না। তাঁর সংগে দেখা করার জন্য সেই মন্দিরে যেতেও আমি ভয় পেলাম। প্রথম যে বার আমি তাঁর সংগে সেখানে দেখা করতে যাই সেবারের কথা আমার ভাল করেই মনে আছে! কোন একজন তাঁর ঘর আমাকে দেখিয়ে দিল। আমি দরজা দিয়ে ঢুকতেই দেখলাম আমার মা একটা বড় আয়নার সামনে পদ্মাসন হয়ে বসে হাত জোড় করে আত্মপূজা করছেন। এ দেখে আমার মন ভেংগে চুরমার হয়ে গেল। তাঁর উপরে যে বেদী আছে তার উপরে রয়েছে তাঁর গুরু মুক্তানন্দের ছবি যাঁকে তিনি সারা দিন পূজা করেন ও ধ্যান করেন।

তিনি খুব উৎসাহের সংগে আমাকে আহ্বান জানালেন, "রবি, আমি খুব খুশী হয়েছি যে, তুমি আসতে পেরেছ। চল, আমি তোমাকে সব কিছু ঘুরে দেখাই।" তাঁর পাশের কামরায় আমাকে নিয়ে গিয়ে তিনি বললেন, "এই দেখ, আমি তোমার জন্য সব কিছু ঠিক করে রেখেছি; তুমি কবে আসছ?"

আমি নিজেকে রক্ষা করে বললাম, "আমার স্কুল থেকে এই জায়গা একটু দূরে।"

মা বললেন, "মাত্র ৫ মিনিটের পথ।" তাঁর চোখে-মুখে দুঃখের ছায়া দেখা দিল।

"আমি একটু ভেবে দেখি।" আসলে সেখানে আসা সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই ওঠে না, কিন্তু তাকে এটা বলতে পারছিলাম না।

যতবার আমি তাঁকে দেখতে যেতাম ততবারই তিনি আমাকে অনুরোধ করতেন। আমি তাঁকে একটা অস্পষ্ট ও দেরী করার কথা ছাড়া আর কিছুই বলতে পারতাম না। সোজাসুজি বলে দেওয়াটা আমার কাছে নিষ্ঠুরতা মনে হত। তাঁর কাছে এটা কত কষ্টের ছিল!

তাঁর কত বড় ইচ্ছা ছিল যেন আমি মস্ত বড় একজন হিন্দু নেতা হই। তার বদলে আমি হয়েছি তাঁর লজ্জার বিষয়। তাঁকে ত্রিনিদাদের সমস্ত জায়গার হিন্দুরা ভক্তি করে এবং তাঁর ভক্তের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছিল। তিনি বক্তৃতা দেবার জন্য যখন এদিক-ওদিক যেতেন তখন আমি জানতাম যে, হিন্দু নেতারা তাঁকে আমার কথা জিজ্ঞাসা করতেন। এটা খুবই স্পষ্ট যে, আমি তার পক্ষে লজ্জা ও অপমান-জনক ছিলাম।

তাঁর এখনকার দুঃখের চেয়ে তাঁর জন্য আমার দুঃখ আরও, আরও গভীর ছিল। আমি তাঁর চিরকালের অবস্থার জন্য ভীত হয়ে ছিলাম। ঈশ্বর তাঁর দয়াতে আমাকে উদ্ধার করেছেন, আর তিনি যে আমার মায়ের কাছে প্রকাশিত হতে পারেন সে সম্বন্ধে আমি নিশ্চিত ছিলাম। মা যেন উদ্ধার পান সেজন্য আমি রোজই প্রার্থনা করতাম। অন্যান্য সব কিছুর চেয়ে এটা তাঁর জন্য খুবই শক্ত হবে। অহংকার তাঁকে অন্ধ করে রাখতে পারে। তাঁর যত সম্মান তা ত্যাগ করতে এবং হিন্দু সমাজের ঘৃণা ও বিরক্তি সহ্য করতে তাঁর খুব কষ্ট হবে। আমি মাত্র একবার যীশুর এই কথা বলে তাঁকে বিশ্বাস করাতে চেষ্টা করেছিলাম, "আমিই পথ, সত্য ও জীবন।"

উত্তরে মা বললেন, "আমি নিশ্চয়ই তা বিশ্বাস করি। যীশু বলছেন আমরা সকলেই পথ। বেদও সেই একই কথা বলে— প্রত্যেক লোকের ধর্ম আলাদা এবং তার মধ্যেই তার নিজের সত্যকে খুঁজে নিতে হবে।"

"কিন্তু মা, যীশু বলছেন,তিনিই একমাত্র পথ।"

অল্পক্ষণ এ বিষয়ে আলোচনা করার পর আমরা দু'জনেই বুঝলাম যে, ধর্ম নিয়ে তর্ক করায় কোন লাভ হবে না, তাই আমরা আলোচনার বিষয়বস্তু বদ্‌লালাম। তাঁর মন্তব্য শুনে বুঝতে পারলাম যে, তিনি নিজেকে নিয়ে সন্তুষ্ট নন। তাই আমি প্রার্থনা করতেই থাকলাম যেন তিনি তাঁর অন্তরের ক্ষুধার দিকে দৃষ্টি দেন এবং প্রভুর খোঁজ করেন।

এর পরে একবার বিকাল বেলায় আমি যখন তাঁর সংগে দেখা

করতে গেলাম তখন তিনি আমাকে আহ্বান জানিয়ে বললেন, "আর কয়েক মিনিট পরেই আমি টেলিভিশন স্টুডিয়োতে যাচ্ছি। তুমি এসেছ বলে আমি খুব খুশী হয়েছি। তুমিও আমার সংগে চল।"

আমি যেতে চাইছিলাম না। কারণ আমি জানতাম হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে তিনি বক্তৃতা দেবেন আর তার পরে তিনি আশা করবেন আমি মন্তব্য করব। আমি জানি তাতে কেবল তর্কাতর্কি হবে। কিন্তু আমার আর কোন উপায় ছিল না।

টেলিভিশান ষ্টেশনে গিয়ে আমার মাকে ক্যামেরার সামনে বসে খুব দক্ষতার সংগে যোগসাধনা ও ধ্যানের মাধ্যমে মনের শান্তি পাবার বিষয় বক্তৃতা দিতে শুনলাম। আমি এ বিষয়ে নিশ্চিত ছিলাম, যে শান্তি পাবার কথা তিনি বলছেন তা তিনি নিজেই পান নি। আমার নিজের অভিজ্ঞতায় আমি জানি যে, আমিও একসময় শান্তি পাবার জন্য নিজেকে উদ্দীপিত করার চেষ্টা করতাম, শান্তি অনুভব করতে চাইতাম কিন্তু তাতে কোন লাভ হয় নি। সৃষ্টিকর্তার সংগে সঠিক সম্বন্ধ স্থাপন করতে পারলেই কেবল শান্তি লাভ করা যায়— এই সম্বন্ধ মায়ের এখনও স্থাপিত হয় নি।

তাঁর অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেলে তিনি খুব উৎসাহের সংগে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "রবি, এ বিষয়ে তুমি কি মনে কর?"

আমি যদি তখনও হিন্দু থাকতাম তবে মাকে নিয়ে আমার গর্বের সীমা থাকত না। কিন্তু এখন তাঁর ধর্মের আগ্রহ ও ধর্মীয় কাজকর্ম কেবল আমার দুঃখই বাড়ায়। কোন রকমে কথা খুঁজে পেয়ে বললাম, "মা তুমি খুব সুন্দর করে কথা বলতে পার। তোমার গলার স্বর ভাল ও টেলিভিশানে তোমাকে বেশ ভালই দেখায়।" তাঁর চোখে মুখে হতাশার চিহ্ন দেখে বুঝলাম তিনি এর চেয়ে বেশী কিছু আশা করেছিলেন। তর্কাতর্কি এড়ানোটাই যথেষ্ট ছিল না। আমি ভাবতাম তিনি কি কোনদিন এই আশা ছাড়বেন না যে, আমি আবার হিন্দুধর্মে ফিরে যাব?

কলেজের পড়াশোনা শেষ করার পর দেশের বিভিন্ন গীর্জায় কথা

কলেজের পড়াশোনা শেষ করার পর দেশের বিভিন্ন গীর্জায় কথা বলবার জন্য আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হত। কৃষ্ণ ও আমাকে যীশুর কথা বলবার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হত। কৃষ্ণ ও আমি প্রায়ই যীশুর গান গাইতাম, আমাদের জীবনের সাক্ষ্য দিতাম এবং প্রচার করতাম। আমরা প্রতিটি মুহূর্ত আনন্দে কটাতাম, কিন্তু আমি বুঝতে পারছিলাম ঈশ্বর আমাকে ত্রিনিদাদ থেকে দূরে নিয়ে যেতে চাইছেন। ঈশ্বরের ইচ্ছা বুঝবার জন্য আমি অনেক সময় প্রার্থনায় কটাতাম। আমার বিশ্বাস ক্রমশঃ দৃঢ় হচ্ছিল— দিদিমা ও রেবতী মাসীমাও একই কথা ভাবতেন যে, ঈশ্বর আমাকে ইংল্যাণ্ডে যেতে বলছেন।

একদিন চিঠি পত্র আসলে পর রেবতী মাসীমা সেগুলো দেখতে দেখতে বললেন, "তোমার কুমার মামা তোমাকে একটা চিঠি লিখেছেন।" আমার মা ত্রিনিদাদে পৌছাবার কয়েক মাস আগে তিনি লণ্ডনে ফিরে গিয়েছিলেন।

চিঠিখানা খুলে পড়তে পড়তে বললাম, "মামা আমাকে লণ্ডনে যেতে বলছেন, আর বলছেন আমি তাঁর সংগেই থাকতে পারব।" এ বিষয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছা কি তা জানবার জন্যে আমি চারদিন উপবাস ও প্রার্থনা করে কাটালাম এবং শেষে নিশ্চিত হলাম যে, তিনি আমাকে লণ্ডনের দিকেই নিয়ে যেতে চান, কিন্তু সেখানে যাবার ভাড়ার পয়সা আমার ছিল না। যদি এটা ঈশ্বরের ইচ্ছাই হয় তবে তিনি টাকা-পয়সা জোগাবেন।

১৯৬৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম দিকে আমি শুনতে পেলাম যে, "S .S. Antilles" নামে একটা ফরাসী দেশের জাহাজ সেই মাসেরই ১৪ তারিখে ত্রিনিদাদ ছেড়ে লণ্ডনে যাবে। আমার অন্তরের গভীরে আমি অনুভব করতে লাগলাম যে, আমাকে ঐ জাহাজেই যেতে হবে যাহোক্, ১২ তারিখের সকালবেলা আমি আর দেরী করতে না পেরে পোর্ট অফ্ স্পেনে গিয়ে আমার জন্য পাসপোর্টের ব্যবস্থা করলাম। তারপরেই আমি ব্রিটিশ হাই কমিশনারের অফিসে গেলাম ভিসার জন্য। তাঁরা বললেন, "আপনার সংগে নেবার জন্য ১৫০০

টাকা না দেখা পর্যন্ত আমরা আপনাকে ভিসা দিতে পারি না।" আর তখনও পর্যন্ত আমি যাত্রাখরচ জোগাড় করতে পারি নি।

আমি তাঁদের অফিস ছেড়ে আসবার সময় আমার পকেটে কেবল বাড়ী ফিরে যাবার পয়সাই ছিল। সেদিন সন্ধ্যাবেলায় শুনলাম তিনটা আলাদা আলাদা উপহার আমার জন্য এসেছে; তাতে সবশুদ্ধ ১৫০০ টাকাই আছে। খুব আশ্চর্য হলাম জেনে যে, আমার মা আমাকে কিছু টাকা দিয়েছেন আর বাকী টাকা দিয়েছে লারী মামা আর কৃষ্ণ। আশ্চর্যের কথা হল আমার যতটুকু টাকার দরকার ঠিক ততটুকুই আমি পেলাম— অথচ টাকার দরকারের কথা আমি কাউকে জানাই নি। এতে ঈশ্বরের পরিচালনা সম্বন্ধে আমি আরও নিশ্চিত হ'লাম।

সেদিনই সন্ধ্যাবেলা আমার একজন প্রিয় বন্ধু আমার যাত্রাখরচের টাকা আমাকে ধার দিল। আমি আবারও নিশ্চিত হলাম। মনে হল সেখানকার দরজা আমার জন্য খোলা হয়েছে— লণ্ডনে থাকার জায়গা আছে আর যতটুকু টাকার দরকার ততটুকু পেয়েও গেলাম।

সেদিন রাতে আমি পরিবারের সবাইকে জানালাম যে, আমি ১৪ তারিখে লণ্ডন রওনা হচ্ছি।

"১৪ তারিখে? সে তো পরশু দিন! এত তাড়াতাড়ি তুমি কি করে সব কিছু জোগাড় করলে?"

"আজকে আমার পাসপোর্ট আমি পেয়েছি আর আগামী কাল ঈশ্বরের ইচ্ছা হলে আমার টিকেট ও ভিসা পেয়ে যাব।"

আমি বুঝতে পারি নি যে, ইংলণ্ডে যাবার ভিসা পাওয়া এত কষ্ট। পরের দিন ব্রিটিশ হাই কমিশনারের অফিসে গেলে আমাকে কড়াভাবে বলা হল, "আমি দুঃখিত যে, আমরা আপনাকে ভিসা দিতে পারছি না।"

"কিন্তু স্যার, সংগে নেবার ১৫০০ টাকা তো আমার আছে!"

"তার মানে এই নয় যে, আপনি এমনি এমনি ভিসা পেয়ে যাবেন।"

"কিন্তু কেন পাব না?" আমার মনে পড়ল আমি শুনেছিলাম ব্রিটিশ

সরকার বিদেশীদের তাঁদের দেশে ঢুকবার আদেশ দিতে কড়াকড়ি করে।

তিনি তাঁর কথার ব্যাখ্যা না দিয়ে বললেন, "আমি দুঃখিত যে, আমি আপনাকে ভিসা দিতে পারছি না।"

আমার পাসপোর্টের ভিতরে তিনি আংগুল দিয়ে রেখেছিলেন। এবার তিনি আমার ও তাঁর মাঝখানে যে টেবিল ছিল তার উপরে আমার পাসপোর্টটা রাখলেন। আমি ওটা তুলে না নিয়ে তাঁর পিছনে যে জানালা ছিল তার বাইরের দিকে চোখ রেখে নীরবে প্রার্থনা করলাম, "প্রভু, তুমি দয়া করে এর একটা ব্যবস্থা কর!"

তিনি আমার পাসপোর্টটা আবার তুলে নিয়ে তার মধ্যে ভিসার ছাপ মেরে দিলেন।

আমি নীচু স্বরে বললাম, "প্রভু ধন্যবাদ!"

সেদিন সন্ধ্যায় ভিসা আর টিকেট হাতে করে ঘরে ফিরে এসে দেখি দিদিমা আর রেবতী মাসীমা প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুদের ডেকে একটা বিদায়-সভার আয়োজন করেছেন। এতে আমার মা-ও পোর্ট অফ্ স্পেন থেকে এসেছেন আমাকে বিদায় জানাতে। বড় আবেগপূর্ণ ছিল সময়টা আমাদের সবার জন্যে। অল্পদিন হল আমার মা ফিরে এসেছেন আর আমি এখন চলে যাচ্ছি। দিদিমা আরও বুড়ী হয়ে গেছেন, এবং তাঁকে ছেড়ে যেতে হবে বলে আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল। আমি আর রেবতী মাসীমা দু'জনেই আমরা খ্রীষ্টেতে কত বৃদ্ধি পেয়েছি, ঈশ্বর আমাদের মধ্যে কি অপূর্ব ভালবাসাই না দান করেছেন! শান্তি আর কৃষ্ণ? কি সুন্দর সময়ই না আমরা একসংগে কাটিয়েছি! আমার অন্যান্য মামাতো-মাসতুতো ভাই-বোনেরা, যারা খ্রীষ্টান হয়েছে, আর যে সব মামা-মাসীরা ও তাঁদের ছেলেমেয়েরা, যারা খ্রীষ্টান হয় নি... আমার বড় মামা দেবনারায়ণ, যিনি একসময় আমার বাবার স্থানে ছিলেন অথচ আজকে আসেন নি... কাউকেই ছেড়ে যেতে আমার মন চাইছিল না। কিন্তু আমি সত্যিই বিশ্বাস করেছিলাম যে, ঈশ্বরের একটা পরিকল্পনা রয়েছে এবং তিনিই আমাকে

পরিচালনা করছেন।

আমি সকলের বক্তৃতা শুনলাম— সুন্দর অর্থযুক্ত, ভালবাসাপূর্ণ আর বেশীর ভাগ ছিল খুবই আন্তরিক। চোখ ভরা জল নিয়ে রেবতী মাসীমা বললেন তিনি আমাকে খুবই ভালবাসেন। তিনি আরও বললেন আমরা কেমন সুন্দরভাবে একত্রে থেকেছি এবং ঘরের সাহায্যকারী হিসাবে তিনি আমার অভাব বোধ করবেন। এই কথায় পুরানো কথা মনে পড়ে গেল এবং সেজন্য ঈশ্বর যে আমাদের মধ্যে আশ্চর্য পরিবর্তন দান করেছেন সেজন্য তাঁকে ধন্যবাদ দিলাম। দিদিমাও খুব সুন্দর কথা বললেন। আবার অনেক হিন্দু প্রতিবেশীরা বললেন আমর নতুন জীবন ভাল করে লক্ষ্য করে তাঁরা এখন আমাকে সম্মান করেন। তারপর উঠে দাঁড়ালেন আমার মা।

মা বললেন, "রবি, আমার একমাত্র সন্তান। তার মত ছেলে আমার আছে বলে আমি সত্যিই খুশী!" আমি তাঁর কথা বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। আমারা চোখে জল আসছিল। তিনি বলতে লাগলেন, "ত্রিনিদাদে ফিরে আসার পর তার জীবন আমি ভাল করে লক্ষ্য করেছি। আমি কেবল এটুকুই বলতে পারি আমি যা দেখেছি তাতে আমি খুশীই হয়েছি। আমি তার একজন গুপ্ত গুণমুগ্ধ! আমি রবিকে খেয়াল করে দেখেছি যে, তার সম্বন্ধে বিশেষ ব্যাপার হল তার জীবনে যেন একটা আলো জ্বলছে।"

আমার চোখের জল ধরে রাখা সহজ হচ্ছিল না। আমি জানতাম আমার মা খুব কম কথা বলেন আর এখন তিনি যা বললেন তাতে তাঁর প্রতি আমার আরও শ্রদ্ধা জাগল। আমি কোনদিন ভাবি নি যে, তিনি আমার সম্বন্ধে এ সব কথা ভাবেন এবং তা আমার হৃদয় গভীর ভাবে স্পর্শ করল। এতে আমি তাঁর জন্য প্রার্থনা করার উৎসাহ পেলাম।

তিনি আমার মধ্যে যা দেখেছিলেন তা আমার কোন গুণ বা আলো নয়, তা ছিল নতুন জন্মের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টের জীবন ও ভালবাসার প্রকাশ। তিনি আমার যে সব গুণের প্রশংসা করলেন তা আমার ছিল না, যীশুই সেই পার্থক্য এনে দিয়েছেন। তিনিই আমাকে পরিবর্তিত

করেছেন; আর আমি কত চাইছি যেন আমার মা-ও খ্রীষ্টের মধ্যে এই নতুন জীবন পান।

১৯৬২ সালে খ্রীষ্টকে গ্রহণ করার কিছুদিন পরেই আমার সমাজের একজন ভারতীয় আমাকে বলেছিল, এ সব বেশীদিন ঠিকবে না। কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতায় আমার অন্তর ভরে আছে, কারণ তিনি আমাকে তাঁর ইচ্ছার মধ্যে ধরে রেখেছেন, এমন কি, এক দিনের জন্যেও আমাকে সেই পথ থেকে সরে যেতে দেন নি, আর কি চমৎকার এই ২২টা বছর! এই বছরগুলোতে আমি বাইবেলের আগা-গোড়া ভাল করে পড়েছি এবং বুঝতে পেরেছি এর প্রত্যেকটি কথা কত সত্যি! এ ছাড়া সারা জগতে যে সব আশ্চর্য আশ্চর্য কাজ ঈশ্বর বিভিন্ন মানুষের জীবনে করেছেন তা দেখে আমি আগের চেয়ে আরও নিশ্চিত হয়েছি যে, যীশু খ্রীষ্ট নিজের সম্বন্ধে যা দাবী করেছেন তিনি ঠিক তা-ই— তিনিই পথ, সত্য ও জীবন।

আমি ঈশ্বরের কাছে আরও কৃতজ্ঞ যে, তিনি যীশু খ্রীষ্টের সুখবর আমাকে কেবল যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে, বিভিন্ন মণ্ডলী ও সভাকক্ষগুলোতে প্রচার করার সুযোগ দিয়েছেন তা নয়, এমন কি, রেডিয়ো ও টেলিভিশানের মাধ্যমে এই আকাংখিত জগতের ৫৬টি দেশেও সেই সুযোগ দিয়েছেন। আমার দেহে যতদিন শ্বাস-প্রশ্বাস থাকবে— কিম্বা যে পর্যন্ত না যীশু তাঁর নিজের লোকদের নিয়ে যাবার জন্য ফিরে আসবেন ততদিন এই কাজ চালিয়ে যাবার জন্য আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছি।

মুক্তির আলোতে

রবীন্দ্রনাথ আর, মহারাজ

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ত্রিনিদাদ দ্বীপে বাসকারী একজনের জীবনের সত্য ঘটনা। ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের বংশে রবীন্দ্রনাথ মহারাজের জন্ম হয়েছিল। একজন মহান যোগী হবার জন্য তাঁকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল এবং কিশোর বয়সেই তিনি একজন বিখ্যাত ধর্ম-নেতা হয়েছিলেন। তিনি তাঁর ধর্মের সমস্ত নিয়ম-কানুন পালন করতেন এবং প্রতিদিন অনেক ঘন্টা ধরে ধ্যান করতেন। কিন্তু এতে তিনি অন্তরে শান্তি পেতেন না এবং পাপের ক্ষমাও পেতেন না। তিনি কিভাবে সত্যের সন্ধান করে তা খুঁজে পেয়েছিলেন এই বইয়ে তিনি নিজে তা বলেছেন।

207 08 01
B 07 890